বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

ডি এস ই - ৪০৫

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান — প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বাংলা

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পাঠক্রম

ডি এস ই - ৪০৫

(বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ)

নাট্যসংরূপ ও তার বিবর্তন

পর্যায় গ্রন্থ ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একাঙ্ক সঞ্চয়ণ (সাধন ভট্টাচার্য ও অজিত ঘোষ সম্পাদিত) — নির্বাচিত ৭টি একাঙ্ক নাটক

দেবী — তুলসী লাহিড়ী, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজপুরী — মন্মথ রায়, শিক কাবাব — বনফুল, অপচয় — দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়,

এক সন্ধ্যায় — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কোথায় গেল! — কিরণ মৈত্র

পর্যায় গ্রন্থ ২ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

পথ নাটক — উৎপল দত্ত, পানু পাল, জোছন দস্তিদার, চিররঞ্জন দাস, শিব শর্মা

পর্যায় গ্রন্থ ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

গ্রুপ থিয়েটার, সৎনাট্য

পর্যায় গ্রন্থ ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

থার্ড থিয়েটার, অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক, ফোর্থওয়াল, ফোর্থ থিয়েটার

ডি এস ই - ৪০৫
বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

সূচিপত্র

ডিএসই-৪০৫	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	একাঙ্ক সঞ্চয়ণ (সাধন ভট্টাচার্য ও অজিত ঘোষ সম্পাদিত) — নির্বাচিত ৭টি একাঙ্ক নাটক			
	১	একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	১-৭
	২	বাংলা একাঙ্ক নাটককারদের পরিচয়	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	৮-১৭
	৩	দেবী : তুলসী লাহিড়ী	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	১৮-২১
	৪	বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	২২-২৫
	৫	রাজপুরী : মন্মথ রায়	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	২৬-২৯
	৬	শিক কাবাব : বনফুল	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	৩০-৩৬
	৭	অপচয় : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	৩৭-৪২
	৮	এক সন্ধ্যায় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	৪৩-৪৬
	৯	কোথায় গেল! : কিরণ মৈত্র	ড. রাজশেখর নন্দী	৪৭-৫৩
পর্যায় গ্রন্থ ২	পথ নাটক —		অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	
	১	আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব		৫৪-৬৩
	২	বাংলা পথনাটকের উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য		৬৪-৭৫
	৩	পথনাট্যকার : পানু পাল		৭৬-৮৬
	৪	পথনাট্যকার উৎপল দত্ত		৮৭-১০০
	৫	পথনাট্যকার জোছন দস্তিদার		১০১-১১৩
	৬	পথনাট্যকার : চিররঞ্জন দাস		১১৪-১২৬
	৭	পথনাট্যকার : শিব শর্মা		১২৭-১৩৬
পর্যায় গ্রন্থ ৩	১	গ্রুপ থিয়েটার	ড. শ্রাবন্তী পান	১৩৭-১৪৫
	২	সৎ নাট্য	ড. রাজশেখর নন্দী	১৪৬-১৪৯
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১	থার্ড থিয়েটার	অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক	১৫০-১৫৬
	২	থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকার		১৫৭-১৬২
	৩	অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক		১৬৩-১৭৭
	৪	ফোর্থওয়াল		১৭৮-১৮৪
	৫	ফোর্থ থিয়েটার		১৮৫-১৮৯

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

নাট্যসংরূপ ও তার বিবর্তন

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একাঙ্ক নাটক

একক-১

একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় সারা পৃথিবীতে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। আবার এই তীব্র সংকটের মধ্যে আপামর সাধারণ মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব সারা পৃথিবীর শোষিত মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বিভিন্ন দিক থেকে বিশ শতক মানব সভ্যতার কাছে স্মরণীয়। এই বিশ শতকেই দু -দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আপামর মানুষের মুক্তি, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার প্রভৃতি। তেমনভাবেই বিশ শতকের শিল্প- সাহিত্যেও নানা ধরনের আঙ্গিক এবং বিষয়গত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে One Act Play রচিত হয়। ইউরোপে তথা আমেরিকার বিভিন্ন দেশে (একাঙ্ক নাটক) One Act Play রচিত হয়। তার প্রভাবেই আমাদের দেশে একাঙ্ক নাটক লেখা শুরু হয়েছিল। আমাদের দেশে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে একাঙ্ক নাটক রচনা শুরু হয় বলে আমাদের মনে হয়েছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র প্রমুখ একাধিক বাংলা নাট্যকারেরা একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন।

একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব নাট্যরচনা ও অভিনয়ের উন্মেষ পর্বেই। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত এবং আচার্য বিশ্বনাথ-এর নির্দেশে যে দশরূপকের বা নাটকের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে 'ভাণ', 'ব্যায়োগ', 'বীর্থী', 'প্রহসন' এবং 'উৎসব সৃষ্ট' একাঙ্ক নাটক। পাশ্চাত্যে নাটকের পথ চলা যে দেশে শুরু সেই গ্রীসে প্রথম যুগে নির্দিষ্ট, অঙ্কবিহীন নাটকই রচিত ও অভিনীত হত। দীর্ঘ সময় ধরে অভিনীত হলেও সেই নাটকও ছিল 'একাঙ্ক'। তবে আধুনিক একাঙ্ক বা সংস্কৃত একাঙ্কের সঙ্গে তার কোন সাযুজ্যই লক্ষিত হয় না।

বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত জীবনে একদিকে দীর্ঘ সময় ধরে নাট্যরচনা, নাট্যাভিনয় এবং নাটক দেখার বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত করা, অন্যদিকে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রসার এই দুয়ের হাত ধরেই একাঙ্ক নাটকের সাড়ম্বর উপস্থিতি। এই উপস্থিতি বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, বিকশিত সংস্কৃতির সব দেশেই। উপন্যাস থেকে গল্প বা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে। সেই সময়কাল থেকে এ দেশে কিছুটা সময় পরে আধুনিক কালে এই একাঙ্ক নাটক রচনার ক্ষেত্রে একই কারণ কাজ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় স্বল্পায়তনে কখনওবা একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে প্রধানত পেশাদারী বাণিজ্যিক থিয়েটারে অভিনীত মূল নাটকের পর নির্দিষ্ট সময়ের ফাঁকটুকু পূরণের জন্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ,অমৃতলাল বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বা অপ্রধান প্রহসনকারদের কথা প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকগুলির মধ্যে একাঙ্ক নাটক আছে। অংকবিহীন 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', ভিন্নগোত্রের নাটক, তবে তাদের একাঙ্কও বলা যাবে না। পাশ্চাত্যে ঐ উনবিংশ শতাব্দীতে 'কার্টেন রেইজার' বা পূর্ববঙ্গের উপস্থিতি একাঙ্ক-এর ভূমিকা পালন করেছে। লন্ডনের রঙ্গালয়ে বিলম্বিত দর্শকদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তরকালে একাঙ্ক নাট্যরচনা অভিনয় অনেকটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে বাংলা নাটকের প্রসারিত আঙিনায়। ষাট, সত্তর দশকে পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিল্প-সংস্কৃতির নানা ধারার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নাটক রচনায়-অভিনয়ে যে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল— শোষক মানুষ এবং শোষিত মানুষ। সর্বতোভাবে একাঙ্ক নাটকের জমজমাট রূপঞ্জনিটি এই সময় প্রত্যক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, স্কটল্যান্ডে একাঙ্ক নাটক আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছে ছিল গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এর পিছনে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথাক্রমে তাঁরা হলেন আর্থার হপকিন্স এবং জিওফ্রে এইটওয়ার্থ।

একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে নানা অভিমত

একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন সুধীজন এদেশে-বিদেশে যে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন, আমরা সে দিকে একবার দৃষ্টি ফেরাব।

(১) 'In a sentence the ideal one act play is a concise, unbroken expression of a single idea untrammelled by side issues and unnecessary elaborations.' (J. Bourne/Theatre stage, ed. by Downs.)

(২) Dealing with a single episode or situation and having no space to show the development of character in action, it is necessarily much more climatic in structure and demands therefore great skill in exposition of circumstance and personality and the utmost economy throughout. John Hampden/24 one act plays).

(৩) The one-act-play which can be read aloud in twenty minutes or half an hour shows how a single theme can be presented, developed and brought to a climax with the minimum of material and the maximum of dramatic effect. (J. Marriotù One-act plays of To-day-1st series).

(৪) In the short play, however, the author has no time in which to develop character and situations. His characters must be flashed on the audience, his the round, so to speak, like figures passing a window, has situations must be apprehended quickly, like a picture hung on a wall. And in reading the best type of short play it is, may be, not the least point of interest to perceive how all this is achieved with the extreme of verbal economy. (Seven famous one-act-plays/Ferguson).

(৫) Self-evidently a dramatic work consisting of only one act. Usually short (a playing time of fifteen to forty minutes is about normal) ..... A One-act play is the dramatic equivalent of a short story and tends to concentrate on a single episode or situation and as a general rule has only two or three characters. In theme, mood and subject the range is considerable - from farce to tragedy. (The penguin Dictionary of Literary terms and Literary theory, ed. by J. A. Cuddon)

(৬) একাঙ্ক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণির দৃশ্যকাব্য যার 'কার্য্য' একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত হয়। একাঙ্ক নাটিকা নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বৃত্ত- 'ছোট' হলেও 'সমগ্র' একটি 'কার্য'। (ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য/একাঙ্ক সঞ্চয়ন, নাটকের রূপ, রীতি ও প্রয়োগ)

(৭) ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা এগুলিই একাঙ্ক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ। একাধিক দৃশ্য ও দৃশ্যসজ্জার মধ্যে এই লক্ষণগুলি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও একটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে এই লক্ষণগুলি সবচেয়ে সার্থক ভাবে ধরা পড়ে।

(৮) একাঙ্ক নাটক হল একক প্রতীতিসম্পন্ন, উত্থান-পতন-বহুল ঘটনাসমৃদ্ধ, পরিমিত আয়তন, আদি-মধ্য-সমন্বিত দৃশ্যকাব্য যা একদিকে এক দৃশ্যময় ত্রি-ঐক্যে সংবৃত, অন্যদিকে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ভাবময়তায় সংহত।

(৯) একাঙ্কিকা মাত্র একটি প্রধান নাটকীয় ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করে। নাটিকার প্রধান উদ্দেশ্যও হয় মাত্র একটি ফলাফল সৃষ্টি করা, তা বিয়োগান্ত হোক বা মিলনান্ত হোক। আর, একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হয়, তখন তাকে সার্থক করে তুলতে হবে নাটিকার গঠন নৈপুণ্যে দীর্ঘসূত্রতা সম্পূর্ণ অর্জন করতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের চিত্ত জয় করে রেখে দিতে হবে, নতুবা সর্ব ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। দুর্বল ঘটনাবিন্যাস বা বিশ্লেষণ করার সেখানে সময় নেই, অবসরও নেই, অযথা বক্তৃতা দেবারও সুযোগ নেই। একটি প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সুবিধাও নেই। গাঠনিক ও বাচনিক সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা দেখাতে গেলে শিল্পীকে অতি সতর্কভাবে চলতে হবে, তবেই সার্থকতা। এটা সম্ভবপর করে তুলতে পারলে সেইখানেই হবে একাঙ্কিকার বিরাট শিল্পসম্ভাবনা।

(১০) The one-act form must, as it were, be presented in a "single sitting" — it must start at the beginning with certain definite elements and pas quickly and effectively to the end without half or digression. (B. Rolland Lewis/The technique of the One-act Play).

(১১) একাঙ্কিকায় একটিমাত্র বিশেষ ঘটনা-সংস্থানকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি শেষ ভাবসৃষ্টির সহায়রূপে পরিকল্পিত হয়। এই জাতীয় নাটকে সুদীর্ঘ কথাবার্তা বা গুরুগম্ভীর আত্মবিবৃতির অবসর নেই— স্বল্প সময়ে একটি সুনির্বাচিত ঘটনার নাটকীয় চরম পরিণতি (climax) প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে একটি বিশেষ পরিবেশ (setting) বা একটি ক্রমপ্রসারী দৃশ্যে বা একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকীয় চরম পরিণতি লাভ করে এবং একটি বিশেষ ভাবানুভূতি (impression) সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত স্রোতে বিস্ময় ও কৌতূহল সঞ্চার করিয়া নাট্যকার চরিত্রের নাটকীয় গতিবিধান করিবেন।

(১২) একাঙ্ক নাটিকা হল এক অঙ্কের স্বল্পায়তন, এমন একটি স্বল্প চরিত্র বিশিষ্ট নাটিকা, যাতে কল্পনায় অনুভূত, কোন একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিক বা জীবনের একটি গভীরতার নাটকীয় গতিবেগযুক্ত হয়ে দ্রুত চূড়ান্ত মুহূর্তে সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বাত্বক পথে দর্শকদের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চরম পরিণাম লাভে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তে একটি সমগ্র কার্যের ব্যঞ্জনা দেয়।

(১৩) আদ্যন্তের ত্বরিৎ গতিতে অথবা অন্তাংশের বিলম্বিত গতিতে নিষ্পন্ন কোনো বিষয় বা ভাবের সম্পৃক্ত নাটকই একাঙ্ক নাটক।

(১৪) একটি মাত্র অঙ্কের পরিসরে সমাপ্ত এই নাটকে সংক্ষিপ্ত কালসীমায় বিধৃত জটিলতাহীন এমন একটি কাহিনি বা পরিস্থিতি রূপায়িত হয়, যাহাতে দর্শক এক অখণ্ড অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। কাহিনির ধারায় পর্যায়ক্রমে চরিত্র বিকশিত করিয়া তুলিবার সুযোগ থাকে না। নাটকীয় তাৎপর্য নয় সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা ও চরিত্র উপস্থাপন করা হয়।

(১৫) However, it is apparent that in the one-act play there can be no sub-plot, and no irrelevant detail or incident can be introduced without damage to the whole. (Manju Dutta GuptaùThe One Act Play A Critical Approach).

(১৬) এক অঙ্কের পরিসরে সংক্ষিপ্ত কালসীমায় সামান্য একটি কাহিনির নাট্যরূপকে একাঙ্ক নাটক বলে।.... লক্ষ্যের দিক থেকে একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি একাঙ্ক নাটকের আনুগত্য থাকবে, এবং ঘটনা একমুখী হবে। একটি চরিত্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করাও একাঙ্ক নাটকের লক্ষ্য হতে পারে। ছোটগল্পের চারিত্রিক লক্ষণ যেমন একমুখীন, একাঙ্কে ঘটনার উদ্দেশ্যও কতকটা একমুখী। সংক্ষেপে, অবান্তর বিন্যাস বাদ দিয়ে নাট্য পরিস্থিতিকে চরম কৌতূহলোদ্দীপক করে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হয় তবে তা ক্লাইমেক্সের মাধ্যমে উপস্থিত করতে হবে। চরিত্রবিকাশই হোক বা ঘটনার উপস্থাপনাই হোক, কিংবা জীবনের একটি গভীর উপলব্ধ সত্য প্রকাশের ব্যাপারই হোক, নাট্যকারকে গভীর সংযমের সঙ্গে বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে, দেখতে হবে কোথাও শৈথিল্য বা বাহুল্য যেন না থাকে। নাট্যচমকের দ্যুতি ও দীপ্তি বৈদ্যুতিক আকস্মিকতা নিয়ে একাঙ্কে হাজির হয়। (শুদ্ধসত্ত্ব বসু/বাংলা সাহিত্যের নানারূপ)

(১৭) একাঙ্ক নাটক extravaganza নয়, সম্পূর্ণ extra-ordinary। জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে সুনির্বাচিত একটি নাটকীয় মুহূর্তকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার প্রদীপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার জন্ম। সে বর্তমান শতাব্দীর লোক, বিগত শতাব্দীর কেউ নয়... একাঙ্কিকার যে ঐক্যটি প্রত্যাশিত তা হল ভাব-ঐক্য (unity of impression); সেই ঐক্যবিন্দুটিকে উজ্জ্বল করার জন্যই একাঙ্কিকার যৎসামান্য আয়োজন।

(১৮) একাঙ্ক নাটক হল এক দৃশ্যে অভিনয়যোগ্য, দ্রুত সংঘটিত বাহুল্য বর্জিত এমন এক ধরনের সংবদ্ধ নাটক, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তীব্র একমুখিনতা, অথচ নাটকের মৌল লক্ষণ অবিকৃত রেখে যাতে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

(১৯) একাঙ্ক নাটক ক্ষুদ্র গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে দেখা বহু ব্যাপ্ত জীবনযন্ত্রণার সুতীব্র স্বাক্ষর প্রসারিত দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, বিপর্যস্ত, নিষ্পেষিত মানব জীবনের সংহত, সীমাবদ্ধ ক্যানভাসে বিবৃত নাট্যবৃত্ত।

একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে নাট্যবিশষজ্ঞদের নানা অভিমত জানার পর আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসব। মাত্র একটি অংকে সীমাবদ্ধ একাধিক দৃশ্যবিহীন একমুখী লক্ষ্য ও কাহিনিবেষ্টিত, অবশ্যই অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত, স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের উপস্থিতিতে, সহজ সরল দৃশ্যস্থাপনায়, প্রয়োজনীয় আলোক সম্পাতে, আবহ সৃষ্টিতে, চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত কিন্তু শিল্পিত, গতিসম্পন্ন নাটকের কৌতূহলদ্দীপক (Dramatic suspense) কাহিনিতে বিভাসিত জীবন জিজ্ঞাসার বীজবপনের মধ্যে দিয়ে পরিণতিতে (Exposition) উপনীত নাটকই হল, একাঙ্ক নাটক। (বিভিন্নজনের অভিমত সংগ্রহের কাছে কৃতজ্ঞ ড. সনাতন গোস্বামীর কাছে)।

ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের সাযুজ্য এখানেই।

উপরের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন সুধীজনের অভিমত থেকে আমরা একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমার্জিতভাবে সাজিয়ে নিতে পারি।

১। একটি অংকে কাহিনি (Plot) সীমাবদ্ধ থাকবে।

২। শিল্পিত রূপটি প্রগাঢ় এবং নাট্যকাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অবশ্যই দৃশ্যও একটিতে সীমায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগের দিক থেকেও তা সুবিধাজনক। সংশ্লিষ্ট একাঙ্ক নাটকটিকে অভিনীত হতে হবে। অতএব প্রয়োগের বিষয়টি ভাবতেই হবে।

৩। কাহিনি অনুযায়ী চরিত্রের উপস্থিতি ঘটবে। চরিত্রের সংখ্যাও সীমায়িত হওয়া জরুরী। একাধিক চরিত্রের উপস্থিতিতে একমুখী নির্দিষ্ট কাহিনি (Plot) এলোমেলো হতে বাধ্য।

৪। কাহিনি একমুখী হবে।

৫। অভিনয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যসজ্জা-মঞ্চভাবনা, পোশাক-সাজসজ্জা, আলোক সম্পাতে সরলীকরণ প্রয়োজন। কারণ একাঙ্ক নাটক যাঁরা প্রযোজনা করেন তাঁরা বা সেই নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হয়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়। ছোট গোষ্ঠীগুলি একাঙ্ক নাটক প্রযোজনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই খরচের দিকটিতে নজর দিতে এটা করা দরকার।

৬। আবহসংগীত এখন সর্বত্র টেপরেকর্ড করে বাজানো হয়। এক্ষেত্রে দায়িত্বপালনের বিষয়টি যেন গুরুত্ব পায়।

৭। নাটক শেষ হবার পর দর্শক যেন চিন্তাভাবনার খোরাক পায়, তা কাহিনি গুরুগম্ভীর-সিরিয়াস হোক বা হাসির।

৮। এক্ষেত্রে সংশয়, সংকেত, ব্যবস্থা থাকাটাও জরুরী।

৯। নামকরণের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলি যেন প্রকাশ পায়। দর্শকমনে প্রথম থেকে যেন কৌতূহল বজায়। (Dramatic Suspense) থাকে।

১০। অবশ্যই কাহিনি পঞ্চসন্ধিতে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ (Starting point) (প্রারয়), Rising action (উৎকণ্ঠামুখিনতা), Climax (উৎকণ্ঠা), Falling action (পরিণতিমুখিনতা), Exposition (পরিণতি)।

১১। কাহিনির ত্রি-ঐক্য (Trio-Unity) Unity of Time (সময়ের ঐক্য) Unity of action (ঘটনার ঐক্য) এবং Unity of Place (স্থানিক ঐক্য)।

১২। বিষয়বস্তু (Theme) হবে বাস্তবজীবনের উপর ভিত্তি করে এবং নাটকীয় সম্ভাবনায়পূর্ণ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যা বিকশিত হয়ে পরিণতিতে পৌঁছবে।

১৩। আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত হবে একাঙ্ক নাটকের বৃত্ত।

১৪। সংহত ভাবাবেগের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল চূড়ান্ত রূপ নেবে।

১৫। সংলাপ (Dialogue) সহজ-সরল-প্রাণবন্ত অবশ্যই বোধগম্য হতে হবে। কাহিনি এবং চরিত্রানুযায়ী কাম্য।

১৬। অখন্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেন চালিত হতে পারে।

১৭। শিল্পসম্মত হওয়াও বাধ্যতামূলক।

১৮। ঘটনার (action) অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা অপরিহার্য।

১৯। অপ্রাসঙ্গিক, দ্রুত সংঘটিত, বাহুল্য বর্জিত এবং অবশ্যই অভিনয়যোগ্য হতে হবে।

২০। একাঙ্ক নাটক Extravaganza নয়, extra-ordinary জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে একটি সুনির্দিষ্ট নাটকীয় মুহূর্তকে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদীপ্ত করাই তার প্রকৃত লক্ষ্য।

একাঙ্ক সঞ্চয়ন প্রসঙ্গ

দুই বাঙালী নাট্যবিশারদ অধ্যাপক (ড.) সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক (ড.) অজিতকুমার ঘোষ এর সম্পাদনায় 'একাঙ্কসঞ্চয়ন' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। তারপর আরো কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন মুদ্রণ নানা সময়ে। একাঙ্ক এই নাট্যসংকলনে কুড়িটি একাঙ্ক নাটক সংকলিত হয়েছে। নাট্যকারেরা হলেন ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথ, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সুনীল দত্ত, কিরণশংকর, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সিতাংশু মৈত্র, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী।

কুড়িটি নাটকের নামও আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, যথাক্রমে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'রাজধানীর রাস্তা', 'দেবী', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'রাজপুরী', 'অসাধারণ', 'শিক কাবাব', 'উপসংহার', 'আধিভৌতিক', 'সাপ্তাহিক সমাচার', 'উজানযাত্রা', 'অপচয়', 'এক সন্ধ্যায়', 'সাজঘর', 'কুয়াশা', 'একচিলতে', 'সকাল বেলায় একঘন্টা', 'একটি রাত্রি', 'কোথায় গেল!', 'মনোবিকলন'।

রবীন্দ্রনাথ-এর নাটক দিয়ে সূচনার কারণ তাঁকে স্পর্শ করে যাত্রার সূত্রপাত। এই সংকলনে মন্মথ রায় ছাড়া অন্য কারোর প্রকাশিত নাটক স্থান পায়নি। অধিকাংশ নাটকগুলির নামকরণে স্পষ্ট যে, স্বল্প সময়, নির্দিষ্ট বিষয়কে নাট্যকারদের প্রাধান্য বিস্তারই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সাতচল্লিশ বছর আগে সংকলিত এই গ্রন্থটিতে ষাট, সত্তর দশকের জনপ্রিয় নাট্যকারদের নাটক সংকলিত হয়নি। সেই সুযোগ ছিলনা সংকলনের সময়। পরে সংস্করণ হলে ভালো হত। অবশ্যই তাতে - উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, দেবাশিষ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শাঁওলি মিত্র, বাদল সরকার, শ্যামল সেনগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, অরূপ মৈত্র, কুমার রায় প্রমুখের রচিত নাটক অনায়াসে সংকলন করা যেত। অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা একাঙ্ক নাটক সংকলন প্রকাশ করেছে সাহিত্য আকাদেমি (নয়াদিল্লি)। সেই সংকলনে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলের নাটক সংকলিত হয়েছে। আমাদের পাঠ্য আলোচ্য সংকলন পঞ্চাশ উত্তরকালের নাট্যকারদের নাটক না থাকায় বিশ শতকের ষাট-সত্তর-আশির দশকের পরিবর্তিত সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির ছবিটি উচ্চকিত হতে পারেনি। এটি দুর্ভাগ্যের বিষয়। এ বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ণকারীদের গঠনমূলক ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন।

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-২

বাংলা একাঙ্ক নাটককারদের পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) :

বাংলা একাঙ্ক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রেই স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা মূলত কবি, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, গল্পকার, নাট্যকার হিসেবেই চিনি। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে 'বিশ্বকবি' রূপে নন্দিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের ছাপ রেখে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একাঙ্ক নাটকও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একাঙ্ক নাটক গুলির মধ্যে একাঙ্ক নাটকের শিল্পধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বিদায় অভিশাপ' 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' 'গান্ধারী আবেদন' নাট্যকাব্য গুলির মধ্যে একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য থাকলেও নাটক গুলির মধ্যে কাব্যের ভাগই বেশি। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ডাকঘর' নাটকটিতে তিনটি দৃশ্য থাকলেও আয়তনের দিক থেকে, কাহিনির দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে 'ডাকঘর' নাটকটিকে একাঙ্ক নাটক হিসেবে অভিহিত করা যায়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' 'বিনি পয়সার ভোজ' উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক।

মন্মথ রায় :

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) বাংলার নাট্য আন্দোলনের উজ্জ্বল পুরুষ। তাঁকে আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যপুরুষ রূপে অভিহিত করা যায়। মন্মথ রায় চলমান জীবনধারার শিল্পী জীবনের জটিলতা এবং দ্বন্দ্বসংঘাতময় ভাবনা তাঁর নাটকে রূপ দিয়েছে। তিনি প্রগতিশীল নাট্যভাবনার শরিক। অর্থনৈতিক শোষণে ক্লিষ্ট, সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত, রাজনৈতিক শাসনে জর্জরিত মানুষের ছবি এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন নাটকে। অন্যদিকে মানবমনের গভীর রহস্য অনন্ত বিস্ময় সীমাহীন জটিলতার উন্মোচন তাঁর নাটকে পাওয়া পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক, একাঙ্ক জীবনী নাটক ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের নাটক তিনি লিখেছেন।

তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলি হলো—

মুক্তির ডাক (১৯২৩), সেমিরেমিস (১৯২৫), কাজল রেখা (১৯২৬), চাঁদ সদাগর (১৯২৭), দেবাসুর (১৯২৮), মহুয়া (১৯২৯), একাঙ্কিকা (১৯৩১), সাবিত্রী (১৯৩১), অশোক (১৯৩৩), খনা (১৯৩৫), বিদ্যুপর্না (১৯৩৭), সতী (১৯৩৭), মীরকাশিম (১৯৩৮), রূপকথা(১৯৩৮), রাজপুরী (১৯৩৮), ভাঙাগড়া (১৯৫০), মহাভারতী (১৯৫০), মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২), উর্বশী (১৯৫৩), নিরুদ্দেশ (১৯৫৩), পথে বিপথ (১৯৫৩), মীরাবাঈ (১৯৫৪), গুপ্তধন (১৯৫৫), জীবন মরণ (১৯৫৫), লাঙ্গল (১৯৫৫), জটাগঙ্গাধর বাঁদ (১৯৫৫), রঘু ডাকাত (১৯৫৫), শ্রীশ্রী মা (১৯৫৫), ছোটোদের একাঙ্কিকা (১৯৫৬), মরা হাতি লাখ টাকা (১৯৫৭), নব

একাঙ্কিকা (১৯৫৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮), কোটিপতি নিরুদ্দেশ (১৯৫৯), ফকিরের পাথার ও নাট্যগুচ্ছ (১৯৫৯), বন্দিতা (১৯৫৯), মহাপ্রেম (১৯৫৯), অমৃত অতীত (১৯৬০), কৃষাণ (১৯৬১), দুই আঙিনাঃ এক আকাশ (১৯৬১, বিচিত্র একাঙ্ক (১৯৬১), স্বর্ণকীট ও জওয়ান (১৯৬২), মহা উদ্বোধন (১৯৬৩), মহা অভিসার (১৯৬৩), দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম (১৯৬৫), তারাস শেভচেঙ্কা (১৯৬৫), দিগ্বিজয় (১৯৬৯), দ্বিচারিণী (১৯৭০), লালন ফকির (১৯৭০)।

একাঙ্ক নাটক মন্মথ রায় দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী একাঙ্ক নাটক রচনা করে শিল্প সার্থকভাবে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন। মন্মথ রায়ই বাংলা নাট্যধারায় প্রথম শিল্প সার্থক একাঙ্ক নাটকের জন্ম দিয়েছেন। মুক্তির ডাক তাঁর লেখা প্রথম একাঙ্ক নাটক হল 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩)। নাটকের কাহিনি রচনায় নাট্যকার অতীতের অন্ধকারে বৌদ্ধজগতে বিচরণ করেছেন। লোভ- লালসার ঊর্ধে দয়া, করুণা ও ভালোবাসাই যে মুক্তির একমাত্র পথ, নাটকের চারটি চরিত্রের পরিণতি দেখে আমরা সে শিক্ষাই লাভ করি। বাংলা বৌদ্ধ আখ্যায়িকাকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করে নাট্যকার প্রকাশ করেন।

একাঙ্কিকা অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটকের সংকলন 'একাঙ্কিকা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আটটি একাঙ্ক নাটক স্থান পায়। সেগুলি হল 'রাজপুরী', 'বহুরূপী', 'উইল', 'বিদ্যুৎপর্ণা', ' স্মৃতির ছায়া,' 'উপাচার', 'পঞ্চভূত', 'মাতৃমূর্তি'। 'একাঙ্কিকা'র উত্তেজনা, মানবহৃদয়ের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

রাজপুরী 'রাজপুরী' (১৯২৫) বৌদ্ধ কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। শাক্যবংশের রাজকন্যা ভেবে কৌশলরাজ যাকে বিবাহ করেছিলেন, সে আসলে দাসী কন্যা। ষোলো বছর পরে এই আসল পরিচয় জানা গেল। আর এই ষোলো বছর ধরে রাণী তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। 'যুবরাজ বিরুধক' শাক্যমুনিকে হত্যার নির্দেশ দিলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে মাতৃহত্যাকারী হতে হয়েছে। নাটকের শেষে রাণীর আত্মাহুতি ট্রাজিক রসের জন্ম দিয়েছে। লক্ষ্মীহারা 'লক্ষ্মীহারা' নাটিকায় নারীর দুর্গতিকর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, পতিভক্তি মানে স্বামীর সেবাদাসী হওয়া, পতিভক্ত মানে স্বামীর লালসা পূরণ করা, এমন জীবন লক্ষ্মীহারা চাননি বলেই গণিকা জীবনকে বেছে নিয়েছেন। বিদ্যুৎপর্ণা 'বিদ্যুৎপর্ণা' (১৯২৭) নাটিকায় দেখি এক পুরোহিত তাঁর আত্ম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিশুবেলা থেকে এক বেদের কন্যাকে বিষপান করিয়ে বড়ো করে তোলেন। বৌদ্ধরাজাকে ধ্বংস করার কাজে তিনি বেদের কন্যাকে লাগাতে চান। এদিকে পুরোহিতের শিষ্য ইন্দ্রজিৎ ও বিদ্যুৎপর্ণা পরস্পর পরস্পরের প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিশেষ একমুহূর্তে বিষকন্যার স্পর্শে পুরোহিত ধ্বংস হয়ে যান। নিজের প্রকৃত রূপ জানতে পেরে ইন্দ্রজিৎকে বাঁচাতে বিষকন্যা বিদ্যুৎপর্ণা নদীর জলে শেষপর্যন্ত জীবন বিসর্জন দেয়।

উইল 'উইল' নাটিকায় মালিকের সঙ্গে নারী কুলীশ্রমিকদের মিলনে সেই নারীর গর্ভে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সেই কন্যার প্রতি স্নেহবশত মালিক তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুকালে কুলীদের নামে উইল করে দিয়ে মানবতার চরম প্রকাশ ঘটান।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর নানা কারণে গণনাট্য সংঘ টালমাটাল। সেই সংকট কালে নাট্য জগতে অভির্ভূত হলেন নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০)। গণনাট্যের সঙ্গে তাঁর যোগটি ছিল আত্মিক। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি।

একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি তাই সমসাময়িক সমাজ প্রেক্ষাপটকে কোনমতে অস্বীকার করতে পারলেন না। দিগিন্দ্রচন্দ্রের প্রকাশিত তিনটি একাঙ্ক সংকলন যথাক্রমে- 'একাঙ্ক সপ্তক' (১৯৫৮), 'অভিনব একাঙ্ক' (১৯৬২) এবং 'একাঙ্ক বিচিত্রা' (১৯৮৬)। 'একাঙ্ক সপ্তক' সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত নাটকগুলি যথাক্রমে- অপচয় (১৯৫৭), এপিঠ-ওপিঠ (১৯৪৯), পাকা দেখা (১৯৫৮), পুনর্জীবন (১৯৪৮), বেওয়ারিস (১৯৪৭), দাম্পত্য কলহে চৈব (১৯৫৭), আপেক্ষিক (১৯৪৭)। 'অভিনব একাঙ্ক' (১৯৬২) সংকলনে মোট নয়টি একাঙ্ক স্থান পেয়েছে- (১) হারানো সুর, (২) দু-এর পিঠে এক শূন্য, (৩) অন্তস্তল, (৪) অভিনেত্রী, (৫) নবজন্ম, (৬) পাণ্ডুলিপি, (৭) চিড়িয়া বিদ্রোহ, (৮) তণ্ডুল যজ্ঞ, এবং (৯) কেউ দায়ী নয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের সর্বশেষ নাট্য সংকলন 'একাঙ্ক বিচিত্রা' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬-তে। সংকলনভুক্ত বারোটি একাঙ্ক যথাক্রমে— বোধন (১৯৪৮), আগ্নেয়গিরি (১৯৫২), গোল টেবিল (১৯৫৩), কাঁঠালের আমসত্ত্ব (১৯৫৭), কিন্তু এবং সুতরাং প্রথম (১৯৫৬), দস্তুর মত প্রহসন প্রথম (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), সীমান্তের ডাক (১৯৬২), মেঘের আড়ালে সূর্য প্রথম (১৯৭১), বাঁধ ভেঙে দাও প্রথম (১৯৭৫), মুখর রাত্রি(১৯৭৮), রক্ত রাঙা সিঁথি (১৯৮১) সেই অগ্নিগর্ভ দিন(১৯৮৪)

অপচয় 'একাঙ্ক সপ্তক' সংকলনের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা 'অপচয়'। জাতীয় জীবনের এক চরম সমস্যা এই একাঙ্কটির মধ্যে মূর্ত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা একটি পরিবারের সংকট এই নাটকের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। এপিঠ-ওপিঠ এই একাঙ্কটির প্রেক্ষাপটে আছে দেশভাগের এক সুতীব্র যন্ত্রণার কথা।পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ায় হিন্দুরা সে দেশ ত্যাগ করে দলে দলে চলে আসতে থাকে এদেশে। কলকাতা শহরেও এর প্রভাব পড়ে। এই শহরেও উদ্বাস্তু সমস্যা শুরু হয়। এমনই একটি ছিন্নমূল পরিবার এসে হাজির হয় কোলকাতায়। শুরু হয় জীবনযুদ্ধ। এই নিয়ে গল্প এগোয়। আসলে অর্থনৈতিক কারণ কিভাবে মানবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায় সেই কাহিনিই রূপায়িত 'এপিঠ-ওপিঠ' নাটকে।

পাকা দেখা এই একাঙ্কটির প্রেক্ষাপটে আছে একান্নবর্তী পরিবারের ছবি। বনেদি একটি পরিবারের ছোট মেয়ের পাকা দেখা। পাত্র পক্ষের আসার আর বেশি দেরি নেই। তাই কন্যা পক্ষের বাড়িতে উৎকণ্ঠা, শঙ্কা আর ব্যস্ততা। গৃহকর্তা পরলোকগত। তাই জ্যেষ্ঠ পুত্র পরেশই সবদিক সামলাতে ব্যস্ত। কিন্তু কোথাও একটা ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্ব যেন টের পাওয়া যায় নাটকটির প্রেক্ষাপটে। পুনর্জীবন কলেরা আর মহামারী আক্রান্ত একটি অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র দুটি চরিত্রের ভালোবাসার কাহিনিকে রূপ দিলেন এই একাঙ্কে। সামাজিক বিধান অনেক ক্ষেত্রে বৈধ বিবাহের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। নরনারীকে তখন মিলনের জন্য অন্য পথ নির্বাচন করতে হয়। পুনর্জীবন একাঙ্কে বসন্ত এবং পদ্মকে আমরা জীবনের সেই ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে দেখি।

আপেক্ষিক একাঙ্ক সপ্তকের শেষ নাটক 'আপেক্ষিক'। নাটকটির বৃত্ত গড়ে উঠেছে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপটে। গৃহকর্তা অমল একটি স্বদেশী সওদাগরী অফিসের চাকরি করে। সামান্য বেতনে কোনোরকমে চলে তাদের তিন জনের সংসার। কিন্তু হঠাৎই একদিন অমলের অনেক বেতন বেড়ে যায়। মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে সমস্ত কর্মীদের সে একত্র করার প্রেরণা দেয়। ইউনিয়ন গড়তে চায় তারা। আর সেই ঘটনার সূত্রেই আকস্মিকভাবে অমলের বেতন বাড়ে এক ধাক্কায় অনেকটা। এই বেতনবৃদ্ধি স্ত্রীকে খুশি করতে পারল না। কেন না তার বেতন বাড়ে এক ধাক্কায় অনেকটা। এই বেতনবৃদ্ধি স্ত্রীকে খুশি করতে পারল না। কেন না তার আশঙ্কা মালিক অমলকে

কিনে নিল। ভেঙে দিল ইউনিয়ন গড়ার স্বপ্ন। অর্থের টোপ দিয়ে তারা মধ্যবিত্তের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিল। কিনে নিল স্বাধীনতা। নয়টি ভিন্ন স্বাদের একাঙ্ক নিয়ে সংকলিত 'অভিনব একাঙ্ক'। এই সংকলনে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং আঙ্গিক নির্মাণে অভিনবত্ব এনেছেন। সংকলনের অধিকাংশ একাঙ্কই ব্যক্তি তথা পরিবার কেন্দ্রিক মনস্তাত্বিক সংঘাতের নাটক। প্রখর সমাজ বিশ্লেষণের আলোয় আলোকিত নয়।

পাণ্ডুলিপি একজন প্রগতিশীল সম্পাদকের অসহায়তার এবং মর্মযন্ত্রণার চিত্র আঁকা হয়েছে 'পান্ডুলিপি' একাঙ্কে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দিগিন্দ্রচন্দ্রের শেষ একাঙ্ক সংকলন 'একাঙ্ক বিচিত্রা'।

বোধন কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক বোধন। জোতদারী ব্যবস্থার একটি ভয়ঙ্কর ছবি ধরা পড়েছে এই একাঙ্কে।

কিন্তু এবং সুতরাং তিনটি অব্যয়সূচক শব্দের সমাহারে গঠিত এই একাঙ্কে নাট্যকার একটি বিশেষ শ্রেণির সমাজ-মানুষের সত্যকার স্বরূপ তুলে ধরলেন। নবোদয় প্রকাশনীর অফিস। একদিকে প্রকাশিত বই-এর সারিবদ্ধ অবস্থান অন্যদিকে প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার মৃণালবাবু এবং সন্তোষবাবুর কথোপকথন। উভয়ের সংলাপের মাধ্যমে পুস্তক প্রকাশ, পুস্তকের মান এবং সর্বোপরি বাজারে সেই পুস্তকের চাহিদা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হয় আমাদের।

গোলটেবিল ১৯৫৩-তে 'ত্রিপুরার কথা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গোলটেবিল' একাঙ্কটি দিগিন্দ্রচন্দ্রের একাঙ্ক নাট্য সাহিত্যের একটি 'মাইলস্টোন'। নাটকটির একটি আপরিসীম ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। মুনাফালোভী সংবাদপত্র মালিকদের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিতে এই একাঙ্কটি একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন জীবনবাদী নাট্যকার। জীবনের গভীরতর সমস্যাকে তিনি তাঁর নাটকে অনায়াসে প্রতিস্থাপন করেছেন। কি পূর্ণাঙ্গ কি একাঙ্ক দুই শাখাতেই নাট্যকার জীবনের প্রকৃত বাস্তব সমস্যাকে তুলে এনেছেন। মার্কসীয় চেতনায় দীক্ষিত দিগিনবাবুর একাঙ্ক নাটকের বিষয় এবং আঙ্গিকে বারবার এসেছে অভিনবত্ব। কিন্তু প্রতিটি একাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়েই তিনি সমাজ-জীবনের ফাঁক এবং ফাঁকিকে নতুন রূপ দিলেন।

বনফুল :

গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে নাট্য-আন্দোলনে যখন একটা নতুন জোয়ার এলো, তখন এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও কয়েকজন সাহিত্যিক নাট্যচর্চা করে গেছেন; সাহিত্যিক ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) তাঁদের অন্যতম। নাট্যসাহিত্যে বিশেষত একাঙ্ক নাটক রচনায় তিনি একটি নতুন পথ খুঁজে নিলেন তাঁর সৃজনী শক্তির দুর্বার সাধনায়। নাট্যকার বনফুল বহু চর্চিত বা বহু পঠিত নন। ১৯৩৮-১৯৪৮-তাঁর প্রথম পর্বের নাট্যচর্চার পরিধি এই দশ বছর। এই পর্বেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর অসামান্য একাঙ্ক নাটকগুলি। বনফুলের প্রথম একাঙ্ক সংকলন 'দশভাণ' প্রকাশিত হয় জুন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। সংকলনটির নামকরণ করেন সাহিত্যিক রাজশেখর বসু। সেগুলি যথাক্রমে—

১. 'শিক কাবাব' প্রথম প্রকাশ- শনিবারের চিঠি, আষাঢ় সংখ্যা-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। ২. 'লেহ্য' প্রথম প্রকাশ- শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ সংখ্যা-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। ৩. 'জল' প্রথম প্রকাশ- শনিবারের চিঠি, ভাদ্র সংখ্যা-১৩৪৭

বঙ্গাব্দ। ৪. 'অবাস্তব' প্রথম প্রকাশ- ভারতবর্ষ, আশ্বিন-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। ৫. 'নবসংস্করণ' প্রথম প্রকাশ- ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। ৬. 'কবয়ঃ' প্রথম প্রকাশ- প্রবাসী, বৈশাখ-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ৭. 'বানপ্রস্থ' প্রথম প্রকাশ- ভারতবর্ষ, পৌষ-মাঘ-১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। ৮. 'অন্তরীক্ষে' প্রথম প্রকাশ- শনিবারের চিঠি, আশ্বিন-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ৯. '১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮' প্রথম প্রকাশ- শনিবারের চিঠি, মাঘ-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ১০. 'আকাশ নীল' প্রথম প্রকাশ- শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। 'দশভাণের' পরবর্তী সংস্করণে আরও পাঁচটি একাঙ্ক নাটক যুক্ত হয়ে 'দশভাণ ও আরো কয়েকটি' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় সংস্করণের যুক্ত পাঁচটি একাঙ্ক- 'কবিতা বিভ্রাট', 'ঝুলন পূর্ণিমা', 'ক্লিওপেট্রা', 'নমুনা' এবং 'অশ্রুর উৎস'।

শিক কাবাব সন্ধ্যার অন্ধকারে নারী সম্ভোগ বাসনায় একটি বাগানবাড়িতে সমবেত হয়েছে জমিদার, তার মোসাহেব পান্নালালবাবু, বন্ধু জীবনধন আর দুই খানসামা শিবু ও করিম। একদিকে তাদের মদ মাংস সহযোগে লালসাপূর্ণ কথোপকথন, অন্যদিকে পর্দার অন্তরালে বন্দিনী এক অসহায়া নারীর করুণ-ব্যথিত জীবনযন্ত্রণা-দুই বিপরীত ঘটনাবৃত্ত নাট্যকাহিনিকে পরিণতির পথে নিয়ে গেছে। নমুনা বাস্তব সমাজ প্রেক্ষাপটে রচিত বনফুলের আর একটি একাঙ্ক 'নমুনা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপ্রসূত খাদ্যসংকট, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর বাংলাদেশের সমাজ-জীবনকে ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত করেছিল। যুদ্ধক্লান্ত বাংলাদেশের খাদ্যসংকটের একটি চিত্র ধরা হয়েছে নাটিকাতে।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'শৃন্বত্ত্ব' নামক একাঙ্কটি। স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বিতা, নির্ভিকতা বনফুল শিল্পীপ্রাণকে প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে। পরাধীন দেশের দুর্বল-ভীরু মানুষের কাছে তিনি ছিলেন নতুন আলোর দিশারী। একদা তাঁর বাণী ও কর্মধারা উজ্জীবিত করেছিলো দেশের অগণিত মানুষকে। তারপর বহুদিন হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে।কিন্তু সমাজ তার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে একেবারে। সেই আদর্শহীন সমাজের অন্ধকারদিকগুলিকে তুলে আনতেই এই একাঙ্কের অবতারণা। আসলে বিবেকানন্দের বাণীর অন্তরালে নাট্যকার বনফুলের তথা শিল্পী বনফুলের মানুষ গড়ার, দেশ গড়ার, আন্তরিক ইচ্ছার কথাই ব্যক্ত। শৃন্বত্ত্ব'-এই ডাকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রকৃত অর্থে আমাদেরই আহ্বান করলেন- সমাজ শোধনের জন্য। মানুষ হওয়ার জন্য।

জীবনের শেষ পর্বে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বনফুল 'ত্রিনয়ন' নামে একটি একাঙ্ক সংকলন প্রকাশ করেন। তিনটি একাঙ্কের সংকলন 'ত্রিনয়ন'। 'ঠুংরি', 'চ-বৈ-তু-হি' এবং 'কৈকেয়ী'। এই সংকলনের 'কৈকেয়ী'কে বাদ দিলে বাকি দুটি নাটকে দেখা গেল সমকাল ও সমাজের প্রতি নাট্যকারের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কটাক্ষ। সংকলনের প্রথম নাটক 'ঠুংরি' একটু ভিন্ন স্বাদের। নাটকের নায়ক তার কল্পনার জগতে বিচরণ করেছে। সেই কল্পনার জগতে আবির্ভাব ঘটেছে একটি রেলগাড়ির। রেলগাড়িটিতে বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ উঠছে এবং তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ব্যাপারে নিজ নিজ মত প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাদের সেই মতামতের মধ্য দিয়েই সমাজের টুকরো টুকরো ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছে। কথা এবং কাজের মাঝখানে যে একটা দূরত্ব থাকে-তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বনফুল এই একাঙ্কটিতে।

'চ-বৈ-তু-হি' নাটকেও নাট্যকার বনফুলের তীক্ষ্ণ সমাজ-বিশ্লেষণ ধরা পড়ল। সংস্কৃতি নামক আপাত ভড়ং-এর আড়ালে যে অনাচার ও কেচ্ছা লুকিয়ে আছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে এই নাটকে।

প্রকৃত অর্থে বনফুল ছিলেন জীবন-শিল্পী। জীবনের গভীরতর প্রদেশে ডুব দিয়ে বনফুল বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে তুলে এনেছেন। সেই অনুভূতি কখনও উপন্যাসে, কখনও ছোটগল্পে আবার কখনও নাটকে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা বিদ্রূপাত্মক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। এই বিদ্রূপের সাহায্যে বনফুল সমাজ দেহের অন্তঃস্থিত ফাঁক এবং ফাঁকিগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

জোছন দস্তিদার :

বাংলা নাটক বহুকাল ধরে পৌরাণিক কাহিনি, সমাজ সংস্কার, দেশাত্মবোধক আন্দোলনকে ভিত্তি করে রচিত হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাগের ফলে তার বিষয়বস্তুতে ঘটে গেল আমূল পরিবর্তন। সমাজ জীবনের এই আকস্মিক বিপর্যয়ে সৃষ্টি হল লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের, যাদের ঘর নেই পরিবার নেই, সমাজ নেই অথচ বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। এই অবক্ষয় শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে স্বাভাবিকভাবে তা বৃহৎ গোষ্ঠীতে রূপ নিয়েছিল। এই সামাজিক বিশৃঙ্খলা সাহিত্যকেও করেছিল প্রভাবিত। নাটকে একক নায়ক চরিত্রের পরিবর্তে স্থান পেল বৃহত্তর গোষ্ঠী জীবনের বহির্মুখী সমস্যা। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' - ই প্রথম সেই সার্থক গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। এরপরে এই ধারাকে যে সকল নাট্যকারগণ আরো বেশি শক্তিশালী করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, জোছন দস্তিদার।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে জোছন ঘোষ দস্তিদার একজন প্রতিভাবান নাট্যকার। পঞ্চাশের দশক থেকেই তাঁর নাট্য রচনার সূত্রপাত। দীর্ঘ চার দশক ধরে তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে বহু পূর্ণাঙ্গ, পথনাটক, একাঙ্ক নাটক রয়েছে। তাঁর নাটকের মূল বিষয় হলো শ্রমজীবী মানুষের বেকারত্ব, খাদ্য সংকট, যার ফলশ্রুতিতে শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ এবং এক হয়ে লড়াই করার আহ্বান। তাঁর নাটকের চরিত্ররা কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবন চালায়। আবার কেউ চাকরি চেষ্টা করে ব্যর্থ। কেউবা কারখানা বন্ধ থাকায় কর্মসংস্থান টুকুও হারিয়ে ফেলেছে। সামাজিক নাটকের বিষয়ও আবর্তিত হয়েছে পরিবারের অর্থনৈতিক আবহাওয়াকে ঘিরে। আটপৌরে ভাষায় চরিত্রগুলিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক গুলির মধ্যে আছে 'অন্তরীন', 'দুই মহল', 'নবারুণ', 'কর্ণিক', 'পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ', 'বিংশোত্তরী', 'স্বর্ণগ্রন্থি', 'অমর ভিয়েতনাম', 'আজকের স্পার্টাকাস' - প্রভৃতি। এছাড়াও দীর্ঘ চার দশক ধরে লিখিত পথনাটক যার অধিকাংশ হারিয়ে গেছে মাত্র ৬ খানি পাওয়া গেছে সেগুলি হল- 'আমরা ভুলিনি', 'কুশের পুতুল', 'রেফারির বাঁশি', 'রাজা আসছে', 'শ্মশানে তাত্ত্বিক', 'কুমিরের কান্না',। পথনাটক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশাপাশি একাঙ্ক নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা একাঙ্ক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চর্পট', 'পাঁচটা থেকে সাতটা', 'পঙ্গপাল', 'জীবনের গান' প্রভৃতি। তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকের চরিত্র গুলির মধ্যে আছে ঠিকেদার, শ্রমিক, দর্জি, মজুর, কেরানী, মস্তান, ড্রাইভার, মাস্টার, ভাগচাষী, গ্রাম্য মহিলা, তথাকথিত জনদরদী নেতা। তাঁর একাঙ্ক নাটকের বিষয় আবর্তিত হয়েছে শ্রমজীবি মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই। অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকারত্ব, বিপর্যস্ত পরিবহন ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে একাঙ্ক নাটকের মূল বিষয়।

পরিমল গোস্বামী (০১.০৯.১৮৯৭-২৭.০৬.১৯৭৬) :

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক। যিনিপ্রবন্ধ, রসরচনা, ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি রতনদিয়ারাজবাড়ি, ফরিদপুর এ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক-কলমী ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রসরচনা ওব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করেছেন। তিনি সাহিত্যিক পিতা বিহারীলাল গোস্বামীর

কাছে থেকে সাহিত্য রচনারপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি এম.এ.পরীক্ষায় পাশের পর 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি৩৯; পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তিনি কিছু সময় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক রূপে কাজ করেছেন। তিনি নাটক রচনাতেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল— দুষ্মন্তের বিচার' (১৯৪৩), 'নামক নাটকটি' ৩৯; (১৯৪৪), 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬), 'ট্রামের সেই লোকটি' ৩৯; (১৯৪৫), 'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৯৪৫), 'মার্কালেঙ্গে' (১৯৫০), 'পুরুষের ভাগ্য', 'স্মৃতিচিত্রণ', 'দ্বিতীয় স্মৃতি', 'পত্রস্মৃতি', 'আমি যাদের দেখেছি', 'যখনসম্পাদক ছিলাম', 'পথে পথে, 'ম্যাজিক লণ্ঠন', 'সপ্তপঞ্চ', 'স্কুলের মেয়েরা ৩৯ ও 'মহামন্বন্তর' প্রভৃতি। পরিমল গোস্বামীর উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক গুলি হল 'ঘুঘু' (১৩৩৯-৪১) গ্রন্থের অন্তর্গত একাঙ্ক নাটক গুলি হল 'ঘুঘু', 'পিপাসা', 'স্বামী-সন্ধান', 'রায় গৃহিণীর শাড়ী', 'গুপ্তধরা', 'ময়ূর পুচ্ছে কাক' ৩৯, 'সাপ্তাহিক সমাচার', 'গোলমাল নিবারণী সমিতি', 'দন্তপ্রলয়', 'হেমলতার বিবাহ', 'সরষের তেল' ৩৯, 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বীরবাহুর ঈর্ষা' ও শ্মশাননাট্য ইত্যাদি। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জনগণ ও পরিবেশ সঙ্গে দেশ কাল পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (০৪.০২.১৯১৮-০৬.১১.১৯৭০) :

বাংলা সাহিত্যের একাঙ্ক নাটক রচনায় ও নিজস্ব নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বহুমুখী সৃজন প্রতিভার অধিকারী। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি শিশুনাট্য, বেতারনাট্য, একাঙ্ক নাটক ও কৌতুক নাটকের মত বিভিন্ন শ্রেণির নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক গুলো হল 'রামমোহন' (১৯৫৯), আগন্তুক (১৯৬২) ইত্যাদি। তাঁর স্মরণীয় একাঙ্ক নাটক গুলো হল- 'এক সন্ধ্যায়', 'ভাড়াটে চাই' (১৯৫৭), 'বারোভূতে' (১৯৫৯), 'যযাতি' ও 'লগ্ন' ইত্যাদি।

'ভাড়াটে চাই' একাঙ্ক নাটকে ভূপেন বাবুর ঘর ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত জীবন সংকটের করুণ ও বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করেছেন এই নাটকে। আবার তিনি 'বারোভূতে' নামের একাঙ্ক নাটকে একটি ক্লাবের সদস্যদের নাটক অভিনয় করে অর্থ খরচ করার পরিবর্তে তিন হাজার টাকা ত্রাণ তহবিলে পাঠানোর মাধ্যমে কৌতুকপ্রদ আখ্যান হাজির করেছেন নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সুনীল দত্ত (০৬.০৬.১৯২৯-২৫.০৫.২০০৫) :

একজন প্রখ্যাত জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা, চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, রাজনীতিবিদ। তিনি ভারতীয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর আসল নাম ছিল বলরাজ দত্ত। তিনি ভারতীয় বিশিষ্ট অভিনেত্রী ফাতিমা রশিদ ওরফে নার্গিসকে বিবাহ করেন। তিনি একাঙ্ক নাটক রচনায় বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯৫৫ সালে হিন্দি চলচ্চিত্র 'রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম' সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে 'এক হাই রাস্তা'(১৯৫৬), ও 'মাদার ইন্ডিয়া'(১৯৫৭) মতন বহু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ভারতীয় সিনেমার বহু খ্যাত অভিনেত্রী ও অভিনেতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন। তিনি সাহিত্য রচনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ছিলেন। বিশেষ করে একাঙ্ক নাটক রচনাতে তাঁর দক্ষতা ও নানন্দিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটকগুলি হল 'কুয়াশা', 'বন্ধনহীন গ্রন্থি', 'দানব', 'নিশির ডাক', 'স্মৃতিচিহ্ন', 'রাত কবে শেষ হবে' (১৩৭৬), 'মুক্তির স্বাদ' (১৩৭৭), ও 'হবু রাজার দেশে'

(১৩৮১) ইত্যাদি। তাঁর রচিত দুটি খ্যাত গ্রন্থ হল 'লুঠতরাজ' (১৯৫২), ও 'ত্রিনয়ন' (১৯৫৮)। এই গ্রন্থের মধ্যে তৎকালীন সমাজের সমকালীন বাস্তবতার স্বরূপকে তুলে ধরেছেন।

বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) :

বিধায়ক ভট্টাচার্য বাংলা নাট্যজগতের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার। শুধুমাত্র নাট্যকার হিসেবেই নয় একজন যথার্থ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে একথা চিরস্মরণীয় যে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সারির কয়েকজন বিশিষ্ট মঞ্চ অভিনেতা ও সফল নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। শুধু মঞ্চে বা থিয়েটারেই নয় অভিনেতা হিসাবে বিধায়ক ভট্টাচার্য বাংলা চলচ্চিত্রে ও অভিনয় করেছেন। তবে এ কথা যথার্থ যে অভিনেতা বিধায়ক ভট্টাচার্যের থেকে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত কয়েকটি বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক মেঘমুক্তি (১৯৩৮), 'মাটির ঘর' (১৯৩৯), 'বিশবছর আগে' (১৯৪১), 'চিরন্তনী' (১৯৪২), 'রাজপথ' (১৯৪৯) ইত্যাদি তবে শুধু পূর্ণাঙ্গ নাটক নয় একাঙ্ক নাটক রচনাতেও বিধায়ক ভট্টাচার্য যথার্থ পারদর্শী ছিলেন।বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'কান্নাহাসির পালা' বইটিতে একাঙ্ক নাট্য রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তার রচিত 'উজানযাত্রা' 'ক্ষুধা' বিখ্যাত নাটকগুলিও একাঙ্ক নাটক শ্রেণিভুক্ত। তার এই সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে সমাজ- দেশ, নানা বাস্তবিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে।

মনোজ মিত্র (১৯৩৮ সাল ২২শে ডিসেম্বর) :

বাংলা নাট্যজগতের সাম্প্রতিক কালের একজন বিখ্যাত এবং কৃতি নাট্যকার মনোজ মিত্র। বর্তমান সময়ে এই দেশে নাটক রচনা, অভিনয় এবং প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে নতুন ধারার সূচনা করেছেন যারা তাদের মধ্যে অন্যতম নাট্যকার মনোজ মিত্র। ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ -সময়কাল ধরে তিনি একাগ্রতার সঙ্গে নাটকের সাধনা করেছেন। তাঁর নিরলস চেষ্টা এবং নাটকের প্রতি ভালবাসা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই কথা অনস্বীকার্য মনোজ মিত্রের নাট্যকর ক্ষেত্রে তার বিষয় ভাবনার বৈচিত্র্য বাংলা নাট্যজগতে তাকে পৃথক স্থানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সাজানো বাগান' 'অশ্বত্থামা' 'নেকড়ে' 'রাজদর্শন' 'শিবের অসাধ্য' ইত্যাদি। শুধু পূর্ণাঙ্গ নাটকই নয় বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনারও একজন সার্থক নাট্যকার মনোজ মিত্র। মনোজ মিত্র রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল' এই একাঙ্ক নাটকটি ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে থিয়েটার সোটার কর্তৃক আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার অভিনীত হয় এবং প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়া মনোজ মিত্র রচিত একাধিক একাঙ্ক নাটক তার তিনটি একাঙ্ক সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মনোজ মিত্র রচিত কতগুলি বিখ্যাত একান্ত নাটক 'পাখি' 'তক্ষক' 'কাল বিহন্য' 'আমি মদন বলছি' 'চোখে আঙ্গুল দাদা' 'সন্ধ্যাতারা' 'তেতুলগাছ' 'মহাবিদ্যা' 'নৈশভোজ' 'চমচম কুমার' ইত্যাদি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) :

মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে নাট্যকার রূপে পরিচিত। তবে নাট্যকার রূপে বাংলা সাহিত্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়নি তার আবির্ভাব হয় কবি হিসাবে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কবিরূপে বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ করলেও চির স্মরণীয় থাকবেন একজন সার্থক নাট্যকার হিসেবে। কারণ একথা অনস্বীকার্য

তিনি আধুনিক কালে নাট্যজগতের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৩ সালে গান্ধর্ব পত্রিকায় প্রকাশিত কণ্ঠনালীতে সূর্য নাটকটি প্রকাশ্যের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাট্যজগতে তিনি যাত্রা শুরু করেন। মূলত প্রথম পর্বে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। তার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত নাটক 'প্রথম পার্থ' 'রাজরক্ত' পরবর্তী সময়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন একাঙ্ক নাটক রচনার ক্ষেত্রে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত কতকগুলি বিখ্যাত একান্ত নাটক 'রিভ' 'বাজপাখি' 'সোনার পাখি' 'মাছি' 'লাঠি' 'ভূত' 'তকা বিপর্যয়' ইত্যাদি।

বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮) :

বিজন ভট্টাচার্য বাংলা নাট্য জগতের এক চিরস্মরণীয় নাম। পরাধীন ভারতের বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের পথচলা শুরু। নাট্যজগতে তার পদার্পণের চারের দশক নানা কারণে বাংলা তথা সমগ্র দেশবাসীর কাছে অস্থিরতার দশক। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা দেশভাগ সবকিছু নিয়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তার নাটকের সমৃদ্ধ করে তুললেন। অস্থিরতার দশকে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মাথায় নিয়ে যে কয়েকজন নাট্যকার বাংলা নাটক এবং থিয়েটারকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ এবং সক্রিয় যোদ্ধা। তাই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে এসেছে সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র এবং শোষণ শাসনের প্রতিরোধ সম্মিলিত মানুষের গণ-সংগ্রামের কথা। বিজন ভট্টাচার্যের সেই প্রতিরোধী চেতনার প্রতিফলন আমরা পাই তার বিখ্যাত 'নবান্ন' 'দেবীগর্জন' 'গোত্রান্তর' 'অবরোধ' ইত্যাদি নাটকে। বিজন ভট্টাচার্য শুধু পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের কথা তুলে ধরেননি। তিনি বেশ কিছু একাঙ্ক নাটক ও রচনা করেন। তার রচিত একাঙ্ক নাটকগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। একটি শ্রেণিতে দৃশ্য যুক্ত একাঙ্ক নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। এই শ্রেণির কয়েকটি বিখ্যাত একাঙ্ক নাটক 'আগুন' 'জীবনানন্দী' 'কলঙ্ক' 'জিয়েন কন্যা' ইত্যাদি। আরেকটি শ্রেণি সেই একাঙ্ক নাটক কোন দৃশ্য ভাগ নেই এই শ্রেণির নাটক গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মরাচাঁদ' 'জননেতা' 'সাগ্নিক' 'চুল্লি' 'হাঁসখালির হাঁস' ইত্যাদি।

উৎপল দত্ত :

উৎপল দত্তের বর্ণময় প্রতিভার বহুকৌণিক আলোকবিচ্ছুরণ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, তাত্ত্বিক, আচার্য এই চতুর্মুখ ব্রহ্মার মতো উৎপল তাঁর সৃজনে বারবার সৃষ্টিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রিচার্ড শেখ্‌নার সম্পাদিত পত্রিকা 'দ্য ড্রামা রিভিউ' (টিডিআর) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনজন নাট্যপরিচালকের মধ্যে উৎপলকে অন্যতম বলে মান্যতা দিয়েছিল। যদিও রিচার্ড শেখ্‌নারের বিতর্কিত মার্কিন 'লিভিং থিয়েটার'কে উৎপল 'অপসংস্কৃতির কবর খানা' বলে তুলোধনা করেছেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বিচার করলে উৎপলের নাট্যসৃষ্টির ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য বিস্ময়কর। উৎপল দত্ত রচিত মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক, অনুবাদনাট্য, যাত্রাপালা ও পথনাটকের সংখ্যা ১০০-র বেশি। এর মধ্যে ৯০টি নাটক প্রকাশিত ও গ্রন্থিত। উৎপল দিকপাল পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানী। বহু মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কবি ও ছোটগল্প লেখক। তিনি মূল স্রোতের বাণিজ্যিক ছবির শীর্ষ অভিনেতা এবং কয়েকটা কলোত্তীর্ণ সিনেমার অমর চরিত্রস্রষ্টা। উৎপল ক্রান্তিদর্শী রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও সম্মোহনী বাগ্মী। তিনি অগ্নিগর্ভ রাজনীতির নায়ক।

'ইতিহাসের কাঠগড়ায়' ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একাঙ্কিকা। 'কঙ্গোর কারাগারে'-র পটভূমি কঙ্গোর মুক্তিসংগ্রাম। 'সভ্যনামিক'-এর বিষয়বস্তু অভিজাত সমাজের মুখোশ-পরা মানুষের জীবনের পঙ্কিলতা। এতে এলিন উইলিয়ামসএর একটি নাটকের প্রভাবের কথা উৎপল উল্লেখ করছেন। এই তিনটি একাঙ্কিকাই একত্রে প্রকাশ করেন জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪ (৯.৫.১৯৬৭), দ্বিতীয় প্রকাশ ১ নভেম্বর ১৯৭৬। 'কঙ্গোর কারাগারে' একাঙ্কিকাটি 'ষাটের দশক/উৎপল দত্তের পথনাটিকা' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ৪৪-৪৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'আজকে আমার ছুটি' একাঙ্কিকার পরিপ্রেক্ষিত পাক-ভারত যুদ্ধ। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার চতুর্দশ সংখ্যায় (১৯৭১?)। সমগ্র নাটিকাটি আসলে উৎপলের 'শোনরে মালিক' পালার (বিবেক যাত্রা সমাজ, টালিগঞ্জ অগ্রগামী ময়দান, ১৯৬৯) তৃতীয় দৃশ্য। 'কাকদ্বীপের এক মা' কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। দুটি একাঙ্কিকাই প্রথম প্রকাশ করেন জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। (দ্র. 'উৎপল দত্তর নির্বাচিত নাটা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬/ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৪৬-৬০, ৬১-৭৪) নাটক সমগ্রের এই খণ্ডে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ অনুসৃত হয়েছে। লিটলথিয়েটার গ্রুপ বা পিল লিটলথিয়েটার এই একাঙ্কিকাগুলির অভিনয় করেছে বলে জানা যায় নি।

একক - ৩

দেবী : তুলসী লাহিড়ী

বাংলা নাট্যজগতে অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় নাট্যকার হলেন তুলসী লাহিড়ী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই নাট্যকারের নাট্যরচনার শক্তি বাংলা নাট্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, মন্বন্তর, দেশভাগের ফলস্বরূপ মানুষের জীবনযাত্রায় যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল সেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত পটভূমিতে বাংলা নাট্যজগতে পদার্পণ করেছিলেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। তাঁর নাটকের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে। মানুষের জীবনের শুধুমাত্র উপরিভাগের সমস্যাই নাট্যকারের শিল্পীসত্তাকে আন্দোলিত করেনি, জীবনের গভীরে প্রবেশ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিরন্তর নিয়োজিত ছিল তাঁর শিল্পীমন। তারই সার্থক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকগুলিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর, কৃষক জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং অভিজ্ঞতারই রূপায়ণ ঘটেছিল তার 'দুঃখীর ইমান' নাটকটিতে। ১৯৪৬ সালে 'দুঃখীর ইমান' প্রথম অভিনীত হয় শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে। নাটকটি তৎকালীন নাট্যমঞ্চগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই নাটকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কৃষকদের প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি, শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সময় নাট্যকার ১৯৪৯ সালে 'পথিক'- নাটকের মধ্যে দিয়ে 'বহুরূপী'র সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন। নাট্যকার কয়লা খনির শ্রমিকদেরকে কেন্দ্র করে এই 'পথিক' নাটকটি রচনা করেছিলেন। কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে যারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই কৃষক-শ্রমিকদের জীবন নিয়ে নাটক রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী।

পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এর রংপুর জেলার গাইবান্দা সাবডিভিশনের নলডাঙ্গা গ্রামে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর জন্ম। তাঁর আসল নাম ছিল হেমচন্দ্র লাহিড়ী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ছাত্রাবস্থায় জড়িয়ে পড়ায় তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। পরে নতুন স্কুলে ভর্তির সময় অভিভাবকেরা পারিবারিক কৃষ্ণ আরাধনার সূত্রে নামকরণ করেন তুলসী লাহিড়ী এবং এই নামটি শেষপর্যন্ত স্থায়ী হয়। কলকাতা, রংপুর, কোচবিহার এই তিনটি স্থানে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। স্নাতক হওয়ার পর তিনি আইন (Law) পাশ করেন। সঙ্গীত নিয়েও তিনি মরিস কলেজে পড়েছিলেন। এই বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন কোচবিহারের রাজগায়িকা হারাবাঈ। তাঁর সঙ্গে তুলসী লাহিড়ীর সংযোগ গড়ে ওঠে পিতামহ শিবচন্দ্রের সূত্রে। শিবচন্দ্র ছিলেন কোচবিহার রাজার ঘনিষ্ঠ এবং উচ্চপদের একজন রাজকর্মচারী। তাঁর পিতা ডিমনা টি এস্টেটের ম্যানেজার। তিনি আলিপুর কোর্টে ওকালতি শুরু করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাহিত্য, সঙ্গীতের জগৎ ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র। সুরকার, গীতিকার এবং নাটকে সঙ্গীত পরিচালক রূপে তাঁর স্বীকৃতি সর্বজনবিদিত। তিনি চলচ্চিত্রও পরিচালনা করেন। সাহিত্যচর্চার হাত ধরেই নাটকের জগতে তাঁর প্রবেশ। শেষপর্যন্ত নাটক রচনা এবং নাট্যাভিনয়, গণ-নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তি তাঁকে দিয়েছে যোগ্য স্বীকৃতি। ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এক সময় তিনি গণনাট্য সংঘের সভাপতি হয়েছিলেন পরে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে

'বহুরূপী'তে যোগ দেন, সেখান থেকে বেরিয়ে 'আনন্দম' ও 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০) ও দুঃখীর ইমান' (১৯৪৩) তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুধু নয়, গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাইলস্টোনও বটে।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশাপাশি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নববর্ষ', 'নায়ক', 'গ্রীনরুম', 'ওলটপালট', 'মনিকাঞ্চন', 'চৌর্যানন্দ' এবং অবশ্যই 'দেবী'। 'দেবী' নাটকটির পটভূমি কয়লাখনি সন্নিহিত জঙ্গল পরিবেষ্টিত বনবাংলো (Forest Banglo)। এই নাটকে মোট চরিত্রের সংখ্যা চার। এরা হল কয়লাখনির ম্যানেজার নিতাইবাবু, থানার দারোগাবাবু মি. ঘোষ, বাউড়ি নারী শুখনি ও চৌকিদার গোবর্ধন।

'দেবী' নাটকটি শুরু হয়েছে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর, সমাপ্তি রাত্রি বারোটার মধ্যে অর্থাৎ Unity of time যথার্থ। স্থান বনবাংলো এবং সন্নিহিত জঙ্গল, সেখানে নাট্যঘটনা সংঘটিত হয়। Unity of action স্বাভাবিক, আর Unity of place-ও পুরোপুরি বজায় থেকেছে। নাট্যকাহিনি একমুখী লক্ষ্য নির্দিষ্ট। কয়লাখনির ম্যানেজার নিতাইবাবু অপেক্ষমান এক সন্ধ্যায় বনবাংলোতে স্থানীয় থানার বড়বাবুর সঙ্গে ফুর্তি করে রাত কাটাবেন ভেবেছিলেন, বড়বাবু মি. ঘোষের আসতে দেরী হওয়ায় তিনি চঞ্চল হয়ে চৌকিদার গোবর্ধনের সঙ্গে তখন রাতের খাবার নিয়ে আলোচনায় রত। সেই আলোচনার মধ্যে উঠে আসে হাজারিবাগের এই জঙ্গলের এক ভয়ানক বাঘিনীর সাম্প্রতিক উপদ্রবের কথা। অবশেষে দেরীতে মি. ভোস আসেন। সঙ্গে আসে বিবাহিত বাউড়ি নারী শুখনি (অভাবে-ধরিতে হতশ্রী, শারীরিক অপটু সে, তার নামকরণে এই বিষয়টি স্পষ্ট) খাওয়া-দাওয়ার ও অন্যান্য জিনিস বহন করে। বাংলোর কিছু দূরে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে শুখনিকে বাহকের কাজে নিয়েছে মি. ঘোষ বাবু। মাছ-মাংস সহ তাদের ফুর্তি চলে বেশ খানিকক্ষণ। শুখনি মালপত্র বহনের জন্য চারআনার পরিবর্তে দুটি টাকা চায়, কারণ ঐ টাকায় সে একটা দিন ছেলেগুলোকে হাসতে দেখতে চেয়েছে।

অভাবের তাড়নায় নিজের শরীরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতেও শুখনি দ্বিধা বোধ করেনি। অভাব তার মাতৃত্বকে এমন এক পরিস্থিতির সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে যে, সে দুটি টাকার বিনিময়ে নিজেকে ভোগ্য পণ্য করেও সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছে। দু'বছর আগে মরদ মারা যাবার পর সাপ্তাহিক ৭৫০ টাকার বিনিময় কাজ করে শুখনি কঠিন জীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। অভাবকে শুখনি জয় করতে পারেনি, দারিদ্রতাকে সঙ্গে নিয়েই সংসার ও সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চিন্তায় নিজেকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি টাকার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে—

'শুখনি — বাবু। একা বিটি ছেইলা চাইরটা প্যাট খোরাকী চালাইতে হয়।

নিতাই — খেটে খেতে পারিস না

শুখনি — খাদে কামিনের কাজ করিত।

নিতাই — তবে

শুখনি — ৭৫০ টাকা হপ্তা

নিতাই — সস্তায় চাল ডাল ত পাস

শুখনি — খালি চাল, ডাল হইলে হবে, আনাজ পাতি, নুন, তেল কাপড় চোপড়, ছেইলা গুলার পরাণ নাই, বূটী হপ্তায় আট আনার বিড়ি খায়। বাবু রোজ একটা ম্যাচবাতি গেল এক টাকা। এ বার পোষ পরবে একদিন পিঠা দিতে পারি নাই ছেইলাদের। উয়ারা কুখা পাবেক মা বটি ত, আমাকেই দিতে হবেক।'

সন্তানদের জন্য শুখনির মাতৃত্ব শুখনিকে সাহস দিয়েছে। তাই বাঘিনীর ভয়কে তথা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে গভীর রাত্রে নিতাই ভোস বাবুদের কাছে এসেছে শুখনি।

মদ্যপানের পর শুখনির শুকনো কালো শরীরটাকে ভোগ করার ইচ্ছা তাদের মনে জাগলেও শেষ পর্যন্ত ভোগ না করেই দুটি টাকা দেন এবং অতঃপর গভীর রাতে শুখনি দুটি টাকা নিয়ে তার কুটিরের দিকে যখন এগোতে থাকে তখন অতর্কিত আক্রমণ করে সেই নরখাদক বাঘিনী। শুখনি রক্তাক্ত হয়। তার সঙ্গে থাকা ছুরি হাতে তুলে নিয়ে বাঘিনীকেও সে জখম-খতম করে। শুখনিরও মৃত্যু হয়, তার বাম হাতে রাখা দুটি টাকা রক্তাক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। নিতাই, মি. ভোস, গোবর্ধন ঘটনাস্থলে এসে একাধারে রক্তাক্ত শুখনিকে দেখে বিস্মিত, চমকিত হয়। তাদের বোধদয়ও ঘটে। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে শুখনি ছিল আপনভাবে। সে সন্তানদের জন্য সমস্ত কষ্ট-দুঃখ অত্যাচার সহ্য করেও এগিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে। বাঘিনী 'দেবী'কে মেরে ফেলে নিজেও শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেই হয়ে ওঠে দেবী। একদিকে সন্তানদের জন্য অপার স্নেহ, তাদের মুখে অন্ন জোগানোর দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের জন্য সমাজের বিত্ত-ক্ষমতাশালী মানুষজনের অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনায় তার আত্মনিগ্রহ, সন্তান বাৎসল্যের পাশে মানবের পাশব প্রবৃত্তি-শক্তির শিকার হয়ে জঙ্গলের পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখা, এসব কিছু অনবদ্য করে তুলেছে এই নাটকের কাহিনিকে এবং মুখ্য চরিত্ররূপে শুখনিকে। একাঙ্ক নাটকের সকল বৈশিষ্ট্যই তুলসী লাহিড়ীর 'দেবী' একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে উপস্থিত। সবমিলিয়ে, কাহিনি, সংলাপ, চরিত্রসৃজন এবং তত্ত্বের দিক থেকে এটি একটি সার্থক একাঙ্ক নাটক একথা আমাদের বলতেই হবে।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী বেশ কয়েকটি পূর্নাঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার শুধুমাত্র পূর্নাঙ্গ নাটক-ই রচনা করেননি, তারসঙ্গে একাধিক একাঙ্ক নাটকও লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঠিত একাঙ্ক নাটক 'দেবী'। নাট্যকারের অনবদ্য সৃষ্টি 'দেবী' একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দর্শক ও পাঠকের হৃদয় ভাণ্ডারে গভীরভাবে রেখাপাত করেছেন। এই একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে দিয়ে শুখনির দেবী হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নিতাই এবং ভোস সাহেবদের কাছে যা কিছু সামান্য, তা শুখনির কাছে অনেক। গোবরারা এবং সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষজন শুখনির অভাব, অভিযোগ এবং চরিত্র নিয়ে খারাপ ধারণা পোষণ করলেও, কখনওই গভীরভাবে শুখনিদের জীবন পর্যালোচনা করে না। শুখনিরা স্বেচ্ছায় ভোগ্যপণ্য হতে এই জীবনে নেমে আসে না। পারিবারিক, সামাজিক দায়বদ্ধতা, জীবনসংগ্রামের লড়াই-এ শুখনিদের একাধিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে চলতে হয়। যে সম্পর্কে গোবর্ধন, নিতাইবাবু, ভোসসাহেব কোনোদিনই খোঁজ রাখেননা, বা প্রয়োজন বোধ করেননা। শুখনাদের মতো অভাবী মানুষদের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি জানা নেই। এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দিয়ে সম্মুখ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নিতাইবাবু এবং ভোসবাবু। ভোসবাবুকে নিতাইবাবু কথা দিয়েছিলেন দেবীদর্শন করাবেন, কিন্তু তার বদলে অন্য এক কাহিনির উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভোস সাহেবের দেবীদর্শন হয়। এই একাঙ্ক নাটকের অন্য এক চরিত্র গোবর্ধন। যার কাছে মানুষের প্রাণের তুলনায় বাঘের মোছ সংগ্রহ করাই প্রধানতর কাজ বলে মনে হয়েছে। শুখনির

কাছে পারিবারিক দায়বদ্ধতা সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এই দায়বদ্ধতাকেই মাথায় রেখে কঠিনতম বিপথগামী পথে যেতেও সংকোচ বোধ করেনি সে। এই পারিবারিক দায়বদ্ধতা পালন করার ভয়ে সমাজের কোনো মানুষই শুখনির সাথে ঘর বাঁধতে রাজি হয়নি। সমাজের এই করুণ দশা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজ কতটা স্বার্থপর। শুখনির লড়াই সংগ্রাম এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতা আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজে নানা রকম বিদ্রূপ অনাচার অসভ্যতামি সত্ত্বেও জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে কখনও পিছপা হয়নি। দায়বদ্ধতা পালনে নিজের পরিবার, সন্তানের প্রতি কখনও অবহেলা করেনি। সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে তার পরিবারের মুখে অন্ন যোগানোর। নিজের ছোটবেলার কাহিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার দায়বদ্ধতা। আমরা অনেকেই শুখনিদের নিন্দা ও সমালোচনা করি কিন্তু শুখনিরা কেন নিজেকে পণ্য করতে বাধ্য হয়, তা ভেবে দেখি না। এই সমাজ বাধ্য করে শুখনিদের একপ্রকার স্বভাব ও চরিত্র নষ্ট করতে। নাট্যকার খুব সুন্দরভাবেই ভোসসাহেব ও নিতাইবাবুর সংলাপের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন—

'ভোস।। আচ্ছা যাও। গোবর্ধন চলে গেল। নিতাই পুলিশের চাকরি এতদিন করে এইটুকু বেশ ভালো করে বুঝেছি, যে সুরুচি-সুনীতি-আদর্শবান সব কিছু নির্ভর করে আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর। Born criminal খুব কম, economic pressure এ লড়তে লড়তে হয়রান হয়ে শেষে অমানুষ হয়।

[দূরে আর্তনাদ ও গর্জন শুনে ওঁরা চমকে উঠলেন]

কী হলো?

নিতাই।। মেয়েটাকে বাঘে ধরল নাকি।

ভোস।। চলতো- চলতো-

[ভোস এগোলেন বন্দুক নিয়ে]'

একক - ৪

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনন্য কালজয়ী স্রষ্টা। ছোটগল্প, উপন্যাসে তিনি চিরন্তনের যে সৌধ নির্মাণ করে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যের গর্ব। তিনি ছিলেন চিরায়ত একজন সাহিত্যিক। কিন্তু কথাশিল্পী হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যতটা প্রতিষ্ঠিত, নাট্যকার হিসাবে ততটা নয়। এটা ঠিক নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা ব্যতীত তাঁর লেখক ব্যক্তিত্বের পরিচয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তারাশঙ্কর উপন্যাস বা ছোটগল্প লেখার পাশাপাশি সাহিত্য জীবনে অনেক নাটকও লিখেছিলেন। তাঁর নাটকগুলি বিশ্লেষণের আগে নাট্যসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের স্বরূপটি আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নাটকের প্রতি এক গভীর মমতা নিয়েই তিনি বারবার নাট্য রচনার প্রতি, রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন। অনেক বাধা ও ব্যর্থতার মধ্যেও নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি ও সার্থকতার জন্য তাঁর এক দুর্নিবার দুর্বলতার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। যৌবন বয়সে কবি বা সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে নাটককার হবার বাসনাই তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। তাই ছোটবেলায় লাভপুরের বাড়িতে যখন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন, তখন থেকেই গোপনে গোপনে নাটক রচনা করতেন। এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় জানিয়েছেন

> 'আমার রচিত নাটক আমার গ্রামের নাট্যমঞ্চে মহাসমারোহেই অভিনীত হয়েছে। সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি নাটকের মধ্য দিয়েই।'

নাট্যজগতে 'রাতকানা' নামে খ্যাত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহযোগিতায় লাভপুর গ্রামে সাহিত্যসভার আয়োজন হতো। একটি সখের অভিনয়ের আসরও ছিল। তাতে অভিনয়ের জন্য নাট্যরচনা করেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরচনায় হাতেখড়ি। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান। কিন্তু অপরেশ মুখোপাধ্যায় সেটি না পড়েই ফেরত দেন। তবে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন-

> 'তবে তুই যেন ছাড়িস নে। কতকাল আটকে রাখবে।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন যে, সেদিন যদি এই হাল না হত তবে তিনি নাট্যরচনার হাল ছাড়তেন না এবং নাট্যকার হিসেবেই তাঁর পরিচয় হত। যাইহোক, এই হ'ল তাঁর প্রথম নাট্যরচনার ইতিবৃত্ত, এবং এই ঘটনাই তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিল কথাসাহিত্যের দিকে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। রাঢ় বাংলার মানুষ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিধ্বস্ত সামন্ততন্ত্রের উত্তরসূরী। বীরভূম জেলার সদর-সাবডিভিশনের অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে তাঁর জন্ম শিক্ষার সূচনা সেখানে, পরিণতি কলকাতায়। রাঢ় বাংলা বিশেষত বীরভূম জেলার

মানুষ-সমাজ, আঞ্চলিক জীবনযাত্রা, লোকায়ত সংস্কৃতি, অন্ত্যজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি মানুষজনের সমাজবীক্ষা আচার, আচরণ অবশ্যই গভীর জীবনভাবনাকে সুললিতভাবে সাহিত্যের পাতায় তিনি তুলে ধরেন। তাঁকে রাঢ় বাংলার জীবন্ত ভাষ্যকার বললেও ভুল বলা হয় না। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান বীরভূমে ধর্মীয় সংস্কৃতি, পরিবেশ গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর গল্প, উপন্যাসে উঠে এসেছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'রাধা', কালিন্দী', 'সপ্তপদী' ইত্যাদি। তাঁর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যাও দীর্ঘ। গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তারিণী মাঝি', 'জননী', 'জলসাঘর' ইত্যাদি। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দুটি বিষয় প্রাধান্য বিস্তার করেছে- (১) ভেঙে পড়া সামন্ততন্ত্রের করুণ ছবি এবং (২) বীরভূমের আঞ্চলিক জীবনযাত্রা। শিল্পীর অভিজ্ঞান মিলিয়ে তিনি একে একে তুলে ধরেছেন গল্প, উপন্যাসে এবং নাটকে। তিনি 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার (১৯৫৫ খ্রি.) সহ 'জ্ঞানপীঠ' (১৯৬৬ খ্রি.) সম্মানে সম্মানীত হন। তিনি গান্ধিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আই. এস. সি. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের সময়কালীন অন্তরীণ হন। তার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ ঘটে। লাভপুর থাকাকালীন তিনি নাট্যচর্চার সূচনা করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয়। লাভপুরে অতসী মঞ্চে একই সঙ্গে তিনি নাট্য পরিচালনা ও অভিনয় করেন। তাঁর রচিত নাটক হল 'পার্থসারথী', 'পোষ্যপুত্র', 'বঙ্গনারী', 'মন্ত্রশক্তি', 'সরমা', 'কর্ণার্জুন' ইত্যাদি। নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর রচিত কালিন্দী এবং দুই পুরুষ নাট্যভারতী ও নাট্য নিকেতনে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর আর একটি নাটক হল 'পথের ডাক' এবং এটি আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের নাট্যরূপ। বিশ্বরূপা সহ নানা পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে 'দীপান্তর', 'কবি', 'বালাজীরাও' ইত্যাদি তাঁর রচিত নাটকগুলি। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যকার সত্তাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি মাত্র দুটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' এবং 'মহাত্মা শিশির কুমার' (অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশির কুমারের জীবন অনুসরণে)।

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নাটকটি একটি একাঙ্ক নাটক। এই নাটকের মূল বিষয় অজয় নদীর তীরে এক গ্রামে একটি আখড়া ছিল। আখড়ার মালিক কুৎসিত দর্শন গোবিন্দ দাসের বয়স পঞ্চাশ। কুৎসিত হওয়ায় বিয়ের কিছুদিন পরেই বউ সতী পালিয়ে যায়, ভামিনী নাম ধরে অন্য একজন পুরুষ কৃষ্ণদাসের সঙ্গে। পরে যখন সতী গোবিন্দর কাছে এল বিগ্রহ চাইতে তখন, সমস্ত পুরাতন ঘটনার আবির্ভাবের ফলে উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হল, এমন সময় গোবিন্দ অজয়ের জলে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই একাঙ্ক নাটকে লিখেছেন—

'ভামিনী।। তুমি তাকে বলেছিলে, প্রতি বাসরে দশ টাকা করে দেবে।

গোবিন্দ।। বলেছিলাম.....'

একটি বিকেল থেকে পরবর্তী কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ঘটনা সমূহ এ নাটকের অবলম্বন। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নাটকের পটভূমি অজয় নদের তীরে একটি বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে। তাই বলাবাহুল্য এই নাটকেও রয়েছে সেই বীরভূম রাঢ় অঞ্চলের বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের কথা। সবমিলিয়ে চরিত্র সংখ্যা চার। তারা হল আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং সত্ত্বাধিকারী গোবিন্দ দাস, অনৈক্য ব্রাহ্মণ, গোবিন্দ দাসের অনুচর হরি ঘোষ এবং সতী ওরফে বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনী, একসময়ে গোবিন্দ দাসের স্ত্রী। নাট্যবিষয় এবং নাট্যকাহিনি আবর্তিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট আখড়াকে কেন্দ্র করে, কাহিনি একমুখী, আয়তন সীমাবদ্ধ। সবমিলিয়ে একাঙ্ক নাটকের সব বৈশিষ্ট্য এখানে বর্তমান। কাহিনিবৃত্ত, কাহিনির ত্রি-ঐক্য, সংলাপ, চরিত্র সৃজনও স্বচ্ছল-সাবলীল।

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' একাঙ্ক নাটকটির সংলাপ শুরু হওয়ার আগে বর্ণনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দ দাস সম্পর্কে জানান যে, যে কুৎসিতদর্শন 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নামক একাঙ্ক নাটকটি আবর্তিত হয়েছে সতী বা কৃষ্ণভামিনী দাসী ও গোবিন্দ দাসের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণভামিনী দাসী ও গোবিন্দ দাসের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও তার পরিণাম এই একাঙ্ক নাটকের বিষয়। একাঙ্ক নাটকটি শুরু হয় গোবিন্দ দাসের গাওয়া গান দিয়ে। গোবিন্দ দাস আখড়ার মালিক। গোঁসাইও সে। যদিও গোঁসাই সুলভ কোন আচরণ প্রকাশ পায়নি তার মধ্যে বরং বিষয়-আশয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই দর্শিত হয়েছে। গোবিন্দ দাসের আখড়ার পার্শবর্তী অঞ্চলে কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়া। যে আখড়া কিনে নেয় গোবিন্দ দাস। একাঙ্ক নাটকের কাহিনি অগ্রসর হলে দেখা যায় গোবিন্দ দাস অত্যন্ত পরিশ্রম করে এই আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছে। ভিক্ষে করে পয়সা জমিয়ে তা থেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বৈষ্ণবের এই আখড়া। কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়ার দখল নেওয়ার বিষয়ে গোবিন্দ দাস বদ্ধপরিকর সামান্য ঘর ও বিদ্রোহটুকুও তিনি ছাড়তে রাজি নন। ঘটনার এই প্রবাহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দ দাসের ব্যক্তিজীবন জীবন উন্মুক্ত করেন একটু একটু করে। একেবারে শুরুতেই বলা হয়েছে, যে গোবিন্দ দাস কুৎসিত চেহারার। বলিষ্ঠ তার গড়ন। এছাড়াও শুরুতে আর কোন তথ্য মেলেনি। এখানে কুৎসিত চেহারার গোবিন্দ বৈষ্ণবের ছিল ঘর আলো করা স্ত্রী।

নাটকে উল্লিখিত কৃষ্ণভামিনী দাসীই গোবিন্দ দাসের স্ত্রী। গোবিন্দ দাস প্রচুর টাকার বিনিময়ে বিবাহ করেন সতীকে। সতী কৃষ্ণভামিনী দাসীর পূর্বের নাম। কৃষ্ণদাস গোঁসাইকে বিবাহ করে সে নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণভামিনী দাসী হয়েছে। সতী অসম্ভব রূপসী। তার রূপ দর্শন করেই আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করার ব্রত থেকে বিচ্যুত হয় গোবিন্দ দাস। সতী ব্রাহ্মণের মেয়ে। গোবিন্দ দাসও ব্রাহ্মণ। গোবিন্দ দাস চেয়েছে সতীর রূপ অপরদিকে সতীর পিতা চেয়েছে কন্যাপণ। উভয়পক্ষে কেউই সতীর মন বোঝার প্রতি আগ্রহী হয়নি তাই সতী সুযোগ পেতেই বাবার মুখে কালি দিয়েও স্বামীকে অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণদাসের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। জাতি কুল বিসর্জন দিয়ে সে বোষ্টমী হয়। অদৃষ্টের এই আঘাতে গোবিন্দ দাস পাগলপ্রায় হয়। অবশেষে একদিন সে খুঁজে পায় সতীকে। যে নিজে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়ে আখড়ার মালিক হয়ে বসে। পয়সার জোরে সতীকে গোবিন্দ দাস পায়ে দলতে চেয়েছে। তার সে চাওয়া কিছুটা সার্থকও হয়। সতী অর্থাৎ কৃষ্ণভামিনী আসে ভিক্ষা চাইতে গোবিন্দ দাসের কাছে। সে আখড়ার বিগ্রহ ও মাথা গোঁজার ঠাঁই ঘরখানি ফেরৎ চায়। এখানেই তৈরি হয় নাটকীয় সংঘাত। সতী জানত গোবিন্দ দাস যে তার স্বামী এই আখড়ার মালিক। সতীর খোঁজ পাওয়ার প্রথম দিনেই সে কৃষ্ণদাসের আখড়ায় গান গাইতে যায়। তাকে প্রথম দর্শনেই চিনতে পারে সতী। এই প্রথম সতী ও গোবিন্দ দাসের পারস্পারিক সংলাপ নির্মাণ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গোবিন্দ দাসের লোভের প্রতি সতীর আন্তরিক ঘৃণা বারংবার সতীকে যে টাকার বিনিময়ে পেয়েছে, এই বাক্য যন্ত্রণা দেয় সতীকে। অন্যদিকে নিজের কুৎসিত চেহারা, এমনকি জাতি, কুল ত্যাগ করেও সতীর জন্যই গোবিন্দ দাসের অপেক্ষা। প্রবৃত্তি তাড়িত হয়েই সে আহ্লাদী নামক নারীর শয্যায় গমন করেছে। নাটকে নাটককার ঘটনার বিস্তারকে ক্রমে সংকীর্ণ করেন। আজও গোবিন্দ দাস চায় সতীকে। তার সে চাওয়ার কাছে আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত হয় সতী। এক সময় গোবিন্দ দাস বুঝতে পারে যে সতী সন্তানসম্ভবা এবং সে সন্তানের পিতা গোবিন্দ দাস। সতীর সামনে উন্মোচিত হয় গোবিন্দ দাসের স্বরূপ। সতী জানায়—

> 'ভামিনী।। ..... তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম; কিন্তু তবু তোমার পাপের ফল আমার গর্ভে। এরপর ওই বিগ্রহ নয় কলসি ছাড়া আমার আশ্রয় কি বলতে পার? তবে বিশ্বাস কর ওই বিগ্রহকে স্মরণ করেই প্রতি রাত্রে অভিসারে যাত্রা করেছি। প্রণাম করে গিয়েছি। কৃষ্ণদাসের সন্তান ষোল বৎসর হয়নি। এ আমার পঞ্চতপের ফল। এ তোমার সন্তান। প্রভুর দান।'

মুহূর্তে বদল ঘটে গোবিন্দ দাসের। নিজের সমস্ত সম্পত্তি সে কৃষ্ণভামিনী ও তার সন্তানের নামে লিখে দেয়। তারপর অজয় নদীর জলে আত্মাহুতি দেয়। নিজের সমস্ত পাপ, সমস্ত অপরাধ, সমস্ত কলঙ্ক নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই একাঙ্ক নাটকে কৃষ্ণের পায়ে সমর্পিত নারী বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনী দেহ-শরীর নিবেদনের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে সুকণ্ঠের অধিকারী এবং অন্তর ও বাহিরে কুৎসিত দর্শন বিকট মানসিকতার অধিকারী গোবিন্দ দাসের ভোগলিপ্সার পূরণ। এই দুই সমস্যার দ্বন্দ্বে উদ্ভূত জীবন ট্র্যাজেডির বাতাবরণে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ এবং গাঢ় হয়েছে। কামনালোলুপ কঠিন চিত্ত বৈষ্ণব গোবিন্দ দাস দীর্ঘদিনের প্রয়াসে পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের আখড়াকে দখল নিয়ে একসময় জোর করে বিবাহ করা স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীকে হাতের মধ্যে পায়। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে কৃষ্ণভামিনীর কাছে পরাজয় স্বীকারের মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণভামিনীর সাধনাই জয়যুক্ত হয়।

এই একাঙ্ক নাটকটি পাঠ্যসূচীর আলোচ্য ছ-টি নাটকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নাটকের rising action থেকে Exposition পর্যন্ত তীব্র সংঘাতে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব সাধক হয়েও কৃষ্ণদাসের আখড়ার দখল নিতে তৎপর গোবিন্দ দাস যে বীভৎস মানসিকতার পরিচয় দেয়, তা মানুষের অন্ধকার জীবনের অনুকূল সাধনা নয়, বিঘ্নিত ছলনাও অন্তরের বীভৎস কালিমা সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বহিরঙ্গে যেভাবে প্রকাশিত-তা এককথায় অভিনব, অনবদ্য। এমন চরিত্র বাংলা একাঙ্ক নাটকে খুব বেশি নেই। এজন্য নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অভিনন্দন অবশ্যই প্রাপ্য। ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে গোবিন্দ দাসের লোলুপ মানসিকতা, চারিত্রিক দুর্বলতা কল্পনাতুর বিভ্রমতা নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্মাণ হরি ঘোষ এক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। কৃষ্ণভামিনী চরিত্রের বলিষ্টতা আমাদের শুধু আকৃষ্ট করে না আবিষ্টও করে।

গোবিন্দ দাসের বিবাহ স্ত্রী নিজেকে 'সতী' বলেই উচ্চঃস্বরে চিহ্নিত করে। আপন নামের শুদ্ধতা স্বচ্ছতা বজায় রাখার কারণে এবং ঘর ছাড়া হয়েও সে তাঁর সতীত্ব বজায় রেখেছে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির উপর ভর দিয়ে। গোবিন্দ দাসের শ্লেষাত্মক জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানায়

> 'হ্যাঁ, (আমি সতী), কলঙ্কিনী সতী। তুমি কুসুমপুরের গাইয়ে
> কালো গোস্বামী (আর আমি তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী সতী)।'

গোবিন্দ দাসের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলিষ্ঠভাবে জানাতে ভোলে না

> 'লজ্জা আমার নাই। ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। গোঁসাই যাত্রার আসরে অভিমন্যু সেজে মনে হল আমি জন্মজন্মান্তরের উত্তরা।..... লজ্জা ঘিন্না সব ভাসিয়ে দিলাম। (দিয়েছিলাম) অজয়ের জলে। লজ্জা আমার নাই। তোমার লজ্জা নাই কিন্তু মনে তোমার ঘা আছে। সেই ঘায়ে আবার ঘা খাবে। বুকের ভিতরটা তোমার রক্তারক্ত হয়ে যাবে।'

গোবিন্দ দাসের অন্তিম পরিণতি কৃষ্ণভামিনীর গভীর অনুভবকেই সত্য করে তুলেছে এই একাঙ্ক নাটকে। নিরন্তর সাধনা, আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রয়াস সততা ও সতীত্বের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা কৃষ্ণভামিনী ও গৃহিনী 'সতী' চরিত্রে অদৃশ্য প্রকাশ। সমাজজীবন সাধনার পজিটিভিটি শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে, জয়যুক্ত করেছে। এটাই এই একাঙ্ক নাট্যের ক্ষেত্রে বড় কথা।

একক - ৫

রাজপুরী : মন্মথ রায়

মন্মথ রায় (১৬.৬.১৮৯৯-২৬.৮.১৯৮৮) পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল সাবডিভিশনের গালাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন শিক্ষাজীবনে এছাড়া আইন নিয়ে পড়াশুনা করেও সাফল্যলাভ করেন। তিনি কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তারপর দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে যুক্ত হন। তাঁর রচিত উওল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩)। তিনি পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক মিলিয়ে বহু নাটক রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকায় গ্রামগঞ্জে প্রচারের জন্য তিনি যে সব নাটক লেখেন তা হল, 'মাতৃভারতী', 'আমরা কোথায়', 'লাঙল', 'জীবনমরণ', 'এক আকাশ দুই আঙ্গিনা', 'কুষাণ', 'মহাউদ্বোধন', 'যাত্রা হল শুরু', 'মানভঞ্জন', 'সাত ভাই চম্পা' ইত্যাদি। এই নাটকগুলির রচনাকাল ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পুরাণের পটভূমিতে 'চাঁদসদাগর' (১৯২৭), 'কারাগার' (১৯৫০) নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য তিনি রচনা করেন। সংশ্লিষ্ট নাটক দুটিতে সমকালীন পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমোচনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার কারাগার নাটকটি অভিনয় নিষিদ্ধ করেছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলি হল 'কাজলরেখা' (১৯২৩), 'দেবাসুর' (১৯২৯), 'শ্রীবৎস ও মধয়া' (১৯২৯), 'সাবিত্রী' (১১৩১), 'অশোক' (১৯৩৩), 'সাক্ষ্য' (১৯৩৫), 'বিদ্যুৎঋাংস' (১৯৩৭), 'রাজনটা' (১১৩৭), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮), 'ভাঙ্গাগড়া' (১৯৫০), 'মমতাময়ী হাসপাতাল' (১৯৫২), 'পথে বিপথে', 'জীবনটাই নাটক', 'আজব নেশা', 'ধর্মঘট', 'উর্বসী', 'নিরুদ্দেশ' (সবগুলির রচনাকাল ১৯৫৩), 'মীরাবাঈ' (১৯৫৪), 'শ্রীশ্রীমা' (১৯৫৫), 'অমৃত অতীত' (১৯৫৯), 'স্বর্ণকাট' (১৯৬২), 'অমাবস্যা' (১৯৬৩), 'মধ্যউদ্বোধন' (১৯৬৩), 'মহাঅভিসার' (১৯৬৩), 'পারিবারিক' (১৯৬৪), 'দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম' (১৯৬৫), 'অমরপ্রেম' (১৯৭৬), 'এগেসোলেলীন' (১৯৮৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে 'রাজপুরী' শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে রচিত হয়েছে 'রাজপুরী' নাটকটি। এই একাঙ্ক নাটকের প্রেক্ষাপট কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে উৎযাপিত বসন্ত উৎসব। শ্রাবস্তী নামটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে গৌতমবুদ্ধ অর্থাৎ শাক্যমুণির নাম। গৌতমবুদ্ধের সময়কালকে কেন্দ্র করে এই একাঙ্ক নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। মন্মথ রায় একজন অভিজ্ঞ নাট্যকার। তাঁর নিজস্ব পড়াশোনা, ভাবনাচিন্তা, দেশবিদেশের নাট্যভাবনার নানা রঙ অনায়াসে মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি অসাধারণ নাট্যকাহিনি এবং চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই একাঙ্ক নাটকে চরিত্র সংখ্যা পাঁচ। এছাড়াও আছে প্রতিহারী, দামী এবং নগরের নারীগণ।

পঠিত আলোচ্য একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে এই নাটকের আয়তন দীর্ঘ। দীর্ঘ হলেও এটি একাঙ্ক নাটক। নাটকটি স্বপ্নলব্ধ চরিত্রের, নির্দিষ্ট নাট্য কাহিনি সম্বলিত একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ আয়তনে একমুখী নাটক। অবশ্যই তীব্রগতি সম্পন্ন। এই নাটকটির মধ্যে একাঙ্ক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'রাজা' ইত্যাদি নাটকের প্রভাব এই নাটকে পড়েছে। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান', শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের কথা এই নাটকটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায়। একাঙ্ক নাটকটি শুরু হয়েছে কোশলরাজের

রাজধানী শ্রাবস্তীর রাজপুরীতে। সমাপ্তিও সেই রাজ অন্তঃপুরে। Unity of time. Unity action Unity of place এই তিন ঐক্য এবং নাট্যবৃত্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার সকল সংলাপ, চরিত্র চিত্রণ এবং কাহিনি চয়নে ও বয়নে অভিজ্ঞ নাট্যকার মন্মথ রায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কৌলিন্য বজায় রাখতে কোশলরাজ শাক্য রাজকন্যা ভেবে যাকে বিবাহ করেন তিনি আসলে নাচনেওয়ালীর কন্যা (মহাভারতীয় 'জীবনভাবনার অনুসরণ)। একাঙ্ক নাটকে সেই বিবাহের ১৬ বছর পর প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হলে রাজা এবং যুবরাজ বিরুধক রানীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহায় মত্ত হয়ে ওঠে। রানীর মনস্তাত্বিক টানাপোড়েন, শাক্যবংশের প্রতি তীব্র ঘৃণা, প্রতিহিংসা যুবরাজ বিরুধককে শাক্যমুনিকে হত্যার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বিরুধক শেষ পর্যন্ত অন্তরে পোষিত প্রতিশোধ স্পৃহায় মাতৃহন্তা হল। নাচনেওয়ালির কন্যা হয়েও প্রবল ব্যক্তিত্ব নিজস্ব ধর্ম ধৈর্য্য রাজার প্রতি অনুরাগ বিরাগ, সন্তানের প্রতি স্নেহ পরিশেষে নির্মম আদেশ, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রানীর চরিত্রে অসামান্য দ্যুতিগুলিকে শেষপর্যন্ত রক্তাক্ত এবং মসীলিপ্ত করেছে।

ইতিহাসের নিরিখে রচিত এই নাটকে যে ট্রাজেডি দেখা দিয়েছে শেষপর্যন্ত তা অনেকটাই দৈব Nemesis দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা কিনা গ্রীক নাটকের প্রয়োগ কৌশল। কিন্তু এখানে রানী প্রথম থেকে অসত্যের শিকার তাই পরিণতিতে আত্মহুতি অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নাটকের ডিটেলিং-এর কাজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্র নাটকের প্রভাব আছে। এই নাটকে কবির রাজকন্যা মল্লিকার উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে নাটকের শেষে স্বর্ণথালায় চিহ্ন মস্তকসহ প্রবেশ হেগেলিয়াম ট্র্যাজেডির কথা তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন। অলৌকিক আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বজ্রপাত অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে ক্ষুন্ন করেছে।

মন্মথ রায় রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি চিরকাল প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। মঞ্চনাট্য, চিত্রনাট্য, বেতারনাট্য ও রেকর্ডনাট্যের মত সর্বপ্রকার নাট্যরচনাতেই তিনি নাট্যপ্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি আধুনিক নাট্যন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আমৃত্যু। তাঁর ভাবনায় দেশাত্মবোধ, মানবিকতা, আত্মচেতনা, মুক্তমনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাঁর শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনে পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় ও মাতা সরোজিনী দেবীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিশ্রমশীল জীবন সঙ্গে স্নেহ, ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ তাঁকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তিনি পিতার কাছে থেকে রাজনৈতিক চেতনা পেয়েছেন, মায়ের কাছে থেকে দেশ চেতনার আদর্শ নিয়েছেন;' সঙ্গে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিয়ে নাট্য সৃষ্টিতে নিজের প্রতিভাকে শিল্পগুণে সার্থক করে তুলেছেন। তাঁর রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩)। তিনি এই নাটকের দ্বারা তেমন কোন সফলতা পাননি। পরবর্তী সময়ে মঞ্চ সফল দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭) ও 'দেবাসুর' (১৯২৮) যা মন্মথ রায়কে নাট্যকার রূপে পরিচিতি এনে দিয়েছিল। ১৯৩০ সালে 'কারাগার' নাটকে পৌরাণিক মহাভারতের কাহিনির মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজের বাস্তব স্বরূপ, দেশের অবস্থা, জনগণের কঠিন পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। ফলত 'কারাগার' নাটককে প্রকাশ্যে অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তৎকালীন ইংরেজ সরকার। অন্যদিকে 'কারাগার' নাটকটি মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে উঠে আসে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে। পরবর্তী কালে তিনি 'সাবিত্রী'(১৯৩১), 'অশোক' (১৯৩৩), 'খনা' (১৯৩৫), 'সতী'(১৯৩৭), 'মীরকাশিম' (১৯৩৮)-এর মতো মঞ্চসফল নাটক রচনা করেন। কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, অভিনয় নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চাভিনয় সর্বক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

মন্মথ রায় রচিত এই 'রাজপুরী' একাঙ্ক নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। মূলত বৌদ্ধ কাহিনিই এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় যা প্রকাশ পেয়েছে নাটকের পাঁচটি পুরুষ ও তিনটি নারী মোট আটটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

বৌদ্ধধর্মের আবহে লিখিত একাঙ্ক নাটক হল রাজপুরী। কোশল রাজার রানী বাসবক্ষত্রিয়ার অন্তর্দন্দ্ব এই নাটকের বিষয়। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন শাক্যবংশীয়। সেই শাক্যবংশীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ক্ষমতার বলে। রাজা ক্ষমতার আভিজাত্য রক্ষা করতে অস্ত্রের ওপর ভর করে তিনি বিবাহ করলেন বাসবক্ষত্রিয়াকে। আর সেই কোশলরানী বাসবক্ষত্রিয়ার অন্তর্দন্দ্বই এই একাঙ্ক নাটকের কাহিনিকে গতি প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে শাক্যরা কোশল রাজের সঙ্গে তঞ্চকতা করে। তারা রাজার নাচনেওয়ালির মেয়ের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করায় কোশলরাজের। দীর্ঘ ষোল বছর পর সেই ঘটনার উন্মোচন হয়। নাটকের শুরুতে দেখা যায় কোশল রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে কোশল রাজ প্রসেনজিৎ ও রানী বাসবক্ষত্রিয়ার সন্তান রাজশেখরের তৃতীয় জন্ম তিথি উপলক্ষে উৎসব। সেদিনই শাক্যবংশের কন্যার পুণ্য হস্তের বুদ্ধের প্রসাদ নিতে আগ্রহী হয় কোশল প্রজাগণ। এখান থেকে শুরু হয় রানীর অন্তর্দন্দ্ব। দীর্ঘ সময়ব্যাপী চেপে রাখা সত্যের ভার রানী বহন করতে অসমর্থ হয়ে ওঠেন। তাই ভগবান বুদ্ধের মঙ্গলাশিষ রানীকে বিতরণ করতে বললে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। মিথ্যার বলে পাওয়া শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ক্ষমতা বাসবক্ষত্রিয়ার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। বারংবার তিনি রাজাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে শাক্য বংশের উত্তরাধিকার তার রক্তে প্রবাহমান। এছাড়া একজন মানুষ হিসেবে কি তার কোন পরিচয় নেই?

> 'রাণী ।। বেশ কিন্তু এই আমি যদি শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ না কর্তুম তবে আমার এই সাধারণ রূপ সম্পদ নিয়ে এ জীবনে হয়ত তোমার দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পার্তুম না ..
>
> রাজা।। পদ্ম কি তার নিজের রূপ উপলব্ধি কর্তে পারে?
>
> রানী।। ও উত্তরে আর কাউকে ভোলাতে পার, কিন্তু তোমার সত্যিকারের উত্তর আমি বেশ জানি। তবে তোমার এ সংসারে আমার জন্মের ভিত্তিটুকুর উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেজন্যই আমি দেবী.. সেজন্যই আমি সহধর্মিনী। কিন্তু রাজা এমনি করেই কি আমাকে দূরে ঠেলতে হয়?'

কেবলমাত্র রানীর গৌরবের জন্যই তার এত সমাদর। যে জন্মগৌরবের জন্যই রানীর এত সমাদর, সেই জন্মগৌরব বাসবক্ষত্রিয়ার প্রাপ্য নয় তাই তার মধ্যে চলে অন্তর্দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপস্থিত নাটকে

> 'রানী।। এখন আমার ইচ্ছে হয় ..... দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্নভিন্ন করে ফেলি ..... আত্মার উলঙ্গ মুর্তি নিয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াই।'

একদিকে কপিলাবস্তুর সভাকবি কবিশেখরের প্রতি কোশল রানী বাসবক্ষত্রিয়ার ভালোবাসা। ভালোবাসে তাকে না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। কপিলাবস্তুর সভায় বাসবক্ষত্রিয়ার নৃত্যের তালে তালে কবি শেখরের গান সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠতো, সেই কবি শেখরকে না পাওয়ার বেদনা এবং অন্যদিকে কোশল রানীর মুকুটের ভার বহন করা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে

'রানী।। রং এ লাল হয়েছি,না? মূর্খ !এ রং নয় ।..এ রক্ত ! তাজা রক্ত! টাটকা রক্ত !
এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ! ..আর কত যুদ্ধ খর্ব! আর কতদিনই বা যুদ্ধ কর্তে পারি! শেখর! আমায় বাঁচাও আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো আমাকে মুক্তি দাও আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে চল'

কবিশেখরকে মনে রেখে রানী তার সন্তানের নামকরণ করেন রাজশেখর নামে। রাজশেখর রাজার সন্তান হলেও সে হয়েছে কবি শেখরের সদৃশ। অন্তর্দন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়েছেন রানী, তাই তিনি আদেশ দেন কবিশেখরের চোখ উপড়ে আনার। নিজের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে তিনি নির্বাসন দণ্ড শিরোধার্য করেন। মিথ্যা বংশ গৌরবের বোঝা থেকে মুক্তি নিয়ে ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে তিনি আশ্রয় নেন। তবে মন্মথ রায় এই একাঙ্ক নাটকে চূড়ান্ত মুহূর্তে একটি চরম অভিঘাত রেখেছেন। রানীর সন্তান বিরূধক কপিলাবস্তুতে গিয়ে জানতে পারে শাক্যদের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ। রাজার নাচনেওয়ালির মেয়েকে তারা কোশলরাজের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন । এই সত্য বিরূধককে শাক্যদের উপর বিরূপ করে তোলে। সমস্ত শাক্যবংশের ধ্বংস সাধনে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এই ধ্বংসকার্যের প্রথম পদক্ষেপ বিরূধক আদেশ দেয় শাক্যমুনির ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসার। এই ধ্বংসকার্য বন্ধ করেন রানী নিজের জীবন দিয়ে। শাক্য মুনির বদলে রানীর ছিন্ন মস্তক আসে রাজপুরীতে। আশ্রমের প্রথম ও শেষ হত্যা এটিই। মায়ের ছিন্ন মস্তক দর্শনে স্তব্ধ হয় বিরূধক। রাজা উপলব্ধি করেন তার রানীর অন্তর্দন্দ্ব। রানী বাসবক্ষত্রিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বহির্দন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তাই নাটকের কাহিনির পটভূমির বিস্তৃতি কোশল রাজ এবং শাক্যবংশের দ্বন্দ্ব হলেও নাটকের কাহিনিতে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে রানী বাসবক্ষত্রিয়ার মনোলোকের রহস্য উদঘাটন। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটির কাহিনি দ্রুত গতিময় এবং নাটকটিতে স্থানগত, কালগত, ক্রিয়াগত ঐক্যের সঠিক সমন্বয় সাধিত হয়েছে। শুধু তাই দ্বন্দ্ব সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত রানী বাসবক্ষত্রিয়াকে কেন্দ্র করেই নাটকের মূল করুণ রস জাগ্রত হয়েছে। সেই অভিঘাতেই নাট্যকার মন্মথ রায় তার 'রাজপুরী' একাঙ্ক নাটকটি সমাপ্ত করেন।

একক-৬

শিক কাবাব : বনফুল

বিন্যাসক্রম

৪০৫.১.৪.১ : ভূমিকা

৪০৫.১.৪.১ : ভূমিকা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলায় মুনিহারিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালে। তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার। বাংলা সাহিত্যের জগতে বনফুল ছদ্মনামে তিনি অধিক পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রগুলিতে তাঁর অবাধ বিচরণ। একাধিক উপন্যাস গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও আত্মজীবনীমূলক নানা গ্রন্থ এবং একাধিক একাঙ্ক নাটক লিখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বনফুলের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'মঞ্চ মুগ্ধ', 'মধ্যবিত্ত', 'রূপান্তর', 'বন্ধন মোচন', 'সিনেমার গল্প', 'কঞ্চি', 'প্রচ্ছন্ন মহিমা', 'আসন্ন', 'ত্রিনয়ন'। বনফুল একাধিক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। নাটক রচনায় বনফুল বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের দাবিদার হিসাবে অন্যান্য নাটকের তুলনায় একাঙ্ক নাটক অনেক এগিয়ে। 'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটকটি আমাদের পাঠ্য তালিকার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ একাঙ্ক নাটক। এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে সাধারণত দুই শ্রেণির চরিত্র লক্ষ্য যায়। একটা উচ্চশ্রেণির জমিদার পান্নালাল বাবু ও জীবনধন বাবু আর নিম্নশ্রেণির শিবু, করিম। এর বাইরে সৌদামিনী নারী চরিত্রটি উহ্য রাখা হয়েছে। 'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে একজন নারীর জীবন যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন নাট্যকার। একজন অসহায় নারীর ওপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে শোষণ নিপীড়ন এবং অত্যাচার চালানো হয় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটক। পুরুষ শাসিত সমাজে সামন্তপ্রভু এবং তার সাকরেদরা কীভাবে একজন নারীকে চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করে তার প্রমাণ আমরা এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে পাই।

'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটকটির পটভূমিতে রয়েছে জমিদার, পান্নালাল এবং জীবনধন বাবু এই তিনজনের দুরন্ত লোভ-লালসা এবং আদিম স্ফূর্তি। এই আদিম স্ফূর্তি ও লালসার তাড়নায় জীবনধন বাবুরা শিবু এবং করিমদের কাটা মাংস থেকে কাবাব বানানো, মদ এবং মেয়ে মানুষকে ভোগ করার চূড়ান্ত প্রস্তুতকারক হিসেবে ব্যবহার করে। কাঁচা মাংস খণ্ডকে যেমন শিকে গেঁথে তাপদগ্ধে কাবাব তৈরি করে রসনা ও লালসা তৃপ্তির সামগ্রী বানানো হয় ঠিক তেমনি নারী শরীর ভোগের মধ্যে সমমানসিকতার প্রতিফলন ঘটে এই পরিবেশে। এই দুটি ঘটনাকে নাট্যকার পরস্পর পরিপূরক করে তুলেছেন এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে। এই একাঙ্ক নাটকে একটিমাত্র নারীচরিত্র সৌদামিনী। নাটকটিতে মোট ছয়টি চরিত্র আছে। পান্নালাল, জীবনধন এবং জমিদার বাবু প্রত্যেকেই সৌদামিনীর আবির্ভাব এবং রূপবর্ণনা নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহলী। চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছাবার পূর্বে সৌদামিনীর জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ আবির্ভূত হয়েছে। তার স্বীকারও এই কাহিনির মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। বিভিন্ন সময় সৌদামিনীকে

ঠকদের হাতে পড়তে হয়েছে এবং সেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে। সৌদামিনী পালিয়েও নিজেকে শেষে রক্ষা করতে পারেনি। জীবনে একের পর এক অত্যাচারী, লম্পট পুরুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, সৌদামিনীর মনে হয় এ যাত্রায় রক্ষা পেলে পরবর্তীতে মুক্তি পাবে। সর্বশেষে মুক্তির উপায় হিসেবে নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এতবড় বৃহৎ ভূমিতে বিপুল জনসংখ্যার সমাজে সৌদামিনী বাঁচার স্থানটুকু পায়নি।

'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটকের সৌদামিনী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের এই বৃহৎ সমাজ আয়তনে বড় হলেও মানসিকতায় সংকীর্ণ। সৌদামিনী জন্মের পর থেকেই পরিবার ও সমাজের কাছে সবচেয়ে বড় বোঝা হিসেবে উপস্থিত হয়। আমাদের সমাজে পরিবারের লোক মনে করে বিবাহ না দিতে পারা পর্যন্ত তাদের কন্যা সন্তান গলগ্রহ হয়ে থাকে। বিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে পরিবারের লোক মুক্তি পাই। অপরদিকে আমাদের সমাজও এই নারীকে ভালো চোখে দেখেনা। সমাজ সমালোচনা করতে পারে, সমাজ ধিক্কার দিতে পারে, সমাজ খারাপ পথে ঠেলে দিতে পারে। সমাজ সৌদামিনীদের স্থান দিতে পারেনা। বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে তাদের গ্রহণ করতে শেখায় না। আমাদের সমাজে লিঙ্গভেদের বৈষম্য শুধুমাত্র দাস ব্যবস্থা বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছিল তা নয় পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও লিঙ্গভেদের বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে। যা কিনা গভীরভাবে আমাদের ভাবায়। পৃথিবীতে সন্তান জন্ম নেওয়ার অধিকার যেমন আছে তেমন বেঁচে থাকার অধিকারও তার আছে। শুধুমাত্র পুরুষেরাই যে বেঁচে থাকবে নারীরা থাকবে না এমনটি কীভাবে হতে পারে। এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে জমিদার, পান্নালাল এবং জীবনধন বাবুর চরম লালসা ও বিকৃত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ পাওয়া যায়। পান্নালাল, জীবনধন এবং জমিদার সকলেই নারীভোগী, নারীলোলুপ চরিত্র হিসেবে এই একাঙ্ক নাটকে উঠে এসেছে।

'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটকে শিবু এবং করিম উভয়ে নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধি হলেও নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনতো দূরের কথা উচ্চশ্রেণির মানুষের মত এরাও টিপ্পনি কাটে। করিমের মুখে আমরা শুনতে পাই একজন নারীকে 'চিড়িয়া' বলে সম্বোধন করতে—

'করিম।। আরে আরে শোন না — (বামচক্ষু কুঞ্চিত করিয়া) চিড়িয়া ফাঁসলো কি করে?

শিবু।। বাবুর ওই যে একটি নতুন মোসাহেব জুটেছে আজকাল—'

পান্নালাল বাবু শুধুমাত্র নয়, জীবনধন বাবু এবং জমিদার বাবু সকলেই সৌদামিনীর নির্মম অত্যাচারিত জীবন কাহিনি জানা সত্ত্বেও তার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি বা মমত্ত্ব প্রকাশ করেনি। অপরদিকে সৌদামিনী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যই জমিদারবাবু করেছন—

'ডাকতে পার, তবে আমি ওসবের মধ্যে নেই। ওসব দশ হাত-ঘোরা জিনিস টাচ করি না আমি।'

এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজের লোভী উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছে একজন নারী 'মাল' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সৌদামিনী এর প্রতিবাদ করে গেছে আত্মহত্যা করার মধ্যে দিয়ে। সৌদামিনীরা আমাদের সমাজে মনে করে আত্মহত্যার মধ্যে দিয়েই তাদের মুক্তি। কারণ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এই সৌদামিনীদের রক্ষার্থে এগিয়ে আসেনা। সৌদামিনীদের ভরসাস্থল, আশ্রয়হীনতায় তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

নাট্যকার বনফুল একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্র চিত্রণ এবং সংলাপ সৃজনে সফল। এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে সৌদামিনীকে নেপথ্যে রেখে নানা চরিত্রের কথোপকথন এবং কাহিনির বিন্যাস ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেই বিভিন্ন সাহিত্যিক নারীর উপর নানা ধরনের অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরেছেন। বনফুল তাঁর এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে নারীর রোমহর্ষক পরিস্থিতির অসাধারণ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারীদের অত্যাচারিত পীড়িত লাঞ্ছনার

সকল দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই দিক দিয়ে 'শিক কাবাব' একাঙ্ক নাটকটি চরমতম শিল্পোৎকর্ষে পৌঁছে গেছে। সৌদামিনী তার আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছে নারীরা সর্বদা ভোগ্য সামগ্রী নয়। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে নারীকে নানান অসহায় পরিস্থিতির শিকার হতে বাধ্য হতে হয়।

তুলসী লাহিড়ীর 'দেবী' নাটকের শুখনি চরিত্রের অনুরূপ বনফুলের অন্যতম সাহিত্য সৃষ্টি 'শিক কাবাব' নাটকের সৌদামিনী। সৌদামিনী তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দিশাহীন, বিপর্যস্ত, অত্যাচারিত নারী চরিত্র। সামন্ততান্ত্রিক হীন মানসিকতায় পূর্ণ কিছু মানুষের অত্যাচারের পণ্য সামগ্রী হয়ে উঠেছে সৌদামিনী। নাটকের নামকরণ 'শিক কাবাব'-এর মধ্যে দিয়ে নাট্যকার কাঁচা মাংসের ভোজনের উপযোগী করার যে রসনা লিপ্ত লালসার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বেদনাদায়ক। একইসঙ্গে জমিদারের ভোজন রসিকতাকে আরও বেশি মাত্রা দান করেছে সৌদামিনীর মত নিরুপায় মেয়েদের দেহটি। অবহেলিত নারী চরিত্রের যে দৃশ্য নাটকে ফুটে উঠেছে, তা তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানকে নির্দেশিত করেছে। নাটকে পাওয়া যায় সৌদামিনী শিয়ালদহ স্টেশনের অদূরে রেললাইনে গলা দিতে গেলেও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে জমিদারের হাতে তুলে দেয়। নারীর সুরক্ষাব্যবস্থা যাদের হাতে তারাই অত্যাচারী মানুষদের পক্ষপাতী। নারী হিসেবে কিংবা একজন মানুষ হিসেবে যে স্বাধীনতা থাকা দরকার, তা খর্ব করেছে সেই সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বৃত্তশালী মানুষগুলি। এখানেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা। নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা ছটি। তবে, একমাত্র নারীচরিত্র সৌদামিনীকে নাটকের শেষ মুহূর্তে গলায় শাড়ি জড়িয়ে ঝুলতে দেখা যায় মৃত অবস্থায়। তার কথা নাটক জুড়েই আছে। শিয়ালদা স্টেশনের অদূরে রেলে গলা দিতে গিয়ে ব্যর্থ সৌদামিনীকে উদ্ধার করে, পুলিশের হাত থেকে সামলে নিয়ে পান্নালাল, তথাকথিত সপার্ষদ জমিদারের ভোগ-লালসা-ফুর্তির বিবরে পৌঁছে দিয়েছিল। একদিকে মদ ও মাংসের শিক কাবাবের মাঝে এই সৌদামিনীর আগমনে জান্তব মন ও চেহারা এবং নৃশংস বীভৎসতা যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাতে নাট্যকার বনফুলের কৃতিত্বই চিহ্নিত হয়েছে।

আমাদের পাঠ্যসূচির প্রায় সমস্ত একাঙ্ক নাটকগুলি নারীকেন্দ্রিক। কোন একাঙ্ক নাটকে নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, টানা পোড়েন এবং অসহায় বিপর্যস্ত অবস্থা, কোথাও আবার জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে নারীর জীবন সঁপে দিতে হয়। তেমনি আমাদের আলোচ্য একাঙ্ক নাটক 'শিক কাবাব'-এ সৌদামিনী জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর পথকেই বেছে নিয়েছে। আমাদের পঠিত 'রাজপুরী'— একাঙ্ক নাটকে রানীর অবস্থা আমরা যেমন জানি, তেমনি 'দেবী' — একাঙ্ক নাটকে শুখনি চরিত্রকে লড়াই করতে হয়েছে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য। যা কিনা আমাদের কাছে এক কঠিন লড়াই। শুখনি কখনও কঠিন লড়াই থেকে পিছপা হয়নি। আবার সমাজের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করে এগিয়ে গিয়েছে। 'শিক কাবাব' — একাঙ্ক নাটকে সৌদামিনীকে বেছে নিতে হয়েছে আত্মহননের পথ। সমস্ত দিক বিচার বিশ্লেষণ করে একথা অনস্বীকার্য যে নারীর জীবনযন্ত্রণার প্রতিলিপি আমাদের পাঠ্য একাঙ্ক নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

চরিত্র

কাহিনিবৃত্তের পর নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চরিত্র (character)। নাটকে কখনও চরিত্রের প্রাধান্য, কখনও বা ঘটনার প্রাধান্য সূচিত হয়ে থাকে। চরিত্র বলতে অ্যারিস্টটল বুঝিয়েছেন— 'By character, I mean that in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents.' অর্থাৎ 'যে যে ধর্ম থাকায় ব্যক্তিতে দোষগুণ আরোপিত হয় চরিত্র বলতে সেই ধর্মকেই বোঝায়। এই ধর্মই এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে...' এই চরিত্র নানা শ্রেণির হয়ে থাকে— সরল-জটিল, বাস্তব-অবাস্তব, ভালো-মন্দ ইত্যাদি।

সাহিত্যে আরও দু'রকমের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়— প্রকাশধর্মী এবং বিকাশধর্মী চরিত্র। প্রকাশধর্মী চরিত্রে অপরিবর্তনীয় ধর্মটি মৌলভাবে বর্তমান থাকে, অপরদিকে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় চরিত্র যখন পরিবর্তিত হতে থাকে তখন তাকে বিকাশধর্মী চরিত্র বলা হয়। 'শিক কাবাব' একাঙ্কিকাতে প্রধানত তিন শ্রেণির চরিত্র পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। প্রথম গোত্রের সৌদামিনী, দ্বিতীয় গোত্রে— জমিদার, পান্নালাল ও জীবনধন এবং তৃতীয় গোত্রে রয়েছে শিবু এবং করিম। অবশ্য এই বিভাজন চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থানকেই চিহ্নিত করেছে।

জমিদার:

'শিক কাবাব' একাঙ্কের জমিদার, জমিদারের মোসাহেব পান্নালাল এবং জমিদারের বন্ধু জীবনধনবাবু— এরা একই গোত্রের জীব। এরা পরস্পরের বয়সী এবং সহযোগী, এদের তিন জনেরই একটাই লক্ষ্য নারী-শরীর ভোগ করা। নারী-শরীর ভোগের একান্ত বাসনায় তারা সৌদামিনীকে উঠিয়ে এনেছে, জমিদারের বাগানবাড়িতে সমবেত হয়েছে। এদের তিন জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া, মানবতার সামান্যতম অংশও লক্ষ্য করা যায় না। জমিদার কেবল নারী মাংস লোলুপ তা নয়, সে সৌদামিনীর পূর্ব জীবনের খবরা-খবর জানাতে চায় নিজের লালসার লেলিহান শিখাটিকে আরও অধিক পরিমানে প্রজ্জ্বলিত করবার জন্যে। তার Alcoholic tremor রয়েছে, তার হাত কাঁপে তবুও সিগার সেবন, মদ্যপান এবং নারী-শরীর ভোগে তার জুড়ি মেলা ভার। জমিদার কথায় কথায় বলে 'আই সি'। 'এই অপেক্ষা করে থাকার মধ্যেই একটা থ্রিল আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল— ইইইই' — জমিদারের এই মনোভাব থেকে বোঝা যায়, কেবল সৌদামিনী নয় ইতিপূর্বে অনেক সৌদামিনীই এই জমিদারের বাগান বাড়িতে এসেছে জমিদারের কামনা পূরণের জন্য। সৌদামিনীর পূর্বকথা জমিদারের নিকট উপন্যাসতুল্য বলে মনে হয়। সে একই সঙ্গে সিগার, সোডা এবং মদ্যপানে নিজেকে উত্তেজিত রাখে। তার কথাবার্তায় কোনও রকম শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না— 'মেয়ে মানুষের গন্ধ পেয়েছে, তার এতক্ষণ আসা উচিত ছিল'। 'মেয়ে মানুষের গন্ধ' শব্দগুচ্ছ যার মুখে উচ্চারিত হয় সেই মানুষের লালসাতুর রূপটি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। জমিদার চরিত্রটিকে নাট্যকার বনফুল নির্মাণ করেছেন অতি সচেতন ভাবে। নাট্যকারের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ তীব্রভাবে বর্ষিত হয়েছে জমিদার চরিত্রে। 'সুন্দর শয়তান' রূপে জমিদার চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

পান্নালাল:

পান্নালাল জমিদারের মোসাহেব। পান্নালালই সৌদামিনীকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে জমিদারের বাগানবাড়িতে। একটি অসহায় কন্যা সন্তানকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাগানবাড়িতে ভোগের জন্য উঠিয়ে আনতে পান্নালালের বিবেকে বাধে না। আসলে পান্নালাল বিবেক বর্জিত মানুষের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সৌদামিনীর জীবনবৃত্তান্ত পাঠক হিসেবে আমরা শুনতে পাই পান্নালালের জবানীতে। পান্নালাল যেরূপে লালসাতুরভাবে সৌদামিনীর বর্ণনা দিয়েছে, তাতে মনে হয় সৌদামিনীর জীবন সমূহের ঘটনা পান্নালালের চোখের সম্মুখে সংঘটিত হয়েছে। নাট্যকার বনফুল পান্নালালকে অঙ্কন করেছেন নিরাসক্ত ভাবে। মানুষের জৈবিক লালসা কতখানি নিম্নগামী হতে পারে পান্নালাল তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সিগার, মদ, সোডা— কোনটাতেই তার আপত্তি নেই। সে বীভৎসতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সে-ই প্রথম সৌদামিনীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। সৌদামিনী আত্মহত্যা করতে পারে তা পান্নালালের চিন্তার অতীত ছিল কিন্তু সৌদামিনীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে সে সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করেছে। সৌদামিনীর মৃত্যুর জন্য পান্নালাল কোনওভাবে নিজেকে দায়ি করে না। পান্নালালকে নাট্যকার কেবল জীবন্ত ভাবে রূপদান করেননি, সে একই সঙ্গে জীবন্ত এবং জান্তব রূপ নিয়েই নির্মিত। পান্নালালের মধ্যে মানবিকতাবোধের বিন্দুমাত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।

জীবনধনবাবু:

'শিক কাবাব' একাঙ্কিকার নারী-মাংস খাদক চরিত্র সমূহের মধ্যে তৃতীয় জন জীবনধনবাবু। জীবনধন বাবুর অসম্বত বেশবাস, তার বগলে বোতল এবং কণ্ঠে গান— এভাবেই পাঠক-দর্শক তাকে প্রথম দেখতে পায়। সে জমিদারের বন্ধু। জীবনধন-বাবু আকণ্ঠ মদ্যাসক্ত। সে পর্দার আড়ালে থাকা সৌদামিনীকে অপ্সরা বলে পরিহাস করে। পান্নালালকে সে সৌদামিনীর প্রসঙ্গ দ্রুত শেষ করতে অনুরোধ করে। করিমের শিক কাবাবের সে খুব প্রশংসা করে। অসিদ্ধ শিক কাবাব চিবুতে গিয়ে জীবনধনের ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তবুও সে পরম আগ্রহে শিক কাবাব খেতে থাকে। সে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে চায় না। সে বলে, 'আরে বাবা, বারই করনা, দেখি জিনিসটা।' এখানে 'জিনিসটা' শব্দটি লক্ষ্যনীয়। এই শব্দটির দ্বারা কোন বস্তু বা পদার্থকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনধনের কাছে সৌদামিনী নারী নয়, মানবী নয় একটি পদার্থ মাত্র। শিক কাবাব যেমন একটি পদার্থ তেমনি সৌদামিনীও পদার্থরূপে বিবেচিত হয়েছে নারী-মাংসলোভী জীবনধনের কাছে। এই জীবনধন, পান্নালাল বা জমিদার আকারে মানব কিন্তু তাদের আচরণ মানবিক নয়। তারা মনুষ্যত্ব-বিবেকবর্জিত জান্তব-মানুষ। এদের স্বরূপ কিছুটা হলেও উন্মোচিত হয়েছে করিমের কথায়, 'বাগদীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক বাবুদের কোনো কিছুর বিচার নেই।' অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ঘরানায় এরা নারীকে শরীরী প্রয়োজনে ব্যবহার করে মাত্র। সভ্যতার পঙ্কিলময় দিক মানবাত্মার অপমানকারী শক্তির স্বরূপ নাট্যকার বনফুল তুলে ধরেছেন এই একাঙ্কে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাবে। একাঙ্ক নাটকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-রূপায়নের সুযোগ থাকে না। একাঙ্কের সীমিত পরিসরে নাট্যকার নারীমাংস শিকারীদের ছবি এই একাঙ্কে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

শিবু ও করিম:

'শিক কাবাব' একাঙ্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা পেয়ে যাই শিবু ও করিমকে। এদের কাজকর্মে নাটকে পরিবেশ গড়ে উঠেছে অত্যন্ত সুদৃশভাবে। জমিদার ও তার মোসাহেবের নারী লোলুপতার নানান ঘটনার সাক্ষী এরা দু'জন। এরাও জমিদারের সার্থক দোসর। জমিদারের ভোগের উচ্ছিষ্ট ও এদের ভোগে আসে, এরা নারী-উচ্ছিষ্ট ভোগ করেই আন্তরিক ভাবে খুশি। এরা আসলে সমাজের কৃমিকীট তুল্য জীবমাত্র। এদের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মানবচরিত্র জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন সার্থক ভাবে। এছাড়াও 'শিক কাবাব' একাঙ্কে সৌদামিনীর প্রেমিক এবং কাশীর গুণ্ডা, সন্তোষবাবু, সন্তোষবাবুর ভাগ্নে, অবলা আশ্রমের ম্যানেজার প্রভৃতির প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী মাংস আস্বাদী, নারী শরীর সান্নিধ্য লাভে এরা উন্মুখ। নাট্যকার এই সব চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পুরুষের সামাজিক সত্তা ব্যতিরেকে নারী-লোলুপতার দিকটি উন্মোচিত করেছেন যথাযথভাবে।

সৌদামিনী:

বনফুলের রচিত কালজয়ী বাংলা একাঙ্ক নাটক 'শিক কাবাব'। এই নাটকে মূলত শিক কাবাবের নামে নারী ভোগের উদ্যোগ চলেছে। ভোগ বাসনা মেটানোর অভিলাসে জমিদার ও মোসাহেব সহ সকলে উপস্থিত হয়েছে জমিদারের বাগানবাড়িতে। আলোচ্য 'শিক কাবাব' নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র সৌদামিনী। নাটকে মূলত চরিত্র সংখ্যা ছটি হলেও সৌদামিনীর ভূমিকা এই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। কাঁচা মাংসকে যেমন শিকে গেঁথে আগুনে পুড়িয়ে কাবাব তৈরি করে লালসা তৃপ্তির সামগ্রী বানানো হয় তেমনি নাট্যকার সৌদামিনীকে আশ্রয় করে নারীর শরীরের প্রতি সমাজের লালসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন এই একাঙ্ক নাটকে। 'শিক কাবাব'-এর সৌদামিনীকে আমরা প্রথম পেলাম যখন দেখা গেল বরপক্ষের চাহিদা পূরণে সৌদামিনীর পিতা-মাতা অপারগ হয়েছে তখন থেকে।

পিতা-মাতা বরপক্ষের চাহিদা পূরণে অক্ষম— এরকম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল নয়। সৌদামিনীর বয়স বাড়তে থাকে, পারিবারিক অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে সৌদামিনীর শারীরিক— মানসিক বৃদ্ধি বন্ধ থাকে না; স্বাভাবিক কারণে সৌদামিনী এক প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ে। সৌদামিনীর নিয়তি সৌদামিনীকে এক ভয়ঙ্কর পরিনামের দিকে আকর্ষণ করে। যুবকের সঙ্গে সৌদামিনীর মনের মিল হয় কিন্তু তাদের জাতিগত অবস্থার কারণে তারা বিয়ে করতে পারে না। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসার জোরে তারা যৌথ ভাবে উধাও হয়ে যায়। সৌদামিনী স্বাভাবিক জীবন চায়, সৌদামিনী আর পাঁচজন নারীর মত সুস্থ জীবন কামনা করে কিন্তু বাস্তবে সৌদামিনী অমানিশার অন্ধকারে তিল তিল করে নিমজ্জিত হতে থাকে। প্রেমিক পুরুষের হাত ধরে সৌদামিনী কাশী পৌঁছে ছিল কিন্তু কাশীর পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদের আগ্রাসন থেকে সেই প্রেমিক প্রেমকে প্রেমিকাকে রক্ষা করতে পারে নি। সৌদামিনী তখন অগত্যা কাশীর আশ্রয়ে থাকে কিন্তু সেই সব পাণ্ডাদের লালসা পূর্ণ করতে পারে না সৌদামিনী। তাদের লালসা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় দিন দশেক পর একদিন রাত্রে সে চুপি চুপি দরজা খুলে পালিয়ে যায়। সৌদামিনীর তখন না ছিল সহায় না ছিল সম্বল। সহায়-সম্বলহীন সৌদামিনী কাশী থেকে পালিয়ে বুড়ো সন্তোষবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল চাকরানী হিসেবে। এখানে এসেও সৌদামিনী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সন্তোষবাবুর ভাগ্নে সৌদামিনীকে বিয়ে করবার আশ্বাস দিয়ে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। সন্তোষবাবু কলকাতায় এসে ভাগ্নেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সৌদামিনীকে রেখে যায় এক অবলা আশ্রমে। অবলা আশ্রমের সবল ম্যানেজার সৌদামিনীকে ভোগ করতে চায়, সৌদামিনী যেন 'তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে' পতিত হয়। সৌদামিনী নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অবলা আশ্রমের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়, কলকাতা শহরে ঘোলটান খেতে খেতে সে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে যায় আত্মহত্যা করার জন্যে। আত্মহত্যায় সৌদামিনী ব্যর্থ হয়; পরিচয় হয় পান্নালালের সঙ্গে, পান্নালাল তাকে চাকরির লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে জমিদারের বাগান বাড়িতে। জমিদারের বাগান বাড়িতে এনে সৌদামিনীকে রাখা হয় একটি হল ঘরের পর্দার আড়ালে আর অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক ঘরানায় প্রস্তুত হতে থাকে সৌদামিনীকে ভোগের উপচার শিক কাবাব। মদ্যপান সহ শিককাবাব ভক্ষণে যখন ভোগের পরিবেশ চূড়ান্ত হয়েছে তখনই দেখা যায় সৌদামিনী আত্মহত্যা করেছে সবার অলক্ষ্যে। এভাবেই সৌদামিনীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। একটি বিবাহযোগ্য কন্যাসন্তানের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সৌদামিনীর সব চেষ্টা ব্যথা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার অন্তিম প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক কামনাতুর পুরুষেরা নানান প্রলোভনে নারীর জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, তার সব অধিকার কেড়ে নিতে পারে কিন্তু তার মৃত্যুর অধিকারটুকু কেড়ে নিতে পারে না। শেষ বিচারে সৌদামিনী জয়ী, জমিদার-পান্নালাল-জীবনধনের সব প্রয়োজন-উদ্যোগ তাই ব্যর্থ হয়ে যায় সৌদামিনীর কাছে। নাট্যকার বনফুল সৌদামিনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং নারীলোলুপ মাংসাশী জমিদার-পান্নালাল বা জীবনধনের প্রতি তার অন্তরের ঘৃণা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহকারে প্রকাশ করেছেন। সৌদামিনী নাট্যকারের সফল সৃষ্টি। আত্মসম্মান আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে সৌদামিনী আপাতভাবে পরাজিত মনে হতে পারে কিন্তু তার চেষ্টা ও পরিনাম তাকে বিজয়নীর সম্মান প্রদান করেছে। সৌদামিনী নাট্যকারের কষ্টকল্পনা মাত্র নয়, সৌদামিনী রক্ত-মাংসের মানবী রূপেই সার্থক। 'শিক কাবাবে' এর সৌদামিনী কালের পরিসর অতিক্রম করে কালজয়ী মানবা রূপেই সফল ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সৌদামিনী বিকাশধর্মী চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত। তার জীবন-সঙ্কট এবং জীবন-সংগ্রামের স্বরূপ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। নাট্যকার সমাজ সংসার থেকে যে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার সার্থক রূপায়ন সৌদামিনী।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। একাঙ্ক নাটকরূপে 'শিক কাবাব' এর সার্থকতা বিচার করো।

২। 'শিক কাবাব' নাটকের নামকরণে যে ব্যঞ্জনা আছে তা কাহিনির মধ্যে কিভাবে বিস্তৃত হয়েছে। নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। একাঙ্ক সঞ্চয়ন — সম্পাদক : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

২। একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রীতি — সরোজমোহন মিত্র।

৩। বাংলা নাটক : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা — অধ্যাপক তাপস বসু।

একক - ৭

অপচয় : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার সদর সাবডিভিশনের পাউলদিয়া গ্রামে। কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৪২) অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। জেলের অভ্যন্তরে 'আহুতি' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছিলেন কিন্তু নাটকটি পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দীপশিখা' (১৯৪৩) নাটকটির অভিনয় পঞ্চাশের দশকে রঙমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলি হল 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'পূর্ণগ্রাম', 'নয়া শিবির', 'অন্তরাল', 'মশাল', 'মোকাবিলা', 'জীবনস্রোত', 'অমৃতসমান' ইত্যাদি। তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। এছাড়া দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটকগুলি হল 'অপচয়', 'এপিঠ-ওপিঠ', 'পাকাদেখা', 'পুনর্জীবন', 'বেওয়ারিশ', 'আপেক্ষিক', 'হারানো সুর', 'তরুবালা', 'মেঘের আড়ালে সূর্য', 'গোলটেবিল' ইত্যাদি। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য সংঘের বাংলা প্রাদেশিক কমিটির নাটক শাখার সম্পাদক হন। এছাড়া তিনি গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকগুলি গণনাট্য সংঘের আদর্শ অনুসরণে রচিত। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তাঁকে 'দীনবন্ধু' পুরস্কারে সম্মানিত করে।

বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যে তিনজন নাট্যকারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁরা হলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন কারণে গণনাট্য সংঘের অবস্থা কোনঠাসা হতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের এই অস্থির পরিস্থিতিতে বাংলা নাটকের জগতে আদর্শ ও মূল্যবোধের থেকেও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে জোর দিয়েছিলেন একদল নাট্যকর্মী। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সমাজ ও জীবনকে বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নাটকের মধ্যেও সেই উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। রাষ্ট্রীয় টানাপোড়েনের মধ্যে সমাজ জীবনের টালমাটাল অবস্থার প্রতিটা মুহূর্তের চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে। শুধুমাত্র সেই রাষ্ট্রীয় সংকটের সময়ের বাইরের দিকটিই নয়, তার অন্তর্নিহিত জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিটিকেও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যেই নয়, তাঁর একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দিয়েও ফুটে উঠেছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দিয়ে বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন সমাজ ও সভ্যতার সংকটময় দিকগুলিকে—

> 'সমাজ-জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা, যন্ত্রণা জর্জরিত অবক্ষয়, জীবনের অশান্ত ব্যাকুলতা, অসহ্য চিত্তদাহ, রক্তক্ষয়ের বেদনা, অতলান্ত শূন্যতার হাহাকার, নিঃসঙ্গ আত্মার অসহায় অবসাদ তাঁর একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু।'[১]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'অন্তরাল' রচিত হয় এবং নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন 'দীপশিখা' নাটকটি। এই নাটকে মন্বন্তরের ফলে কৃষক জীবনের দুর্দশা এবং আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর পরবর্তী নাটক 'তরঙ্গ'-এ একদিকে কৃষক বিপ্লবের সহিংস আন্দোলন অন্যদিকে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন এই উভয়ের বিরোধ এবং তার মাঝে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানবিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭)। 'বাস্তুভিটা' নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন বঙ্গ বিভাগের পরেও নাটকের নায়ক বাস্তু ত্যাগ করে যেতে চাননি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে সেই বাস্তু ত্যাগ করতে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশাপাশি নাট্যকার একাঙ্ক নাটক রচনাতেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বেওয়ারিশ', 'একাঙ্ক সপ্তক', 'পাকাদেখা', 'পুনর্জীবন', 'দাম্পত্য কলহে চৈব', 'সীমান্তের ডাক', 'অপচয়' প্রভৃতি।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক হল 'অপচয়'। 'অপচয়' নাটকটি 'একাঙ্ক সপ্তক' সংকলনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি চরমতম সংকটের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে। এই নাটকের প্রেক্ষাপটে রয়েছে দেশভাগজনিত চরম অভিশাপের প্রতিচ্ছবি। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা একটি ছোট্ট পরিবারের যে সংকটের কথা নাটকটিতে বলা হয়েছে, তা অনেকাংশেই দেশভাগজনিত অভিশাপের ফল। এই নাটকের চরিত্রসংখ্যা মাত্র চারজন। দুজন পুরুষ ও দুজন নারী। চরিত্রগুলি হল- মিলন, সন্ধ্যা, ফটিক ও সুশীলা। নাটকের কাহিনির মধ্যে আছে দেশবিভাগের বিপর্যয় সত্ত্বেও এপার বাংলায় চলে আসা মানুষজনের মধ্যে সংস্কারবশত জাত-পাতের প্রবাহমানতা। তবে জাত-পাতের ভেদাভেদ যে শুধুই অন্তঃসারশূন্য এক সংস্কার, তা এই নাটকে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে নাটকে সন্ধ্যার বক্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

'....গরীবগো কি আলাদা আলাদা জাইত আছে নাকি, মিলনদা? তাগো
একৈ জাইত। তারা গরীব।'

জাত-পাতের এই মানসিকতা সমর্থনযোগ্য না হলেও, মনের ভিতর থেকে সহজে সংস্কারকে উপড়ে ফেলাও সম্ভব হয় না সুশীলার পক্ষে। যদিও নাটকের শেষে সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়ে সন্ধ্যা জাত-পাতের উর্দ্ধে উঠে দাঁড়ালেও হৃদয়ের গভীর ভালোবাসায় তার ও মিলনের সার্থক মিলন ঘটে না। জাত-পাত জনিত সুশীলার ক্রোধে এবং প্রবল ক্ষয়রোগে (IB) আক্রান্ত মিলনের প্রত্যাখ্যান জনিত সকরুণ আর্তনাদের চিত্র ফুটে উঠেছে। জীবনের রক্তরাগ, সমস্ত উত্তাপ অপচয় এ পর্যবসিত হয়, তবে মৃত্যু বা আত্মহত্যায় নয়, সন্ধ্যার প্রত্যয়, নতুনভাবে বেঁচে ওঠাকে কেন্দ্র করে ঘোষিত হয়। এই একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে মিলনের কঠিন এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। নাটকটিতে মিলনের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের কথা উঠে এসেছে। নাটকটির শেষে আমরা দেখতে পাই মিলন সন্ধ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ঠিকই কিন্তু সেটা সন্ধ্যার সুখের দিকে তাকিয়েই। মিলন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই মিলনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে সন্ধ্যার জীবনেও সন্ধ্যা নেমে আসবে। আসলে সন্ধ্যার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ থেকেই মিলন নিজের জীবনের সঙ্গে সন্ধ্যাকে জড়াতে চাননি। কিন্তু সন্ধ্যা মিলনকে না পেলে আত্মহত্যা করার ভয় দেখালে, মিলন সন্ধ্যার কথায় রাজি হয়ে যায়। এইখানে মিলনের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। মিলন সন্ধ্যাকে জানায়—

'হ হ লইয়া যামু। তুই যেইখানে যাইতে চাবি সেইখানেই লইয়া যামু। আরেকবার নাইলে

জেলে যামু। একবার গ্যাছিলাম স্বদেশী কইরা, আরেকবার যামু মাইয়া চুরি কইরা। আয় আয় জলদি আয়।'

মিলনের জীবনের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে মিলনের রোগ সম্পর্কে গোপন রাখার মধ্যে দিয়ে। নাটকের শেষে আমরা মিলনের সেই ভগ্ন হৃদয়ের করুণ আকুতি প্রকাশ পেতে দেখি

'....ত'র আতের এই মালা পাইয়াও ত'রে যে ক্যান আমি নিতে পাল্লাম না সেই কতা আমি তরে ক্যামন কইরা কই? ডাক্তার একটা ফুসফুস দোষ পাইছে আরেকটাই কি বাঁচব? এই কয় বছরে বুকের ভিতরটা আমার জাজরা অইয়া গেছেরে, সন্ধ্যা, জাজরা অইয়া গেছে। জাইনা-শুইনা ত'রে আমি মরণের পথে লইয়া যামু কি কইরা?'

দিগিন্দ্রচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক এই দুধরনের নাটকে দেশভাগ এবং দেশভাগ উত্তর সংকটে আবর্তিত মানুষের জীবন সংগ্রামের কথাই উঠে এসেছে। আসলে তিনি নিজেও ছিলেন তার শরিক। উদ্বাস্তু কলোনীর নিটোল চিত্রণ, সংলাপে ঢাকা জেলার কথ্যভাষার নিপুণ প্রয়োগ, কাহিনির বাস্তবতা, চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সন্ধ্যা চরিত্রের বলিষ্ঠতা, মিলনের সারল্য অবশ্যই আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। নাটকের সন্ধ্যা চরিত্র মানবদর্শনের আদর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই মিলন যখন সন্ধ্যার সুখের কথা চিন্তা করে মিলনের মত একজন ট্রেনের হকারকে কোন সঙ্গী করতে বারণ করে, তখন সন্ধ্যা বলে

'.... তুমি যাগো সুখী বা'ব, সত্যে কি তারা সুখী?'

জীবনের প্রকৃত সারবস্তুর কথা উঠে এসেছে সন্ধ্যার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। তাই সন্ধ্যা মিলনকে বলে

'আমরা দুইজনে ঘর বান্ধুম। সুখের না হলেও শান্তির।'

আবার সন্ধ্যা মিলনকে বলে মানুষের স্বপ্ন আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকে অধরা স্বপ্নকে পূরণ করার লক্ষ্যে। সমকালীন সময়ে সমাজে নারীকে পঙ্গু করে রাখা হত। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না কিন্তু একজন নারীও যে স্বাবলম্বী হতে পারে, তারও যে নিজস্ব কিছু ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে, সন্ধ্যা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এইভাবে একাঙ্ক নাটকটিতে সন্ধ্যা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যা চিত্রিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে জাতপাত যে একটি কৃত্রিম সংস্কার, তা নাট্যকার তুলে ধরেছেন। মিলনের গলায় মালা দেওয়ার জন্য কুলে কালি লেপনের অপবাদ দিয়ে সুশীলাদেবী যখন কন্যা সন্ধ্যাকে তিরস্কার করেন, তখন সন্ধ্যা বলে ওঠে

'দ্যাশ বা'ঙ্গলো, বাড়ি বা'ঙ্গলো, কপাল বা'ঙ্গলো তব আমাগো কূল বা'ঙ্গলো না, মা! তোমারে তো জাইত কূল দেইখাই বিয়া দিছিল জীবনে সুখ পাইছো কোনদিন?'

'অপচয়' নাটকের ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মানুষের ভাষার অবিকল দৃষ্টান্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অপচয়' একাঙ্ক নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ভাষা-সংলাপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে

(ক) 'সুশীলা চাইরটা প্যাট চালাই কি কইরা ও দেখি। কত লোকের আতে-পায়ে দরলাম, একটু খোঁজ খবর নিতে। কে কার কতা ক'রে কও তো? আর সকলেই তো নিজের দান্দায় ব্যস্ত, কারে কি কমু।'

(খ) 'সন্ধ্যা ক্যান অয় না? তুমি বিন্ন জাইতের বইল্যা? গরীব গো কি আলদা আলদা জাইত আছে নাকী, মিলন দা? তাগো অ্যাক জাইত। তারা গরীব।'

(গ) 'মিলন সেই কতা না চালাই। সেই কতা না। আমি যে হকার। ট্রেনে লজেন্স ফিরি কইরা প্যাট চালাই।'

দেশভাগের পরোক্ষ ফলস্বরূপ যে অভাব জনমানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে, তাই একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। কাহিনিটির মধ্যে অভাবের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুশীলাদেবী ভিক্ষা করে সন্ধ্যার বিবাহের আয়োজন করেছেন। সেই সময়ে সমাজে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া যে বাবা মায়ের কাছে একটি চরমতম চিন্তার কারণ, তা সুশীলাদেবীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। সুশীলা দেবী তার মৃত স্বামীর প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, যেহেতু তার স্বামী কন্যা দানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ না করেই পরলোক গমন করেছেন। নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সুশীলাদেবীর পিতৃহারা কন্যা সন্ধ্যার বিবাহযোগ্য পাত্রের ব্যবস্থা হলেও বিবাহের মুহূর্তে পাত্রের অনুপস্থিতি সুশীলা দেবীর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি ওই লগ্নে সন্ধ্যার বিয়ে না হয় তাহলে সন্ধ্যাকে আর কেউ কখনও বিয়ে করবে না, এইরকম ধারণা ছিল সুশীলা দেবীর। পরে দেখা গেল সুশীলা দেবী কন্যার জন্য প্রতিবেশি ফটিককে নির্বাচন করেন। কিন্তু সন্ধ্যা 'চোর-লম্পট' ফটিককে বিবাহে প্রচন্ড ভাবে নারাজ। সন্ধ্যার পাত্রের কাছে সন্ধ্যার নামে ফটিক ভাঙচি দিয়েছে বলেও মিলনের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা আভাস উঠে এসেছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের কঠিন দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত সন্ধ্যা শেষপর্যন্ত 'ট্রেনের হকার' মিলনকেই জীবনসঙ্গী করতে চায়। তুলনায় নীচুজাতের যুবক হওয়া সত্ত্বেও মিলনকেই সন্ধ্যা তার জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছে। কিন্তু মানবিকতার আদর্শে বলীয়ান মিলন ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে এগোয়। তাই মিলন সন্ধ্যাকে বিবাহ করতে রাজি হয় না। সমাজে জাত-পাতের আদর্শে বিশ্বাসী সুশীলাদেবী কোনভাবেই সন্ধ্যার সঙ্গে নিচু জাতের ছেলে মিলনের বিবাহ দিতে রাজি ছিলেন না। সন্ধ্যার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষমেষ সুশীলাদেবী আপাত জয়যুক্ত হয়। এদিকে সন্ধ্যা মিলনের হৃদয়ের গভীর গোপন ভয়ংকর রহস্যের কথা জানতে পারেনা যে, মিলন মারণ রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থায় সন্ধ্যা মিলনকে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে কিন্তু মিলন সন্ধ্যার কথায় রাজি হয় না। সন্ধ্যা মিলনকে নিয়ে একটি শান্তির সংসারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু শেষমেষ সন্ধ্যার সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। তাই সন্ধ্যা মিলনকে ভুল বুঝে নিজে নতুনভাবে বাঁচতে চায়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত জীবনেরই নয় নিম্নবিত্ত জীবনেরও কঠিন জীবনসংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিভাবে সমাজ জীবনের একটি বৃহত্তর সংকটের কথা ছোট গল্পকারের মতো একাঙ্ক নাটকের স্বল্প পরিসরের মাধ্যমে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। শক্তিপদ রাজগুরুর সাড়া জাগানো উপন্যাস এবং ঋত্বিক ঘটকের যুগান্তকারী চলচ্চিত্র 'মেঘে ঢাকা তারা'র প্রভাব, প্রতিধ্বনি-ক্ষয়িষ্ণু আলো 'অপচয়'- একাঙ্ক নাটকটিতে অনেকটাই লক্ষ করা যায়। তবে 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন উপন্যাসের নায়িকা আর আলোচ্য একাঙ্ক নাটকে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছেন নাটকের নায়ক। সন্ধ্যা চরিত্রের বলিষ্ঠতা এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। আলোচ্য একাঙ্ক নাটকে একদিকে যেমন সন্ধ্যা নারী হয়েও মুক্তকণ্ঠে নারী হৃদয়ের অভিপ্সা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে নাটকের নায়ক মিলনও তার মারণ রোগের কথা গোপন রেখে আদর্শবান পুরুষ চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সব মিলিয়ে একাঙ্ক নাটক রূপে 'অপচয়' সার্থক। শুধু তাই নয়, পরিণতিতে একটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বড় হয়ে ওঠে যা, গণনাট্য আন্দোলনেরই বার্তা বহন করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১) একাঙ্ক সঞ্চায়ন, সম্পাদনা-ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৬৭।

২) একাঙ্ক নাটকের কথা, দিলীপ কুমার মিত্র, কলকাতা।

৩) ভূমিকা একাঙ্ক নাটক সঙ্কলন, অহীন্দ্র চৌধুরী, ১৯৫৮।

৪) বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ, কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য, কলিকাতা নবগ্রন্থ কুটির, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

৫) নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, পবিত্র সরকার, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অখণ্ড দে'জ সংস্করণ : মে ২০১৯, বৈশাখ ১৪২৬।

৬) নাট্যকথা শিল্পকথা, অশোক মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক : বিশ্ব রায়, অনির্বাণ প্রকাশন।

৭) নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর, সম্পাদক : সুনীল দত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৯৭২।

৮) সাময়িক পত্রে বাংলা মঞ্চ ও নাটক, শিপ্রা দত্ত, প্রমা প্রকাশনী, ২০০৫।

৯) বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার, ড. অরূপরতন ঘোষ, অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, পুরুলিয়া, ২০০৩।

১০) পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংগ্রহ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ইন্ডিয়ান বুক মার্ট, ১৯৯১।

১১) কাকে বলে নাট্যকলা? শম্ভু মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১২) নাট্য ব্যক্তিত্ব, বাদল সরকার (প্রথম প্রকাশ), পুস্তক বিপণী।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :

১) একাঙ্ক নাটক বলতে কী বোঝায়? বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি একাঙ্ক নাটকের উদাহরণসহ আলোচনা করো।

২) 'রাজপুরী' একাঙ্ক নাটকের মধ্যে নাট্যকার যে মানবিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা নিজের ভাষায় উল্লেখ করো।

৩) রাজপুরী নাটকটিকে কি একাঙ্ক নাটক বলা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। এই নাটকটিকে ট্রাজেডি নাটক রূপে চিহ্নিত করা যায় কি?—বিস্তৃত আলোচনা করো।

৪) 'রাজপুরী' একাঙ্ক নাটকটিতে রানী বাসক্ষত্রিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। নাটকের কাহিনি অবলম্বনে বিষয়টি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করো।

৫) 'অপচয়' একাঙ্ক নাটকটির প্রধান সমস্যা আর্থিক অভাব-অসঙ্গতি। বিস্তৃতভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্ফুট করো এবং উত্তরণে নাটকটি কতটা শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে জানাও।

৬) ‘অপচয়’ নাটকে দেশভাগজনিত কঠিন পরিস্থিতি দুই যুবকের মিলনের অন্তরায় হলেও প্রেমের অঙ্গীকার এই নাটকে স্বীকৃত সত্য—মন্তব্যটি আলোচনা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করো।

৭) একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ‘দেবী’র সার্থকতা বিচার করো।

৮) ‘এক সন্ধ্যায়’ একাঙ্কটি কোন্ কোন্ দিক থেকে স্বতন্ত্র তা প্রস্ফুটিত করো।

৯) ‘দেবী’ একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দিয়ে শুখনি সত্যিকারের দেবী হয়ে উঠেছে সে প্রসঙ্গে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

একক - ৮

এক সন্ধ্যায় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে জীবন দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি। পূর্ববঙ্গের বরিশালে নাট্যকারের আদি নিবাস। জন্ম অবিভক্ত দিনাজপুরের বালিয়াচালিতে। প্রকৃত নাম তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দ'র জার্নাল লিখেছেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক সবক্ষেত্রেই ঘটেছিল তাঁর অবাধ উপস্থিতি। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। তাঁর ফরাসী ভাষায় দক্ষতা ছিল। ফরাসী গল্প, উপন্যাস মূল ভাষায় পড়ার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। গল্প- উপন্যাস রচনায় সেই প্রভাব লক্ষ্যণীয়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'অমাবস্যার গান', 'পদসঞ্চার', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'বীতংস', 'সূর্যসারথি', 'তিমিরতীর্থ', 'আলোর সরণি', 'শিলালিপি', বৈতালিক' ইত্যাদি। ছোটগল্পের সংকলন 'ছোটগল্প বিচিত্রা'। বিখ্যাত 'টেনিদা'র জন্ম তাঁর হাতে। প্রবন্ধের বই 'ছোটগল্পের সীমারেখা', 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রামমোহন', 'আগন্তুক', 'চোরাবালি' ইবসেনের 'গোস্টস' অনুসরণে 'ভীমবধ' ও 'বারো ভূতে' প্রভৃতি। একাঙ্ক নাটক খুব বেশি লেখেননি। 'ভাড়াটে চাই', 'এক সন্ধ্যায়' এবং 'লগ্ন', এই তিনটি একাঙ্কের কথাই বারেবারে উঠে আসে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'এক সন্ধ্যায়'। তাই আমাদের আলোচনার প্রথমে এনেছি তাঁকে। উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের পটভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'এক সন্ধ্যায়' একাঙ্ক নাটক। গীতিকবিতায় 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিমতলার বাড়িতে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ এক সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছেন, জ্যোতিদাদার অনুরোধ 'ভারতী'র জন্যে লেখা দেবার কথা কবিকে জানাতে। এই লেখালেখির কথা থেকেই শুরু নানা আলাপচারিতা প্রৌঢ় বিহারীলালদের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের। সেই আলাপচারিতা নিয়েই রচিত হয়েছে এই একাঙ্ক নাটকটি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একাঙ্ক নাটক 'এক সন্ধ্যায়'-এর নাট্যঘটনা ঘনীভূত হয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাটানো একটি সন্ধ্যা নিয়ে। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর গুণমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'ভারতী'র জন্য লেখা দেওয়ার আবেদন নিয়ে তাঁর দাদার পক্ষ থেকে। স্বভাবের দিক থেকেও সাদৃশ্য বর্তমান বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে। বাধা ধরা অবস্থার মধ্যে থেকে পুঁথিগত বিদ্যায় অভ্যস্ত হতে পারেনি কেউই। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রসঙ্গে অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের যে মত ছিল তার উল্লেখ এখানে করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা, কবিতা বিষয়ক চর্চা চলেছে দুই কবির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা গান শোনান বিহারীলাল চক্রবর্তীকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার গভীরতা স্পর্শ করে যায় কবিকে তবুও তিনি তাঁর কবিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেননি, অল্প বয়সের রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বহু দূরে পৌঁছাতে পারেন, তাঁর কবিতার সম্ভার নিয়ে সেজন্য। তিনি 'কবিকাহিনি'র লেখা পাঠ করেই অনুভব করেছেন রবীন্দ্র কবিতার গভীরতা, তার মর্মস্পর্শী ভাব। বিহারীলাল অকুণ্ঠ প্রশংসা করেননি বলে যুবক রবীন্দ্রনাথ

আহত হন, আর বিহারীলাল জানেন যে এই ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবিতার কাছে আরো বেশি পৌঁছানো যায়। বেদনাতেই কবি পৌঁছে যান তাঁর কবিতার গভীরে, তাই ইচ্ছে করেই তিনি কম প্রশংসা করেন। তিনি জানেন বিশ্ব জগতের কাছে রবির কবিতা একদিন পৌঁছবে এই কথাতেই সমাপ্তি ঘটে একাঙ্ক নাটকের।

কথায় কথায় সমকালে রচিত নানা কাব্য-কবিতা নিয়ে গভীর আলোচনা চলে—

> 'রবীন্দ্রনাথ 'রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রকে না হয় ক্ষমা করা যায়। কিন্তু মধুসূদন?'
>
> বিহারীলাল '(আশ্চর্য হয়ে) মধুসূদন তোমার ভালো লাগে না। 'মেঘনাদবধ' কাব্য।
>
> রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধে কল্পনার ঐশ্বর্য আছে, ভাষার সমারোহ আছে, আবেগেরও অভাব নেই। কিন্তু সবমিলিয়ে আমি কেমন তৃপ্তি পাই না'।'

স্বভাবতই বিহারীলালের এই অভিমত মনমতো হল না। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিতা পাঠ করলেন। তাঁর প্রশংসা করলেন। 'ভোরের পাখি' আখ্যা যে তাঁরই দেওয়া, তবুও প্রাজ্ঞের প্রবল অনুভূতি থেকে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের গান শুনে বাহবা দিলেন না তেমন। 'ভারতী'তে তখন 'কবিকাহিনি' প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। সে সম্পর্কে আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন বিহারীলাল প্রশংসা কুণ্ঠা হয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বিহারীলাল পত্নীর চা-জলখাবার খেয়ে বিদায় নেন। নাটক শেষ হয়।

তবে প্রবীনের ভূমিকায় নবীন কবির প্রতি যেমন হওয়া প্রয়োজন, বিহারীলাল (দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুগামী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক) তেমন আচরণ করেন। তিনি পত্নী কাদম্বরী দেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানান

> 'উড়িয়ে দিলুম কবিকাহিনিকে'। কী শক্তি ওর 'কবিকাহিনিতে, তার ভাব, কী তার গভীরতা। আমি উড়িয়ে দিতে পারি তাকে। ওর কবিতা মহাকালের খাতায় জমা হয়ে যাচ্ছে তাকে উড়িয়ে দেবে সাধ্য কার। নিজের কবিতার চেয়েও যে ওর লেখা আমার বেশি ভাল লাগে।'

বিহারীলাল রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যথেষ্ট টের পেয়েছিলেন। ধ্রুপদী সৃষ্টি ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছয়, এটাও তাঁর জানা। তাই 'নব বাল্মীকি'র যে হদিশ রবি কবির মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা রবি কবিকে ঐ সময়ে, ঐ বয়সে বলা যায় না। তাই সদর্থক সমালোচনায় তাঁকে আরও উস্কে দেওয়া সৃষ্টি যজ্ঞে। নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনুরাগী। স্বভাবতই অন্যান্য একাঙ্ক থেকে এই নাটক একেবারেই স্বতন্ত্র। তিন চরিত্রের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-কবিতার যে বিস্তৃত পরিবেশ স্বল্প পরিধিতে উঠে এসেছে তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংলাপে গীতিময়তা কাব্যিক সুর উচ্চকিত। চরিত্রগুলি সংগত ও স্বাভাবিক। নামকরণও যথাযথ। একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলিও এখানে সুন্দর ভাবে উপস্থিত। এই একাঙ্ক নাটকগুলি অভিনীত হয় আলোচ্য বাংলার নানা প্রান্তে। পাঠের মধ্য দিয়ে নয়, অভিনয় করা এবং দেখার মধ্যে দিয়েই নাটকের গুণাগুণের বিচার সঠিক মাত্রায় করা হয়েছে। তবে এই আলোচনায়, পাঠ্য নাটকটির কিছুটা মূল্যায়ন করা গেল এটাই বড় কথা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একাঙ্ক নাটক রচনায় নিজস্ব নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বহুমুখী সৃজন প্রতিভার অধিকারী। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি শিশুনাট্য, বেতারনাট্য, একাঙ্ক নাটক ও কৌতুক নাটকের মত বিভিন্ন শ্রেণির নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'রামমোহন' (১৯৫৯), 'আগন্তুক' (১৯৬২) ইত্যাদি। তাঁর স্মরণীয় একাঙ্ক নাটকগুলি হল 'এক সন্ধ্যায়', 'ভাড়াটে

চাই' (১৯৫৭), 'বারো ভূতে' (১৯৫৯) ইত্যাদি। তিনি 'আগন্তুক' নাটকে ভাড়াটে মাধব বাবুকে নিয়ে গড়ে তুলেছেন দুটি দৃশ্যের নাটক। মাধব বাবু, মাধব বাবুর মেয়ে ইরা, বৃন্দাবন, আগন্তুক কুণালের মতো চরিত্রগুলি ও সংলাপের মাধ্যমে বাস্তব সম্মতভাবে একাঙ্ক নাটকটি পরিস্ফুটন করেছেন। অন্যদিকে 'ভাড়াটে চাই' একাঙ্ক নাটকে ভূপেন বাবুর ঘর ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত জীবন সংকটের করুণ ও বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করেছেন এই একাঙ্ক নাটকে। আবার তিনি 'বারো ভূতে' নামের একাঙ্ক নাটকে একটি ক্লাবের সদস্যদের নাটক অভিনয় করে অর্থ খরচ করার পরিবর্তে তিন হাজার টাকা ত্রাণ তহবিলে পাঠানোর মাধ্যমে কৌতুকপ্রদ আখ্যান হাজির করেছেন নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙালি জাতির মহান ব্যক্তিত্ব ও মহাপুরুষদেরকে কেন্দ্র করেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবনীমূলক নাটক রচনা করেছেন। 'রামমোহন' নাটকে চার অঙ্কের মধ্যে এই জীবনীমূলক কাহিনিতে রামমোহনের জীবনকে নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রায় বাহাদুর রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, মতিলাল শীল, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত মহান মানুষদেরকে চরিত্র রূপে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। তেমনি ভাবে 'এক সন্ধ্যায়' নামের একাঙ্ক নাটকটি বিখ্যাত গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সন্ধ্যার কবিতা বিষয়ক আলাপচারিতার গল্প ও আড্ডার পরিবেশ নিয়ে রচিত হয়েছে। 'এক সন্ধ্যায়' নামকরণের মাধ্যমে নাটককার নাটকের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছেন। কবিতার চেনা পরিচিত আসর, সেখানে কবিতা সৃষ্টি থেকে কাব্য সমালোচনার সঙ্গে কবির জীবনকথা ধরা পড়েছে, 'এক সন্ধ্যায়' নাটকে।

বিশ্বকবি তথা কবিগুরুর প্রথম জীবনের চেতনার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনা ও জীবনীর সূচনা এই একাঙ্ক নাটক 'এক সন্ধ্যায়' ধরা পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে সমকালে বিহারীলাল চক্রবর্তীর যে গুরুত্ব ছিল তাও উঠে এসেছে। তিনি ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যের আসরে কবিতা প্রকাশ করতেন। কবিতা পাঠও করতেন এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলত সুন্দর সাহিত্যিক পরিবেশে। সেখানে ঠাকুর পরিবারের বিদ্যুষী মহিলারাও অংশ গ্রহণ করতেন সেই কথা ধরা পড়েছে এই একাঙ্ক নাটকে। বিশেষ করে এই নাটক অনুযায়ী তাঁর কাব্য পাঠ করতেন নতুন বৌঠান, সেই প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। 'সারদামঙ্গল' গীতিকাব্যের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তুলে ধরেছেন। আলোচ্য একাঙ্ক নাটকে সহজ সরল ভাষায় কাব্যধর্মীতা প্রকাশ করেছেন। ছোট ছোট সংলাপ, স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়

'রবীন্দ্রনাথ। আপনার 'সারদামঙ্গল' আমার আশ্চর্য মনে হয়েছে। বৈষ্ণবসাহিত্যের পরে এমন কবিতা আমি আর পড়িনি।

বিহারীলাল। বলো কী! [হাসলেন] অনেকে তো বলেন আমার কবিতা পাগলের লেখা-পাগলামি! তাছাড়া ভারতচন্দ্র আছেন, মধুসূদন রয়েছেন—'

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ইতিহাসের কথায় জানা যায়, প্রথম জীবনে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য পছন্দ করেননি, বরং তীর্যক সমালোচনা করেছিলেন। যদিও পরিণত বয়সে তিনি এই মহাকাব্যের গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং কবি ও কাব্যের জন্য কলমও ধরেছেন।

'এক সন্ধ্যায়' একাঙ্ক নাটকের মধ্যে কবি, কাব্য এবং সমকালে ঠাকুর পরিবারের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অবদান তার কথাও সাহিত্যিক তথা নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়, কাহিনি, সংলাপের মাধ্যমে সুন্দরভাবে

তুলে ধরেছেন। নাটকের সূচনালগ্নে কেমন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে ছাত্র-শিক্ষক কথোপকথনের মাধ্যমে শুরু হলেও পরে রবীন্দ্রনাথের আগমনে নাট্যকারের উদ্দেশ্য আমাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের আগমন বার্তা পাঠক তথা দর্শকের সামনে নিয়ে এসেছেন নাট্যকার। সেখানে উঠে এসেছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহান কবিদের কথা, তাঁদের দর্শন, ভারতচন্দ্র থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শেলীর 'Spirit of Beauty' মাহাত্ম্যের কথা। গুরু বিহারীলালের সঙ্গে ভবিষ্যতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা রচনার জীবন কাহিনি। সেই ভাবনায় নাট্যাংশের একটি কবিতা তুলে ধরা হল—

'মানুষের মন চায়, মানুষেরি মন
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর যে ঊষাকাল
বিষণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার যে পর্বতের গহ্বর বিশাল
পারে না পুরিতে তারা, বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন'

তথ্যসূত্র :

১) বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা ড. দীপক চন্দ্র। প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৩০।

২) একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি ১, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা- ২৭০

৩) একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি ১, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-২৬৯-২৭০

৪) একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি ১, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-২৭৫

একক - ৯

কোথায় গেল! : কিরণ মৈত্র

বিন্যাসক্রম

৪০৫.১.৯.১ ভূমিকা

৪০৫.১.৯.২ 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু

৪০৫.১.৯.৩ অর্থনৈতিক সমস্যা

৪০৫.১.৯.৪ একাঙ্ক নাটকরূপে সার্থকতা

৪০৫.১.৯.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.১.৯.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৫.১.৯.১ : ভূমিকা

কিরণ মৈত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ২৫ জানুয়ারি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন অভিনেতা ও নাট্যকার। কিরণ মৈত্র সমাজ সচেতন নাট্যকার বলে নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। কিরণ মৈত্রের লেখা বিখ্যাত নাটকগুলি হল— 'বারো ঘণ্টা' (১৯৫৮), 'চোরাবালি', 'নাটক নয়' (১৯৫৮), 'যা হচ্ছে তাই', 'তৃষ্ণা' (১৯৬৪) প্রভৃতি। তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বুদবুদ', 'কোথায় গেল', 'ভাগ্যে লেখা', 'দেহ আলো', 'যা তারা পারেনি', 'জীবন্ত কবর', 'উৎসবের দিন', 'পথের ঠিকানা', 'আলোর নীচে 'খুন', 'ডুবুরি', 'অকল্পনীয়' প্রভৃতি। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন— 'মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সমস্যা ও দুর্গতি প্রধানত তাঁহাকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। করুণরসের আতিশয্য ও রোমাঞ্চকর সহানুভূতি দ্বারা তিনি দর্শকচিত্তে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিরণবাবু কয়েকখানি কৌতুকনাট্যও রচনা করিয়াছেন, তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে করুণরসে ও কৌতুকরসে সমান ভাবে।' (পৃষ্ঠা-৪০২)

বাংলা একাঙ্ক নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা ছিলেন— মন্মথ রায়। অনেকদিন ধরে তিনি অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। মন্মথ রায়ের নাট্য আন্দোলনের সহযোগী নাট্যকার ছিলেন কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, সুনীল দত্ত প্রমুখ। তিনি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, প্রমুখ। বাংলা নাট্যশিল্পকে নতুন আলোয় আলোকিত করেছে একাঙ্ক নাটক। সময়ের অভাবে বাঙালি দর্শকেরা পূর্নাঙ্গ নাটক দেখার সুযোগ পায় না। আর এর মূলে রয়েছে যন্ত্রনির্ভর মানুষের কর্ম

ব্যস্ততা। সকালে ঘুম থেকে ওঠে রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত মানুষ টাকার পেছনে ছুটে চলেছে। তারফলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতার বাজারে হাতে সময় নেই বললেই চলে। তারফলে পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটকের থেকে একাঙ্ক রীতির নাটক দেখতে মানুষ বেশি পছন্দ করেন। সেইজন্য সাধারণ মানুষের জীবনে একাঙ্ক রীতির নাটকের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

৪০৫.১.৯.২ : 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু

নাট্যকার কিরণ মৈত্র স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। সামাজিক সংকটে জর্জরিত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের হাহাকার ও দুর্গতি তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর লেখা 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকটিতে রয়েছে অল্প সংখ্যক চরিত্র। তারা হলেন— নিমাই ও অতুল। তাদের বয়স ৩৫ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। আমাদের পাঠ্য 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকটি ৪৫ থেকে ৫০ মিনিটের সময়-সীমার মধ্যে সাদামাটা মঞ্চে, কম আলোকে দর্শকদের নজর কেড়েছে। কিরণ মৈত্রের লেখা 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের শুরুতে দেখা যায়— 'মঞ্চ অন্ধকার। দেশলাই কাঠি একটা জ্বলে উঠল। অস্পষ্ট ভাবে দুটি মানুষকে দেখা গেল। একটা বড় মোমবাতি জ্বালানো হল। ঘরটা কিছুটা আলোকিত হলে দেখা গেল একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীর একটা ঘর। ঘরের প্লাস-তারা খসে খসে পড়ছে। জানলা- দরজাগুলো আধ ভাঙ্গা। একটা পায়া ভাঙ্গা খাটিয়া শোয়ানো আছে। ভাঙ্গা মাটির কলসী, কিছু ন্যাকড়ার পুঁটলি, ছেঁড়া আধ কাগজ ইত্যাদি ঘরময় ছড়ানো। নিমাই আর অতুল এদিক ওদিক দেখতে থাকে। দুজনেরই বয়স ৩৫ থেকে ৩৬ এর কোঠায়। ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় পরনে। গোঁফ দাড়িতে মুখ ভরা। রুক্ষ চুল। সময় রাত প্রায় বারোটা। ঝি ঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে।' বৃষ্টির একরাতে পুরোনো ভাঙ্গা বাড়িতে ঘটনাচক্রে দুই বন্ধু আশ্রয় নিয়েছে। বৃষ্টির রাত পোহালে পরের দিন সকালে অতুল ও নিমাই কোথায় যাবে তা তারা জানে না। ভবিষ্যৎ জীবন তাদের কাছে অন্ধকার। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কোনো কিছুরই ঠিক নেই। জীবন সংকটের সম্মুখীন হয়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দুই বন্ধু কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। নানারকম সংকটের মধ্যে দুই বন্ধু যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, তখনও তাদের জীবন কিন্তু থেমে থাকেনি। সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবনকে ভালোবেসে অতুল ও নিমাই সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আর এই ভালোবাসার নামই যে জীবন।

কিরণ মৈত্র স্বাধীনতা পরবর্তী কালের মানুষের জীবন সমস্যাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে যে ঘোর সমস্যা নেমে এসেছিল, সেই জীবনের খণ্ডচিত্রকে তিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকটিতে। নিমাই আর অতুলের জীবনে খাদ্যের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। অতুল ও নিমাই এর একান্নবর্তী পরিবার রয়েছে। নিমাই এর বৌ-ছেলে রয়েছে। অতুল এখনও বিয়ে করেনি। ভাই-বোনেদের পেট চালাতে সে লোকের পকেট কাটতো। পারিবারিক জীবনে তারা সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা তারা পায়নি। অর্থনৈতিক হাহাকারের জন্য পরবর্তীকালে অতুল ও নিমাই সমাজ বিরোধী কাজ বেছে নিয়েছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা চুরি-ডাকাতি করেছে। ফল স্বরূপ অন্যায় কাজের জন্য তাদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। প্রায় দুবছর কারাগারে বন্দি থাকার পর তারা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বাড়ি গিয়ে নিমাই বৌ-ছেলের দেখা পায়নি। বন্যার জলে পরিবারের সদস্যরা কোথায় ভেসে গেছে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। পারিবারিক

সংকটের কষ্টে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তারা নিজের বাড়ি না গিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে অতুল ও নিমাই এর জীবনে সামাজিক সংকট নেমে এসেছে। তারা এখন কি করবে, কোথায় যাবে ভাবতে-ভাবতে দুইবন্ধু দিশেহারা হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর কোলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার পুরোনো ভাঙা বাড়িতে অতুল ও নিমাই আশ্রয় নিয়েছে। ঘরের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, মাটির ভিত আলগা হয়ে গেছে; যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এক মুঠো ভাতের জন্য তারা সংগ্রাম করেছে। না খেতে পেয়ে তারা রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া লোকের এঁটো ডাবের শাঁস দুই বন্ধু খেয়েছে। খাবার না পেয়ে খালি পেটে থাকার সময় কল থেকে এক পেট জল খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। এমনি করে আর তাদের বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না। 'কোথায় গেল' নাটকে দেখা যায়— 'অতুল। দেখ দিনের পর দিন জল খেয়ে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। নিমাই। বাজে কথা বকিস না। পরশু সকালে ভাত খেয়েছি।

অতুল। আজ আমার ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।

নিমাই। ওঃ, কত সাধ! রোজ রোজ ভাত খাবেন?

অতুল। বড্ড খিদে পাচ্ছে।

নিমাই। পাবেই তো। সকালে কুলিগিরি করে চার আনা পয়সা গেছে। বললাম কচুরি খাওয়ার দরকার নেই। মুড়ি কেন। দেখতে অনেকগুলো হবে। দু বেলা খাওয়া চলবে। পেটটাও ভরা থাকবে তা নয়—

অতুল। গরম গরম আর ইয়া ফোলা-ফোলা কচুরিগুলো দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।' অতুল আর নিমাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। দুই বন্ধু বৃষ্টির রাতে কোলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়ে কোনোক্রমে জীবন রক্ষা করেছিল। অসৎ ভাবে জীবন ধারণ করতে তারা রাজী নয়। পরিস্থিতির চাপে অতুল ও নিমাই এর মতো অনেকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারেনি। বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে কতদিন না খেতে পেয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করেছে। খাদ্যের অভাবে তারা রাত্রে ঠিকমতো ঘুমোতেও পর্যন্ত পারেনি। তবুও তারা লোকের বাড়ি সিঁদ কাটেনি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রাণ রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। চুরির অপরাধে জেল খেটেছে। মানবিক সংকটের বিচিত্র অভিব্যক্তির কথা আমরা নাটকটিতে খুঁজে পাই। মানবিক সম্পর্ক ও সংকটের কথা কিরণ মৈত্র বিশিষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকটির মধ্যে।

৪০৫.১.৯.৩ অর্থনৈতিক সমস্যা

পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধ্য করেছে অতুল ও নিমাই-এর মতো মানুষকে পরিবার ছেড়ে এতো দূরে বসবাস করতে। খিদের জ্বালায় তারা ঘুমোতে পারেনি। ঘুমোতে না পারার জন্য তারা এপাশ-ওপাশ করেছে। সেইসময় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অতুল ও নিমাই এর মতো অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। নাট্যকার নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার থেকে নাটকটিতে মানুষের সমস্যা ও বেদনার কথা নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন। নাটকে দুই বন্ধুর সংগ্রাম ও সংকট এমনভাবে উপস্থাপন করেন যা নাট্য দর্শকদের ভাবিয়ে তোলে। কিরণ মৈত্র 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকে অতুল ও নিমাই এর কথোপকথনে বলেছেন—

'অতুল। তাহলে চল দুজনে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে দিই। পকেটে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে দেব, যে আমরা ভালো হতে চেয়েছিলাম। তাই ভালো ভাবে খেতে পাই নি—

নিমাই। ভালো ভাবে কি রে? বল খেতেই পাইনি।

অতুল। আমরা লোকের বাড়ী সিঁদ কাটি নি—

নিমাই। তাই লোকের বারান্দাতেও একটু পড়ে থাকতে পারি নি।

অতুল। বরং তাড়িয়ে দিয়েছে। চোর ভেবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে—

নিমাই। চুরি করতুম বলে জেল খেটেছি। কিন্তু কেন চুরি করতুম। বৌ ছেলের পেট চালাতেই তো। একবার জেল খেটে ফিরে গেলাম দু বছর বাদে। কারুর দেখা পেলাম না। বন্যার জলে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে?

অতুল। আমি তো ভাই বোনেদের পেট চালাতে পকেট কাটতুম। কতবার মার খেলুম। একবার জেল খাটলুম। কিন্তু ফিরে গিয়ে—

নিমাই। আমারই মত তাদের দেখতে পেলি না।

অতুল। না। শুনলাম অনেকদিন না খেয়ে কাটিয়ে আমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করেছে। তারপর, একদিন হাত ধরাধরি করে ওরা কোথায় বেরিয়ে গেছে।

নিমাই। এই চল, আবার সিঁদ কাটি।

অতুল। দূর সিঁদ আমি কাটতে পারবো না। তার চাইতে পকেট কাটতে পারি।

নিমাই। কিন্তু আমরা মা কালির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর চুরি করব না। চুরি করা খুব খারাপ কাজ।'

সংকটময় পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কিভাবে মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকবে? তখন তাদের জন্য এক মুঠো ভাত কে যোগাড় করে দেবে। সেই পরিস্থিতিতে ওরা কাজ করে অন্নসংস্থান করতে চেয়েছে। নিজের সাধ্যমতো পরিশ্রম করে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। নাটকে দেখা যায় মধ্যরাতে ভাঙাচোরা বাড়ির এক ঘরে অতীতের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অতুল ও নিমাই এর সংলাপে ধরা পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব। সংকটময় পরিস্থিতিতে একে-অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সময়ের পরিবর্তনে দুই বন্ধুর মানসিকতা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকে তা তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে একজন বন্ধু, অন্য বন্ধুকে প্রতারণা করে খুশি হতে চেয়েছে তা নাট্যকার পাঠকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। নাটকে দেখা যায় নিমাই— অতুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— 'আমাকে অবিশ্বাস করছিস? আচ্ছা এই তিন বছর ধরে তোতে আমাতে এক সঙ্গে আছি। যেদিন খাবার জুটেছে সেদিন সমান ভাগ করে খেয়েছি। যেদিন পাই নি সেদিন দুজনে না খেয়ে কাটিয়েছি।' অভাব-অনটন ক্লিষ্ট পরিবারের জন্য গায়ে-গতরে খেটে তারা টাকা রোজগার করেছে। সরকারি ভাষায় সমাজ বিরোধী হয়ে তারা বেঁচে থাকতে চায় না। তারা নাকি সমাজের পাপ। দূর দূর —এভাবে বেঁচে থাকতে তাদের ভালো লাগে না। সর্বোপরি নাট্যকার তাদের অস্তিত্বের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। সংকটময় পরিস্থিতিতে নিমাই, অতুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— 'যদি কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাই—

অতুল। এখনও তোর মাথায় ঐ সব কথা ঘুরছে।

নিমাই। আহা, বললাম তো ধরতে ক্ষতি কি।

অতুল। আচ্ছা ধরলাম। কত হাজার ধরব বল্।

নিমাই। ধর দশ হাজার — কি করবি?

অতুল। গাঁয়ে ফিরে যাব। ছোট্ট একটা ঘর তুলব। তারপর দুজনে মিলে একটা দোকান দেব।

নিমাই। ঠিক আছে। আমার প্ল্যানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তোর একটা বিয়ে দিয়ে টুকটুকে বৌ আনব। তোর বৌ রাঁধবে— বাড়বে— আমরা খাব। আর মজাসে দোকান চালাব।' অভাবগ্রস্ত সংসারে তাদের কর্তব্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ব বড় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে নৈতিক আদর্শ মেনে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে। আট হাজার টাকার বাণ্ডিল নিয়ে অতুল ও নিমাই এর মধ্যে স্বার্থপরতা লক্ষ্য করা গেছে। অতুল, নিমাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— 'আমরা কি বোকা। পুঁটলি আগে কে দেখেছে, কে ছুঁয়েছে সেই নিয়ে তর্ক করে মরছি কেন। ও যেই দেখুক না কেন টাকাটার মালিক তো আমরা দুজনেই। তার উত্তরে নিমাই বলেছে, সত্যি আমরা কি বোকা না। আমরা কি বোকা।'

অতুল বলেছে— আর আমাদের চুরি জোচ্চুরির কথা ভাবতে হবে না। বহুবিধ সমস্যা আমাদের চিনিয়ে দিয়েছে আমাদের অস্তিত্বে সুপ্ত হয়ে আছে কতটা পশুত্ব। দুজন-দুজনকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। বৃষ্টিভেজা রাতে নিমাই ঘুমোনোর ভাণ করে পড়ে রয়েছে। পেটে খিদে রয়েছে বলে কিছুতেই ঘুম আসছে না। অতুলের নাক ডাকার শব্দ শোনা গেলে, নিমাই উঠে বসেছে। তারপর নিমাই আস্তে আস্তে পোড়ো বাড়িটার কলসীটার কাছে হাজির হয়েছে। কলসী থেকে, পুঁটলিটা বের করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে এমন সময় অতুল উঠে বসেছে। সেইসময় নিমাইকে লক্ষ্য করে অতুল বলতে শুরু করেছে— 'বিশ্বাসঘাতক শয়তান কোথাকার। টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার উত্তরে নিমাই বলেছে— বেশ করব, নেব। এ টাকা আমার। পরক্ষণেই অতুল বলেছে— কক্ষনো না, এ টাকা আমার।' আমাদের সমাজে ধনী ও গরীবের বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মধ্যবিত্ত— নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ অনাহারে দিন অতিবাহিত করেছে। সেইসঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ খাদ্যের অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। যারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, গৃহহীণ তাদের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ। ছিন্নমূল মানুষ হওয়ার কারণে যাদের জমি-জায়গা, বাসস্থান কিছুই নেই। খোলা আকাশের নীচে, রেলের ছাউনিতে যাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। নাট্যকার কিরণ মৈত্র 'কোথায় গেল' নাটকে অতুল ও নিমাই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেইসব মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নাটকে দেখা যায়— 'অতুল, নিমাই এর হাত থেকে পুঁটলিটা কেড়ে নিতে গিয়ে তা খুলে যায়। নোটের বাণ্ডিলগুলো ছড়িয়ে পড়ে স্টেজের ওপরে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ওরা পরস্পর মারামারি শুরু করে। তারপর হঠাৎ অতুলের এক প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে নিমাই ছিটকে পড়ে যায়। অতুল নোটের বাণ্ডিল গুলো কুড়িয়ে পুঁটলিতে ভরতে শুরু করে। তারপর একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে হঠাৎ সে যেন থমকে দাঁড়ায়। তারপর মোমবাতির আলোয় তা ভালো করে দেখতে থাকে। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। এ কিরে, এগুলো যে সব জাল নোট।'

সবই জাল নোট। নিশ্চয়ই কেউ ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে রেখে গেছে। কিংবা এই বাড়ীতেই নোট জাল করা হতো। কিছুক্ষণ পর তারা নিজেদের কর্মের জন্য নিজেরা অনুশোচনা করতে থাকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অতুল, নিমাই এর গায়ে হাত বুলোতে থাকে। নিমাইও অতুলের। হঠাৎ অতুল নিমাইকে জড়িয়ে ধরে বলে— 'আমরা কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম, নাঃ'। মানুষের মনে তখন কোনো সুখ ছিল না। এমনকী হতাশা, নৈরাজ্য ও ক্লান্তি মানুষকে ঘিরে ধরেছিল। তবুও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য জীবনকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে কেননা অস্তিত্বের সংকট মানুষের জীবনে এমনভাবে নেমে আসে, তখন তার যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার প্রতিটি মানুষই আশা করে বা অপেক্ষা করে সংকট কাটিয়ে বেঁচে থাকার। সেইজন্য মানুষে মানুষে বিশ্বাস,

শ্রদ্ধা ও আদান-প্রদানের মধ্যেই রচিত হয় সুস্থ সামাজিক জীবন। মানুষের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় পরিস্থিতির চাপে। তারফলে মানুষের মনের সবুজতা নষ্ট হয়ে যায়। সততা, মূল্যবোধ এই শব্দগুলির কোনো গুরুত্ব নেই সংকটপূর্ণ মানুষের কাছে। শেষ পর্যন্ত মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে নিজের সুখের জন্য বন্ধুর সঙ্গে অসহযোগিতা করে চলেছে। কেননা স্বাধীনতার পর বাঙালির উপর দিয়ে একটার পর একটা দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে। ফলে জীবনের মহৎ মূল্যবোধ, শ্রেষ্ঠতম আদর্শভাবনা থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই একদিকে যেমন সামাজিক অবক্ষয় দেখা গেছে অপর দিকে তেমনি মানবীয় সত্তায় বিপর্যয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাই মানুষে-মানুষে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হোক, নাট্যকার তা আশা করেন ; কিন্তু সংকটময় পরিস্থিতিতে তা ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত হয়েছে।

৪০৫.১.৯.৪ একাঙ্ক নাটকরূপে সার্থকতা

ড. অজিত কুমার ঘোষ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— 'ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা এগুলিই একাঙ্ক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ। একটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে এই লক্ষণ ধরা পড়ে।' একাঙ্ক নাটকে একটি মাত্র বিষয় থাকবে। নাটকে কলা-কুশীলবের সংখ্যা কম হবে। নাটকের ত্রিবিধ ঐক্য বজায় থাকবে, সেগুলি হল, ক্রিয়াগত ঐক্য, স্থানগত ঐক্য ও কালগত ঐক্য। একাঙ্ক নাটকে ঘটনার দ্রুতময়তা লক্ষণীয় বিষয়। পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটকের আয়তন দীর্ঘ, আর একাঙ্ক নাটকের আয়তন সংহত। একাঙ্ক নাটকের সময়সীমা ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার কিছু কম বা বেশী হয়। কিরণ মৈত্রর লেখা 'কোথায় গেল' একটি অসাধারণ একাঙ্ক নাটক। নাট্যকার এক বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসহায় দুই বন্ধু অতুল ও নিমাই কিভাবে জীবন যুদ্ধে সামিল হয়েছে তার চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন। নাটকের সমস্ত সংলাপ অতুল ও নিমাইকে কেন্দ্র করে। কখনও দুই বন্ধুর অতীত জীবন আবার কখনও বা অর্থনৈতিক সংকট নাটকে ঘুরে-ফিরে এসেছে। নাটকের শেষে দুই বন্ধুর লোভ, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে হিংসা-মারামারি সমস্ত কিছু ভুলে পরস্পর-পরস্পরকে কিভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি নাটকের চরিত্র দুটির বোধোদয় হয়েছে। নাট্যকার কিরণ মৈত্র— 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের শেষে বলতে চেয়েছেন— মানুষের বিপদে মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। জ্ঞানের আলোয় মানুষের বিবেক জাগ্রত হয় বলে, মানুষ নিজেই কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ বুঝতে পারে। পেটের জ্বালা মানুষের বড় জ্বালা, একমুঠো ভাতের জন্য দুই বন্ধু মারামারি করেছে। জাল নোটের বান্ডিল নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে দুই বন্ধুর মনের হিংস্রতা বেড়ে গেছে। তার ফলে প্রায় তিন বছরের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। খাদ্যের অভাবে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দিশাহীন। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন আমাদের সমাজে সংকটময় পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে। 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের একেবারে শেষে— 'এ কিরে, এগুলো যে সব জাল নোট।' বা অতুল, নিমাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— 'হঠাৎ আমরা কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম নাঃ।' সংকটময় পরিস্থিতিতে নাট্যকার মানবিকতার অভাবের কথা বলতে চেয়েছেন। নাটকটি খুব বেশি বড় নয়। নাটকটি ৪৫-৬০ মিনিটের মধ্যেই অভিনয় যোগ্য। সর্বোপরি বলা যায়— সার্থক একাঙ্কিকার সব লক্ষণই 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে নাটকটিতে। তিনি ভুক্তভোগী ছিলেন বলে সংকটের কথা

এত জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন। ফলে যে নিবিড় মমতা ও ভালোবাসার টান নাট্যকারের কলমে শিল্পরূপে লাভ করেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪০৫.১.৯.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের প্রধান সমস্যা আর্থিক অভাব-অসঙ্গতি, নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২। 'কোথায় গেল' একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩। একাঙ্ক নাটকরূপে 'কোথায় গেল' নাটকটির সার্থকতা বিচার করো।

৪০৫.১.৯.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস— ড. অজিত কুমার ঘোষ

২। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ— সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৩। নাট্যতত্ত্ব বিচার— ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস— দর্শন চৌধুরী

৫। বাংলা নাটকের দিগ্বলয়— অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়।

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষপত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-১

আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব

কেবলমাত্র সাহিত্যই নয়, দেশ-কাল-সমাজ, অর্থনীতি কোন কিছুই কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে সমগ্র বিশ্বে মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব বা নভেম্বর বিপ্লব। আমরা জানি নভেম্বর বিপ্লব মানব জাতির কল্যাণে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছিল। কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই নয়, সমগ্র বিশ্বে এই বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সেই দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়ার ফলে সমগ্র পৃথিবীর শোষিত মানুষ বুঝতে পেরেছিল, নিজের দেশের মাটিতেও সমাজতন্ত্র কায়েম করার মধ্যে দিয়েই মানুষের মৌলিক সমস্যা ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সমাজতন্ত্রের কথা তৎকালীন সময়ের ভাববাদী দার্শনিকদের মুখ থেকে শোনা যায়নি। তাঁরা বলেছিলেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যকবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

পৃথিবীখ্যাত চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক কার্ল মার্কস তাঁর জীবদ্দশায় লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্য বস্থা দেখে যেতে পারেন নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে জারদের প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যস্থা ভেঙে দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে বলশেভিকরা নতুন সমাজ কাঠামো নির্মাণ করে। পূর্বে দেশের উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদনের হাতিয়ার এবং বন্টনের অধিকার সমস্ত কিছুই ব্যক্তিগত কয়েকজনের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল অভিমুখ থাকে সাধারণ মানুষের প্রতি বা মানব কল্যাণের দিকে। উৎপাদনের অভিমুখ যেহেতু মানবকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়, তাই এই সমাজব্যকবস্থা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিপূর্বে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে অজস্র বিপ্লব সংঘটিত হতে দেখেছি, সেখানে দাস ব্যষবস্থা ভেঙে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়েছে, কখনও আবার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ব্যবস্থার অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত

সমাজের অবসান ঘটেনি। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকালের শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অবসান ঘটে। সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজের শোষিত, বঞ্চিত মানুষ নিজেদের ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজেদের করুণ পরিণতিকে মান্যতা দিয়ে এসেছে। এই প্রথম নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শোষিত মানুষ জানতে পারে, বুঝতে পারে, তারাই মানব সভ্যমতায় সমাজ পরিচালনার মূল পরিচালিকা শক্তি। পরবর্তীকালে যার প্রভাব আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' নাটকেও দেখতে পাই। যেখানে সমাজের নীচু তলার মানুষ, যারা সর্বদা উচ্চ শ্রেণির মানুষের দ্বারা অবহেলিত, নির্যাতিত হয়ে এসেছে, তাদের হাতেই শেষপর্যন্ত রথের চাকা গড়িয়ে চলে। আর এই ভাবনা কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজের সাধারণ, নিপীড়িত মানুষ নিজেদের অধিকার আদায় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। নভেম্বর বিপ্লবের এই প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের মানুষকেও প্রভাবিত করেছিল। ভারতের শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মনের মধ্যেও ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা জন্মায়। যার ফলস্বরূপ ১৯২০ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি জন্মলাভ করে। তারপর কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণসংগঠন তৈরি করে। কেননা সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। এই স্বল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে কখনওই ভারতের মতো জনবহুল দেশে (বিশাল দেশে) বিপ্লব বা আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই তারা ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী-সাহিত্যিক সকলের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন তৈরি করতে থাকে। গণসংগঠনের মধ্যে দিয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায় এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

পরিবর্তনশীল সমাজে শিল্প-সাহিত্য কাদের জন্য রচিত হবে, এই ধারণা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। তৎকালীন সময়ে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক চেতনারও উন্মেষ ঘটেছিল। ব্রিটিশ সরকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে যতটা না ভয় পেত, তার থেকে বহুগুণ বেশি ভয় পেত বিপ্লবী আন্দোলনকে। আবার এই বিপ্লবী আন্দোলনের থেকেও বেশি ভয় পেত সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারই নয়, সমগ্র পৃথিবীর শোষকশ্রেণিই ভয় পেত কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং তার গণ সংগঠনকে। তৎকালীন বিশ্বে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূরা 'লালজুজুর' ভয়ে আতঙ্কিত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটিশ শাসন এবং শোষণের নগ্ন রূপ, সাম্যবাদী আন্দোলনকে এক প্রকার সহায়তা দান করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজব্যস্থায় শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাশচার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি যত পরিমাণে বাড়তে থাকে, ততই শোষিত, বঞ্চিত মানুষ তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে। অত্যাচার, নিপীড়নের মাত্রা বাড়তে থাকায় শোষিত মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এবং তারা শোষকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে লড়াই সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসে। তখন এই শোষিত মানুষের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তারা সমস্ত ভয়, ভীতি, শাসকের বুলেটের গুলি উপেক্ষা করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই সংগ্রামের জন্য। তৎকালীন সময় দেশের শোষিত মানুষের মধ্যে নানামুখী আন্দোলন গোপনে এবং সঙ্গোপনে ঘটেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন, শোষণের মাত্রা প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছে প্রতিনিয়ত। দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। ১৯১৯ সালে রমাঁ রলাঁ সংগঠিত করেন 'Declaration of Independence of Thought'। যার মাধ্যমে ম্যাক্সিন গোর্কি বারবুস, বাট্রান, রাঁসেল প্রমুখ পৃথিবীখ্যাত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা বিশ্বময় সমাজতান্ত্রিক ভাবনা প্রচার করতে লাগলেন। ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরও সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আনন্দকুমার স্বামী। সমগ্র বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংস্থার সর্বভারতীয় যে কমিটি ১৯৩৭ সালে কলকাতায় গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ধ্যানধারণা ও পুরোনো মানসিকতাকে বর্জন করে নতুন ভাবনায় কাব্য, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এগিয়ে এলেন শিল্পীরা। এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকার মধ্যে দিয়ে কিছু নতুন শিল্পী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। যারা কিনা উনিশ শতকীয় জীবন ভাবনার মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত রাখেন নি। স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখতে পাই, নতুন যুগের সাহিত্যিকরা তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কথা তুলে ধরেন। এইসব সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই শিল্পী, সাহিত্যিকরা এগিয়ে এলেন সাহিত্য এবং শিল্পকলা রচনা করতে। তাদের হাতেই সুস্পষ্ট হতে লাগল শাসকের প্রকৃত চরিত্র। আমাদের সাহিত্যেও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। এই মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝা যায়, তৎকালীন সময়ের কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বের লেখনীর মধ্যে দিয়ে। অথচ এই সময়কালে বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে সেইপরিবর্তন লক্ষ্যা করা যায়নি। সেই সময়কালে পরিবর্তিত নতুন জীবন ভাবনা বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চে লক্ষ্য করা যায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পেশাদারি বাণিজ্যিক নাট্যশালায় শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব ঘটে। কলেজের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি পেশাদারি নাট্য নির্দেশকের জীবন গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল বাংলা রঙ্গালয়ের নট এবং নটীদের জীবন সমাজের চোখে নিন্দিত ও অপাংক্তেয় ছিল। অধ্যাপনার নিশ্চিত জীবন ত্যারগ করে নতুন গতিতে রঙ্গমঞ্চকে নতুনভাবে সাজাতে এগিয়ে এলেন শিশির কুমার ভাদুড়ী। তিনি নতুন রীতিতে নতুন আঙ্গিকে রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়কে নতুনভাবে প্রাণদান করলেন। রুচিবোধ, নাট্যজ্ঞান সম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের প্রশংসা অর্জন করেন সমকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। অন্যদিকে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখনও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। এই জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের বাইরেও ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখরা বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ সরকারকে দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করতে সশস্ত্র পথ প্রয়োজন।

এই সময়কালে আমাদের দেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায় জাতীয় কংগ্রেস দলের মধ্যে চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের বিভ্রান্তি থেকে সরে আসেন চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখরা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকরা কলকারখানা এবং বন্দরে ধর্মঘট পালন করেছিল। শ্রমিকেরা বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসু পৃথক আন্দোলনের ডাক দেন। আমাদের দেশে গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠন জন্মলাভ করে। অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সেগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল আনরেস্ট কমিটির প্রতিবেদনে জানা যায় ১৩৭টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। অপরদিকে চা বাগানের শ্রমিকেরাও ১৯২১ সালে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলে ব্রিটিশ সৈন্যিরা গুলি চালিয়ে হত্যা করে। ব্রিটিশ সৈন্যবদের এই গুলি চালানোর বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের সমর্থনে রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন এবং স্টীমার কর্মীরাও ধর্মঘট পালন করেছিল। পাশাপাশি

১৯২০-২১ সালে কলকাতার ট্রাম শ্রমিকরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিকদের থেকেই আমাদের দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটতে থাকে। ১৯২৮ সালে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়। এই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠনগুলিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলন মজবুত করতে এবং সংগঠন তৈরির কাজে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই গণসংগঠনের দ্বারা ভারতের আপামর শ্রমিক শ্রেণির মানুষ প্রভাবিত হয়। শ্রমিক এবং কৃষকরা বুঝতে পারে তাদের জীবন যন্ত্রণা, শোষন বঞ্চনার মূলে শোষকের নীতি দায়ী। রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এই বোধ শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে জাগত হয়। ভারতের মূলত মুম্বাই ও কলকাতা কেন্দ্রীক এবং বন্দর কেন্দ্রীক শ্রমিক সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়।

আমরা লক্ষ্য করি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯২৯) পর পরই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। যার প্রভাব আমাদের দেশের উপরেও আছড়ে পড়ে। ভারতে এই আর্থিক সংকটের ফলে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যরবিত্ত সকল শ্রেণির মানুষদের মধ্যেই প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। ধান, পাট, তুলোর দাম কমে যাওয়ায় ভারতের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অনেক জায়গায় বাধ্য হয়ে শ্রমিক, কৃষকেরা হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে। সরকার বাহাদুর নিষ্ঠুর দমন নীতি গ্রহণ করলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এক প্রকার বাধ্য হয়ে শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলি বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করে। অপরদিকে এই সময়কালে গান্ধীজির নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তা মূলত বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই আন্দোলনের মধ্যে দেখা যায় ঐ শ্রেণি-চরিত্রের রূপটাই প্রকাশ পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অভিশপ্ত 'কালা আইন'বা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৮৭৬ সালে এদেশের নাটক ও নাট্য শালার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। তেমনই আবার ১৯১৯ সালে রাওলাট অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এবং তাদের শাসনের নগ্ন ও কুৎসিত চেহারা দেশবাসীর সামনে উঠে আসে। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে বাংলার রঙ্গমঞ্চে ব্রিটিশ বিরোধী কোন কথা বলা বা অভিনয় দেখানো নিষিদ্ধ ছিল। অন্যগদিকে দেখা যায় কালা কানুনের (রাওলাট অ্যাক্ট) ফলে দেশের যে কোন সময় যে কোন মানুষকে বিনা বিচারে আটক করা, গ্রেপ্তার করা, অকথ্য অতযাছনচার, সভা-সমাবেশ বন্ধ করা, এমনকি জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করা যেত। ব্রিটিশ শাসনের এই পৈশাচিক রূপ দেশবাসীকে একদিকে যেমন আতঙ্কিত করেছিল, অপরদিকে তেমন আন্দোলন, লড়াই ও সংগ্রামে সামিল হতে সাহায্য করেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক জুড়ে কিছু হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক ব্যতিরেকে পরাধীন দেশের যে আত্মযন্ত্রণা দেশবাসীর মধ্যে থাকে, তা কিন্তু বেশিরভাগ শিল্পী-সাহিত্যিকরা শিল্প সৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরেন নি। পৃথিবীর যে কোন পরাধীন জাতির কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলের মধ্যেই এই আত্মযন্ত্রণা থাকা স্বাভাবিক। আমরা দেখেছি বহু দেশে কোথাও কবি কোথাও আবার লেখকদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, শোষকের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য। অনেক সময় দেখা যায়, শিল্পী-সাহিত্যিকদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্বীকার হতে হয়েছে। তবে আমাদের দেশে কিন্তু এই প্রকার ঘটনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত করা যায় না। এমনকি এই সময় এদেশে নাট্যশালা বা নাটককারেরাও সেইভাবে এগিয়ে আসেন নি। বরাবরই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে এক প্রকার হাত গুটিয়ে রেখেছিল। অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯

সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যারকান্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি নিষিদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও ওয়ার্কস লীগকেও বেআইনি ঘোষণা করে। তার পূর্বেই কৃষকসভার সংগঠন তৈরি হয়। আবার ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় একাধিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট নেতারা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনেতারা ক্ষমতা দখল করেন। ইতালি, জার্মানি, স্পেন, জাপান, গ্রীসে উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতাদের আবির্ভাব ঘটে। যেমন জার্মানিতে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনী, স্পেনের ফ্রাঙ্কো, জাপানের তোজো প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সেখানকার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে প্রথমেই দেশীয় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেন। জেনারেল ফ্রাঙ্কো থেকে হিটলার প্রত্যেকেই তাদের দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধীন সত্ত্বাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। হিটলার এবং মুসোলিনীর দ্বৈত আস্ফালনে সমগ্র ইউরোপে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র ইউরোপ নয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকাও ভীত ও আতঙ্কগস্থ হয়ে পড়ে। যার প্রভাবে গোটা বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। চিরকালীন শক্তিশালী দেশ হিসাবে ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের যে অহংকার ছিল, তা কয়েক বছরের মধ্যেই ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদেরা এই ফ্যাসিস্ট শক্তির ভয়ে আতঙ্কিত হয়। মানব সভ্যিতার ইতিহাসে বিজ্ঞানী-শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে অসত্য, বর্বর ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এই সময় সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে চিরকালীন শক্তিধর সাম্রাজ্যরবাদী শক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-আমেরিকা। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী দেশগুলি যাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে কখনও সূর্য অস্তমিত হত না, তারা এতদিন নিজেদের শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে মনে করত, তারাও নাৎসী বাহিনীর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অপর প্রান্তে ছিল শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই সময় সারা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ দেশ ছিল কলোনী। চিরায়ত শক্তির কাছে তারা এক প্রকার পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। হিটলার ও মুসোলিনীর বাহিনী ইউরোপের একের পর এক দেশ যে শুধু দখল করেছে তাই নয়, লুণ্ঠনও করেছে। জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নন আক্রমণাত্মক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও হিটলারের নাৎসী বাহিনী পূর্ব ইউরোপ দখল করার পর সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। প্রাথমিক পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হঠে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী পিছু হঠার পর দ্বিতীয়বার সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। লালফৌজের কাছে নাৎসী বাহিনী পরাজিত হয় এবং পিছু হঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মানব সভ্যতার সঙ্কট যেমন প্রকট হয়েছিল, তেমনি বিশ্বের মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়েছিল। সেই অন্ধকার কেটে যায় এবং নতুন সূর্যের উদয় হয় লালফৌজের হাত ধরে। এই সময়কালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে লেবার পার্টি জয়যুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংগঠিত ও একত্রিত হয়েছিলেন। বিশ্ব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেই ১৯৩৬ সালে ভারতে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তার দু'মাসের মধ্যেই আমাদের দেশের বিভিন্ন শহরে, যেমন- কলকাতা, মুম্বাই, লক্ষ্ণৌ, পুণে,

এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি জায়গায় আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে ওঠে। জাতীয় প্রগতি লেখক সংঘের তরফ থেকে একটি ইস্তেহার প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুন্সী প্রেমচাঁদ, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জওহরলাল নেহেরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু প্রমুখের স্বাক্ষর ছিল। আবার ১৯৩৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার'-এর সর্বভারতীয় কমিটি। যার সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সারা পৃথিবীর চিন্তাবিদ, লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকরা মিলিত হন। বিশ্বজুড়ে যে আসন্ন বিপদ, সঙ্কট তার প্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংগঠিত হতে শুরু করেন। ইতিপূর্বে সারা বিশ্ব দেখেছিল কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সংগঠন। পূর্বে মানুষ অভ্যস্ত ছিল রাজনৈতিক সংগঠন দেখতে। কিন্তু এবার দেখল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠন। পূর্বে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল, তাঁরা কল্পলোক বিলাসী, গগনমুী এবং বাস্তবতার মাটি থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন। এই প্রথম মানুষের চিরায়ত ধারণার অবসান ঘটল। আন্তর্জাতিক স্তরে আগেই শোনা গিয়েছিল- 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান। আবার দেখা গেল লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে একক ভাবে নয়, সংগঠিত ভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে শ্লোগানে সামিল হয়েছেন। তা শুধুমাত্র কোন এক দেশেই নয়, দেশে দেশে এবং দেশান্তরে।

প্রগতি লেখক সংঘের প্রত্যক্ষ প্রচার, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের আন্তরিক আগহ, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণনাট্য আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। যেমন মুম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভেই গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয় জননাট্য আন্দোলন নাম দিয়ে ১৯৪১ সালে। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজের জয়ী হওয়া, নাৎসীদের পরাস্ত করা এবং ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির জয়ী হওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় ১৯৪৩ সালে মে মাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হওয়ার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র হিটলারের নাৎসীবাহিনীর পরাজয় ঘটল তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলির মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন উজ্জীবিত হল। কিছুকাল যেতে না যেতেই একের পর এক দেশ স্বাধীন হল। আবার অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো গঠিত হল। আমরা দেখলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সমাজতন্ত্রের সুখ ভোগ করতে লাগল। আবার কিছু মানুষ লড়াই করতে লাগল নিজের দেশের মাটিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া অপর অংশে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া। একদিকে নেতৃত্ব দিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে আমেরিকা। সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হওয়ার মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল অংশই নয়, মেহনতী মানুষ এবং শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা, শ্রদ্ধা এবং দায়বদ্ধতা বহুগুণ বেড়ে গেল। যার প্রভাবে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কমিউনিস্ট পার্টির বিস্তার ঘটল।

১৯৪৩ সালে মুম্বাইয়ের একটি হাইস্কুলে সমগ্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে একটি সম্মেলন হয়। ১৯৪৩ সালের ২৫শে মে সেই সমান্তরাল অধিবেশনে ভারতের গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণনাট্যের নানা শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে। গণনাট্য সংঘ সেই সময় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলিকে একই ছত্রছায়ায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময় সমাজ সচেতন

শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ একটি অংশ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার অনুশীলনে আগামী দিনের গণ আন্দোলনকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ শাসিত আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং ভূ-স্বামীদের ভারতে কেবলমাত্র সংস্কৃতি উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গণনাট্য এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আপামর জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। নতুন গতিতে ভারতের গণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গণনাট্য আন্দোলন যে ভূমিকা পালন করেছিল, তা সত্যি প্রশংসনীয়। গণনাট্য আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা শোষিত মানুষের কথা শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। এই গণনাট্য আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণির অধিকার অর্জন এবং মানব মুক্তির জন্য লড়াই সংগ্রাম করার প্রয়াস যুগিয়েছিল। বাংলার নাট্য আন্দোলনে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে গণনাট্য সংঘের অবদান বা কৃতিত্ব সবথেকে বেশি। ইতিপূর্বে শিল্প-সাহিত্য শুধুমাত্র আনন্দ দান ও বিনোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র আনন্দ প্রদান বা রসাস্বাদনই নয়, আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতাও উঠে এসেছিল।

১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর মুম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক অভিনীত হয়। এই সময় বাংলার গণনাট্য সংঘের অন্যতম নাটককারেরা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, দয়াল কুমার, বিনয় ঘোষ, শম্ভু মিত্র প্রমুখ। এই সময়ে সমাজের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকরা দলে দলে গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়েই সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালি নারীরা অভিনয় জগতে পদার্পণ করেন। যে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ বিশ শতকের তিনের দশকে হ্রাস পেয়েছিল, ঠিক চারের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে তা দুর্বার গতিতে শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখকদের মাধ্যমে এগিয়ে চলল। গণনাট্য সংঘের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন নাট্যকার, লেখক, কবি সকলেই শিল্পের দায়বদ্ধতা, বাধ্য-বাধকতা এবং যৌথ নেতৃত্বের ভাবনাকে সামনে নিয়েই পথ চলা শুরু করেছিল। শুধুমাত্র নাটক নয়, গান-বাজনা সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রীক নয়, প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলায় আপামর মানুষের কাছে শিল্পীর শিল্পকর্ম পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে গণনাট্য সংঘ। তৎকালীন সময়ে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল জনমানসে। অর্থনৈতিক সঙ্কট, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচার, মুনাফাকরদের কালোবাজারি ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবেরেটারী' প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনা জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়াও অভিনয় সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল গণনাট্য সংঘের কর্মীরা তৎকালীন পরিস্থিতি উল্লেখ করতে গিয়ে সমসাময়িক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগন্থের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় উল্লেখ করেছেন —

'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়।
আমার বিনীদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।'

পরাধীন ভারতের তীব্র খাদ্য অভাব, অর্থনৈতিক সংকট তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। প্রতিনিয়ত সম্রাজ্যবাদীদের বোমার হান আমাদের জীবনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। একদিকে কবি প্রত্যক্ষ করেন খাদ্যের জন্য মানুষের দীর্ঘ লাইন। অপর দিকে সম্রাজ্যবাদীদের করাল গ্রাস কীভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বিপর্যস্ত করেছিল তা দ্বিধাহীন কণ্ঠে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার অপরদিকে হিটলার — জাপানী সৈন্যদের আক্রমণ, সব কিছু মিলেই আমাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। আবার এই অত্যাচারের সঙ্গে দেশীয় মুনফাখর কালোবাজারি একত্রিত হয়ে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে অনেকাংশে অত্যাচার, নিপীড়নের মাত্র বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারই মধ্যে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য আমাদের সামনে এই শোষণ নিপীড়নের ছবি উল্লেখ করেছেন তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে মহামারী, মন্বন্তর, মহাপ্রলয়ের ফলে উন্মত্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইংরেজিতে ১৯৪৩, বাংলায় যা কিনা ১৩৫০ সালে, অবিভক্ত বাংলায় ভয়ঙ্কর মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। যা ইতিহাসের পাতায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে উল্লেখিত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনা, ভয়াবহতা ও তার ব্যাপকতা ইতিহাসকে কঠিন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও ব্রিটিশ রাজশক্তি তার দেশ এবং ইউরোপ এই যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার উপনিবেশ হিসাবে ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়া এবং বাতাবরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভারতের আকাশ পথে এবং স্থল পথে ইংরেজ মার্কিন সৈন্যর আনাগোনা, জাপানী বোমারু বিমান, যুদ্ধের ভয়াবহতা ভারতবাসীকে উদ্বেগে রেখেছিল। একদিকে জাপান চীনকে আক্রমণ করছে, হিটলার সোভিয়েতকে আক্রমনকে করছে, জাপানী সৈন্যের কাছে ভারতের পূর্ব প্রান্ত আক্রান্ত হয়েছে - এইভাবেই ভারতবাসীকে ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

তৎকালীন সময়ে ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় কংগ্রেস। ব্রিটিশ শাসকেরা ভালোই বুঝেছিলেন ভারতে শাসনব্যবস্থা বজায় রাখতে হলে জাতীয় কংগ্রেসের সাহায্য প্রয়োজন। তাই কংগ্রেসের সহযোগিতা প্রার্থনায় ব্যর্থ ইংরেজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে তাদের দমন-পীড়নের মাত্রা সীমাহীন রূপ ধারণ করে। জাপানী সৈন্যরা ভারতে প্রবেশ করলে তাদের যাতায়াত পথে 'ডিনায়াল পলিসি' গ্রহণ করে। তাছাড়া জাপানী সৈন্যেরা ভারতে প্রবেশ করে যাতে খাদ্য সংগহ করতে না পারে তার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার 'পোড়া মাটির নীতি' (Scorched Earth policy) অবলম্বনে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের খাদ্য শস্য নষ্ট করে ফেলে।

১৯৪৬ সালে পরাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের সুদীর্ঘকালীন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে কালিমা লিপ্ত করে। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে তাদের শাসন মসৃণ করার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি শুরু করে। যদিও এই বিভাজনের বীজ ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রোপণ করেছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি ভারতে বসবাস করে এসেছে। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নতুন করে হিংসা-বিদ্বেষের আবহাওয়া তৈরি করেছিল। সাম্প্রদায়িক এই ক্ষত চিহ্ন আমাদের ব্যথিত করেছে। ১৯৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহ হয়। শাসক ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ রাজশক্তির পাশে দাঁড়িয়ে দেশীয় সেনাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ১৯৬৫ সালে নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর 'কল্লোল' নাটকের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নগ্ন চেহারা তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক কিংশুক রায় জানিয়েছেন —

'১৯৪৬'র নৌবিদ্রোহের সংগ্রামী ইতিহাস উঠে এসেছিল কলকাতার মঞ্চে, তা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজপথের প্রতিবাদেও। পঞ্চাশ বছর পরেও 'কল্লোল' আমাদের চেতনাকে বারে বারে সজাগ রাখতে সাহস জোগায়।'

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতে প্রায় একশো নব্বই বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। বহু আন্দোলন, বহু লড়াই, অনেক বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, অনেক মায়ের সন্তান হারানোর মধ্যে দিয়ে, আমরা পেয়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ দিনের অপূর্ণ স্বপ্ন, শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন, অত্যাচার ইত্যাদি স্বাধীনতার পর অবসান ঘটবে বলে ভারতবাসী মনে করেছিল। দুঃখের হলেও সত্যি পরাধীন শাসনে মানুষের যে স্বপ্ন ছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর পরেও সেই স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয় স্বাধীন দেশের সরকার। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের নতুন সরকার নতুনভাবে দেশ পরিচালনা করতে শুরু করে। যে গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়েছিলেন এবং গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল, তা পরবর্তী সময়ে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেস সরকার তার শাসনব্যবস্থা মসৃণ করতে গণনাট্য সংঘের আন্দোলনকে স্তিমিত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যদিকে গণনাট্যের অভ্যন্তরেও মূল রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। গণনাট্য সংঘের অনেক কর্মী, নেতৃত্ব এই বিষয়টিকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। এই বিষয়ে পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় পক্ষেই নিজেদের যুক্তিগাহ্য নিজেদের মতামত প্রদান করেছেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখেরা গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেড়িয়ে যান। যে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকরা স্বাধীনতার পূর্বে শিল্পীর এবং শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে গণনাট্য সংঘে একত্রিত হয়েছিল, তারাই আবার স্বাধীনতার পর সেই দায়-দায়িত্বকে অস্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের জন্ম ঘটেছিল, তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল আপামর জনসাধারণের মধ্যে, তারাই পরবর্তীকালে বলেন শিল্প এবং শিল্পী শুধুমাত্র শিল্পের জন্য।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একদিকে গণনাট্য সংঘের পথচলা অপরদিকে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ১৯৪৮ সালে শম্ভু মিত্র তৈরি করেন 'বহুরূপী' নাট্যদল, বিজন ভট্টাচার্য তৈরি করেন 'ক্যালকাটা কয়ার' (১৯৪৯) নাট্যদল। এইভাবেই একের পর এক গ্রুপ থিয়েটারের দল তৈরি হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হয়। এইসময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণ সংগঠন গণনাট্য সংঘেও তার প্রভাব পড়েছিল। অপরদিকে স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে জনগণকে নিজেদের পক্ষে টানতে থাকে। তৎকালীন সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের কলমে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়কালে উঠে এসেছিল, 'নবনাট্য', 'সৎনাট্য' আন্দোলনের প্রসঙ্গ। গণনাট্য থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হওয়া শিল্পীরাই সূচনা করেছে নবনাট্য আন্দোলন। নাট্যকার শম্ভু মিত্র, সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে উল্লেখ করেছিলেন এইরকম যে, 'নবান্নে' যার সূচনা 'রক্তকরবী' তে তার হয়েছে সমাপ্তি। নাট্যকার অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—

'নবনাট্য আন্দোলন বাংলাদেশের 'উত্তর গণনাট্য পর্যায়ের' এবং 'গণনাট্য' ও 'নবনাট্য' দুটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্দোলন'[৩]

আমরা গণনাট্য এবং নবনাট্য দুটি পৃথক সংগঠন, নাকি একই সংগঠন এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু ও আমরা লক্ষ্য করি, গণনাট্য আন্দোলনের মতাদর্শগত চিন্তাভাবনা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভিমুখের মধ্যে লুকিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অভিমুখকে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক গ্রহণ করতে পারেন নি। গণনাট্য আন্দোলনের অভিমুখ বুঝতে হলে রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। বহু অগ্রজ লেখকরা কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য লাভ করলেও পরবর্তী সময়ে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে গণ আন্দোলনের কথা গণনাট্যের নানা সময়ের দলিলে বার বার উঠে এসেছে। শিল্প, শিল্পী, শিল্পের ভাষা, শিল্পের উৎকর্ষতা এবং আত্মতুষ্টির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্য চর্চায়। আমরা জানি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শিল্প-সাহিত্য, গান-বাজনা সহ কোন কিছুই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। সেখানে অগ্রজ শিল্পী-সাহিত্যিকরা গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে যে নিরপেক্ষতার ভণিতা করেন, তা অনেককেই বিভ্রান্ত ও হতাশ করেছে। সময়ই প্রমাণ করে দিয়েছে নির্দিষ্ট মতাদর্শ এবং ভাবনা চিন্তা ছাড়া কোন শিল্পকর্মই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে না। আমার এই আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে সময়ই বলবে, 'নবনাট্য' ও 'সৎনাট্য' কতটা প্রাসঙ্গিক।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, বাংলা মৌলিক নাটক কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে দেখেছি, মূলত অনুবাদকৃত নাটক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা মৌলিক নাটকের সূচনা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসন রচিত হয়েছে। তারপর সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচিত হয়ে ছিল। বিশ শতকের গোড়াতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক রচিত হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এবং গণনাট্য আন্দোলনের উদ্ভবপর্বে রাজনৈতিক নাটক, একাঙ্ক নাটক এবং পথনাটকের উত্থান ঘটে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের পর থেকে বিভিন্ন নাট্যকারদের হাত ধরে বাংলায় রাজনৈতিক নাটক, একাঙ্ক নাটক ও পথনাটকের আবির্ভাব ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ প্রান্তে নাট্যকার দয়াল কুমারের হাত ধরে 'মুক্তির অভিযান' নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা পথনাটকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। নাটককারের কন্যা মিতালী কুমার জানিয়েছেন, এই নাটকের নাম ছিল 'মুক্তির উপায়'। তবে এই নাটকের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এর পরপরই তিনি 'চিঠি' নামে আর একটি পথনাটক রচনা করেন। এই নাটকটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৫২ সালে পানু পাল, যার ভালো নাম পূর্ণেন্দু পাল তাঁর লেখা 'ভোটের ভেট' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা পথনাটকের সূচনা ঘটে। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথনাট্যকার বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- উমানাথ ভট্টাচার্য, পানু পাল, উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, চিররঞ্জন দাস, সঞ্জয় গাঙ্গুলী, প্রবীর গুহ, সজল রায় চৌধুরী, শিব শর্মা, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, অমল রায়, সফদর হাশমি, সুদীপ সরকার, হীরেন ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন দাস, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, সৌম্যেন্দু ঘোষ, গৌতম রায় চৌধুরী, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম বন্দ্যোপাধায়, দ্বীপায়ন ভট্টাচার্য, দীপক বিশ্বাস, মনীশ ঘোষ, সুপ্রিয় সর্বাধিকারী, আশিষ গোস্বামী, অসীম ত্রিবেদী, শ্রীজীব গোস্বামী, চয়নকান্তি দাস, অর্লভ চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য, বিজয় ভট্টাচার্য, আশিষ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও আরও পথনাট্যকার আছেন যারা এখনও পথনাটক লিখে চলেছেন একুশ শতকের ২-য় দশকেও।

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-২

বাংলা পথনাটকের উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

আধুনিক যুগে প্রসেনিয়াম থিয়েটার শহুরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা জানি, আমাদের দেশে আপামর জনগণের বেশিরভাগ অংশই গ্রামে বসবাস করে। গ্রামের মানুষের কাছে নাটক এক প্রকার বিলাসিতা। নাটক, নাট্যশালা এবং শিল্পীদের দায়বদ্ধতা থেকেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রথমে সাধারণ জনগণের কাছে নাটককে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আধুনিক পথনাটক, পথনাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শিল্পী এবং শিল্পের দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে এই অগণিত গ্রামীণ এবং শহুরে শোষিত শ্রমিক শ্রেণির কাছে আধুনিক পথনাটককে পৌঁছে দিলেন। এককথায় বলা যায় ইউরোপ এবং আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পথনাটককে আবিষ্কার করেছে এবং প্রচার করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা মানব মুক্তির সংগ্রাম করেছে। পথনাটক কখনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কখনও আবার ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কবি সাহিত্যিক মায়াকো-ভস্কি একসময় বলেছিলেন— পথ হল তুলি, ময়দান হল ক্যানভাস। পথ ধরে ঘরে ফেরা, ঘর থেকে পথে নামা। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ, বন্ধুত্ব, ছাড়াছাড়ি, হানাহানি, রক্তপাত, সম্প্রীতি, প্রতিবাদ, মিছিল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংঘর্ষ — পথ আর ঘর জুড়ে তুলির ডগায় ফুটে ওঠে বিচিত্র জীবন আর সংগ্রামের অজস্র রঙ। এই কুৎসিত, আতঙ্কিত সময়ে ময়দানের ক্যানভাসে কী ছবি শিল্পী আঁকবে - কেবলমাত্র পথনাটক নয়, শিল্প-সাহিত্যের সব অঙ্গনেই তার মাধ্যমের কারিগরদের কাছে এ এক গভীর চিন্তার বিষয় আজ। তাই আমরা দেখতে পাই শিল্পীর দায় দায়িত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীখ্যাত মনীষী রমাঁ-রলাঁর মতো আমরা বারবার যেন দাঁড়িয়ে বলতে পারি - 'আমরা থামবো না'। আমাদের অনেকেরই জানা যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের রুশ বিপ্লবের সময় এবং তার পরবর্তীকালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচার এবং সমাজতন্ত্রের শত্রুদের মুখোশ তুলে ধরার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পথনাটকের ব্যাপক বিস্তার ও বিকাশ ঘটানো নাট্যশিল্পীদের অন্যতম কাজ হয়ে ওঠে। মায়াকোভস্কির 'মিস্ট্রি ব্যুফে' নাটক এবং মায়ারহোল্ড যে নতুন ধারায় এবং রীতিতে নাট্য পরিচালনা করেন, তা অতীতের সমস্ত ধারা থেকে ভিন্ন। যা কিনা লোকশিল্পের উপকরণে সমৃদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাট্যকাররা পথনাটকের অনুপ্রেরণা এখান থেকেই অর্জন করেছিলেন। এই উৎসাহ ও প্রেরণা থেকে মায়ারহোল্ডের নাট্যরীতি সোভিয়েত ইউনিয়নে এক প্রকার নতুন নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। যাকে সাধারণ ভাবে বলা হত এজিট থিয়েটার। জার্মানীতেও পরবর্তীতে এজিট প্রপ থিয়েটার প্রসার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আন্তর্জাতিক স্তরে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে জার্মানী, জাপান ও স্পেনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি যত বেশি

ঘনিয়ে উঠেছে, তত বেশি করে সারা পৃথিবীর শিল্পী সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে সমগ্র বিশ্বে এবং আমাদের দেশে নানা দিক থেকেই সংকট ঘনীভূত হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য- সব ক্ষেত্রেই শিল্পীরা তাদের হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই ভাবেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আধুনিক পথনাটক আবির্ভূত হয়। প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকেরাও এই সময়ের ডাক মাথা পেতে নিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হিটলার যখন প্রথম শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তখন নাটক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আয়োজন চলল দ্রুত গতিতে। ১৯৪২ সালের ৭ ই জুলাই চীন দিবস উপলক্ষ্যে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (AISF) এক সভার আয়োজন করে। সেখানে যে নাটকটি অভিনীত হয়, তা হল- 'জাপানকে রুখতে হবে'। এই প্রথম শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকবোধ তৈরি হল। এক দেশের নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষের প্রতি অন্যদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরাও সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ প্রকাশ করতে লাগল। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের শোক, দুঃখ, কান্না, বেদনা সমস্ত কিছু মিলেমিশে বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠল। মানবতার যারা চিরশত্রু তারা এই ভাবে চিহ্নিত হয়েছিল গোটা পৃথিবীতে। মানবতার চিরশত্রুদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর শিল্পী-সাহিত্যিকরা একসুরে গথিত হয়েছিল। শিল্পীদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল 'পৃথিবী জুড়ে একটাই মানব জাতি'। এডুউইন উইলসন তাঁর 'The Theatre experience' নামক গন্থে আধুনিক পথনাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> *'A generic term which includes a number of groups that perform in the open and attempt to relate to the needs of a specific community or neighborhood. Many such groups sprang up in the 1960s, partly as a response to social unrest and partly because there was a need for a theater which could express the specific concerns of minority and ethnic neighbourhood'*

অনেক নাট্য সমালোচক পথনাটক বলতে মনে করেন, যে সমস্ত নাটকে শ্রমিক শ্রেণির কথা বলবে, যা সাধারণ মানুষের নাট্যতৃষ্ণার সঙ্গে জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরবে। দর্শকদের নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে থাকার জন্য একক শক্তিতে বিশ্বাসী দুর্নিবার জগতের বিপরীতে যৌথ চিন্তাভাবনা এবং সংঘবদ্ধতার ভাবনা তুলে ধরার মধ্যে দায়বদ্ধতা সমাজের প্রতি প্রতিফলিত হবে। এই পথনাটকে বাণিজ্যিক ভাবনা বা পেশাদারি দিকটি বেশি গুরুত্ব পাবে না। সংঘবদ্ধতার লড়াইয়ে জনগণকে আন্দোলিত করবে পথনটক। নাট্য সমালোচক Sam smiley পথনাটককে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। বিখ্যাত এই নাট্য সমালোচক মনে করতেন, পথনাটকের কাজ হল শিক্ষা এবং চেতনার জাগরণ ঘটানো। শিল্পের মায়াজাল রোপণ করা পথনাটকের কাজ নয়। স্বাভাবিকভাবে কৃত্রিম আলো, মঞ্চ, পোশাক, আবহ সঙ্গীত ইত্যাদি বাদ দিয়েই এই পথনাটক অভিনয় করা হয়। বিখ্যাত একজন নাট্য সমালোচক Sam smiley আধুনিক পথনাটককে যে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, তা হল 'didactic' এবং 'mimetic'।

আধুনিক পথনাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পৃথিবীর খ্যাতনামা নাট্য সমালোচকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক পথনাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কি আন্তর্জাতিক স্তরে, কি জাতীয় স্তরে সর্বজনবিদিত পথনাটকের কোন সংজ্ঞা কোন নাট্যকার দিতে পারেন নি। বিভিন্ন নাট্য সমালোচক পথনাটকের সংজ্ঞা দিতে

গিয়ে নানা বিষয় এবং বিভিন্ন সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের কথা উল্লেখ করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট এই আধুনিক পথনাটক কাকে বলে? সে সম্পর্কে উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের অনেক গভীরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। নাটক সৃষ্টির ইতিহাস গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আধুনিক পথনাটক সৃষ্টির বহু পূর্বে নাটক সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতিতে নাটক রচিত হয়েছে এবং নাটক অভিনীত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটকের অভিনয়ের ধারা ছিল ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন সময়ে লোকজ উপাদানকে কেন্দ্র করে নাটক অভিনীত হয়েছে। স্ব-স্ব ভূমিতে সেই দেশের মানুষ সেখান থেকে আনন্দ উপভোগ করেছে এবং রসাস্বাদন করেছে। সুদীর্ঘকালব্যাপী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ অভিনয়কে নিজেদের চিরাচরিত ভাবনাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে এইভাবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল।

আধুনিক যুগে এসে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৮৪৮), রচিত হওয়ার পর গোটা দুনিয়ায় ভাবনার জগতে বিস্ফোরণ ঘটে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব সমাজ শ্রেণিগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত অথবা বর্ণগত শোষণের শিকার হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মানবসমাজ যুদ্ধ, মানব সৃষ্ট সংকট অথবা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। মার্কস তাঁর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনাবলীর সামাজিক কারণগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কেবলমাত্র তাই নয়, নানা ধরনের সামাজিক ব্যাধিগুলির অবসানে বস্তুগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কার্ল মার্কসের অজস্র ভাবনা চিন্তার মধ্যে অন্যতম দুটি আবিষ্কার হল- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। পুঁজিবাদের অবসান ঘটাতে সর্বহারাশ্রেণি কোন পথে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করবে, তার দিক নির্দেশ করেছেন। আধুনিক যুগে যন্ত্র সভ্যতার বিকাশের ফলে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, তার মধ্যে মালিক এবং শ্রমিক দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর্থিক বিভাজনের এবং শোষণের সর্বোচ্চ পর্যায়, সেখানে পুঁজিপতিদের চূড়ান্ত বঞ্চনার স্বীকার হয় শ্রমিকশ্রেণি। সমগ্র পৃথিবীতে পুঁজিপতিদের শোষণ নিপীড়ন যত বেড়েছে, শোষিত মানুষদের লড়াই, সংগ্রাম করার প্রবণতাও ততই বেড়েছে।

আধুনিক যুগে শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভেই আধুনিক পথনাটকের বীজ রোপিত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, কোথাও সৈনিকদের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার জাগরণ ঘটাতে পথনাটক চেতনা দেওয়ার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার রূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একথা অনস্বীকার্য, সচেতনতা জাগত করার ক্ষেত্রে পথনাটককারের রাজনৈতিক সচেতনতা, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা থাকা প্রয়োজন। নাটককারের রাজনৈতিক স্বচ্ছতার অভাব, দোলাচল ভাবমূর্তি অনেক সময় আধুনিক পথনাটকের সংজ্ঞাকে শুধু বিভ্রান্তই করে না, একই সঙ্গে অস্বচ্ছতাও প্রকাশ পায়। এ কথা উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে সমস্ত ঘটনা প্রবাহের মধ্যে রাজনীতি থাকতে বাধ্য। সেই রাজনীতি কখনও পরোক্ষভাবে আবার কখনও বা প্রত্যক্ষভাবেও উঠে আসতে পারে। শিল্প-সাহিত্যের অভিমুখ কখনও শাসকের দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্দেশ করতে পারে আবার অনুরূপভাবে সেই অভিমুখই শোষিত মানুষের দিকে নির্দেশ করতে পারে।

আমাদের দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক বাংলা পথনাটকের আলোচনার পূর্বে প্রাচীন যুগ থেকেই আমাদের দেশে লোকজ উপাদান থেকে ছৌ নাচ, আলকাপ, গম্ভীরা, টুসু প্রভৃতি লোকনাট্যগুলি মন্দিরে, পথে, বাজারে, খোলা মাঠে অভিনীত হয়েছে। পরাধীন দেশে চারণ কবি মুকুন্দ

দাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাও আমরা জানি। মুকুন্দ দাসের পরাধীন দেশে এই স্বদেশ চেতনা জাগানোর কাজকে বিখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *'আমাদের মতো দরিদ্র, অশিক্ষিত দেশে মুকুন্দ দাস যাত্রাকে সর্বোপদেশের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন, এ (পথনাটক) তারই আধুনিক সংস্করণ।'*

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকাকালীন সময়ে বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সাংকেতিক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কলম ধরেছিলেন। তৎকালীন সময়ে ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে আমাদের দেশের প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরাও একত্রিত হয়েছিলেন। এই প্রতিবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যেই অন্যতম একজন হলেন দয়াল কুমার। যিনি তৎকালীন সময় হুগলী জেলার সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে দয়াল কুমার 'মুক্তির অভিযান' ও 'চিঠি' নামে দুটি পথনাটক রচনা করেন। যদিও এই নাটক দুটির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। 'মুক্তির অভিযান' নাটকটির নাম নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। বিভিন্ন নাট্যসমালোচকেরা এই নাটকটিকে 'মুক্তির অভিযান' বলে নামাঙ্কিত করলেও দয়াল কুমারের কন্যা মিতালী কুমারের মতে, এই নাটকটির নাম ছিল 'মুক্তির উপায়'। মিতালী কুমারের বক্তব্য- 'এই নাটকটি তার বাবা (দয়ালকুমার) জেলে বসে রচনা করেছিলেন'(সাক্ষাৎকার)। আধুনিক পথনাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত তার নিজস্ব ভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> *'যা কিনা খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে ও বিনা আড়ম্বরে অভিনয়। আর একটি হলো পথনাটকের বিষয়যা কোনো মতেই রাজনীতি বর্জিত নয়। পথনাটক বলতে আমরা যা বুঝি তার ইতিহাস এই পথেই এগিয়েছে।আধুনিক পথনাটকেরজন্ম বিংশ শতাব্দীতে, যখন দেশে বিদেশে এটিকে ব্যকবহার করা হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব।পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।'*

১৯৪৩ সালে ২৫ শে মে বোম্বাই-এ গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে একঝাঁক প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক একত্রিত হন। তারা দেশের সাধারণ অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হাতে কলম তুলে নেন। তাঁরা তাদের নিজেদের রচিত গান, নাটক, কবিতার মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমস্যামূলক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তাদের এই গণমুখী প্রচারে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল বাংলা পথনাটক। বাংলা পথনাটক রচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের দেশের নাটককারেরা বিদেশী নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা আধুনিক পথনাটকের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের উপর আন্তর্জাতিক প্রভাব পড়েছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আন্তর্জাতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা মৌলিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে যেমন প্রভাব পড়েছিল বিদেশী নাটকের, তেমন ভাবেই আমরা উল্লেখ করতে পারি বিদেশী রঙ্গালয়

আমাদের দেশে আধুনিক থিয়েটার গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালীন সময়ের আধুনিক বাঙালি যুবকদের মধ্যে বিদেশী শিক্ষার পাশাপাশি, বিদেশী প্রসেনিয়াম থিয়েটার, বাংলার নাটক, নাট্যশালা এবং নাট্য আন্দোলন ইত্যাদি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। আধুনিক বাংলা পথনাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বড় ভূমিকা পালন করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলায়, ভারতের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি জায়গায় গণনাট্য সংঘর বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। গণনাট্য সংঘের শিল্পী, সাহিত্যিকেরা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে দিয়ে সাধারণ জনগণের মনে আস্থা অর্জন করেন। সমকালীন চাহিদা এবং জনগণের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পথনাটককারেরা পথনাটক রচনা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, পাঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গাজিয়াবাদ সহ বিভিন্ন স্থানে গণনাট্য সংঘের শাখা গঠিত হয়। দেশ স্বাধীন ও খন্ডিত হওয়ার পর স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গণনাট্যের প্রচুর শাখা তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য রাজ্যে এবং শহরে গণনাট্যের কর্মীরা বাংলার দেখাদেখি পথনাটক লেখেন এবং অভিনয় করেন। পথনাটক উদ্ভব প্রসঙ্গে দয়াল কুমার বলেছেন —

> *'১৯৩৮ এডাল্ট এডুকেশন ব্রিগেড গড়ে শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব প্রসারের কাজে এগিয়ে গেল ছাত্র ফেডারেশন হুগলী জেলায়। এডগার স্নোর 'রেড স্টার ওভার চায়না'য় অল চায়না স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের গণনাটক (এখন আমরা যাকে পোস্টার ড্রামা বলি) কাহিনি পড়ে হুগলী ছাত্র ফেডারেশনের দাবি পূরণে আমি লিখলাম একটি ছোট নাটক 'মুক্তির অভিযান'। এডাল্ট এডুকেশন ব্রিগেড তাই নিয়ে গ্রামে গ্রামে অভিযান চালায়। সম্ভবত এই হলো আমাদের বাংলাদেশের প্রথম গণনাটক।'*

আধুনিক থিয়েটারের কার্যাবলী অনেক ক্ষেত্রে জীবন্ত মানুষকে নিয়ে। জীবন্ত মানুষ অভিনয় নিয়ে যাবেন জীবন্ত দর্শকদের কাছে। সেই ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজন নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের অবাধ সংযোগের কারণে পথনাটক অভিনয়ের স্থান হবে নমনীয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় যাতে অভিনয় করা যায়, তার জন্য এই পথনাটককে হতে হবে সুলভ, খুব কম খরচে যাতে অভিনয় সহজেই জনগণের সম্মুখে তুলে ধরা যায়। তবেই মানুষের কাছে পথনাটক পৌঁছে যাবে এবং দায়বদ্ধতার পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হবে। এখানে পথনাটক পথচলতি মানুষকে দর্শকে পরিণত করে।

আমাদের দেশে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যেই আধুনিক বাংলা পথনাটকের উদ্ভব ঘটেছে। এই পথনাটকগুলির মধ্যে যে রাজনীতি থাকে, তা হল শ্রমিকশ্রেণির রাজনীতি। শোষক ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামে উৎসাহ জোগাতে গণ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সব স্থানেই গণনাট্যকর্মীদের যেতে হত পথনাটক নিয়ে। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে পথনাটক নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা শুধুমাত্র শহরের রাজপথ, কারখানা গেটেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। এই নাট্যকর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে পথে-পথে পথনাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণকে জাগত ও চেতনা দেওয়ার কাজে সর্বদা নিয়োজিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত পথনাট্যকার জোছন দস্তিদার পথনাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> *'পথনাটিকার বিষয়বস্তু হবে খুব সহজ, সদ্যট ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা কিংবা অতীতের এমন কোনো ঘটনা শাসক গোষ্ঠী ঘটিয়েছে যা আজও সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে*

আছে, কিংবা আশঙ্কা করা হচ্ছে এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে, যা দেশের বৃহৎ অংশের মানুষের ক্ষতি করবে তার নাট্যারূপ।'

সমাজের অগণিত শোষিত, বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষ শুধুমাত্র কলকারখানার শ্রমিকই নয়, গ্রামে গঞ্জে কৃষক, দিনমজুরেরাও এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথনাটক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে শাসকের আধা ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পথনাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন সর্বপরি সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে একাধিক পথনাটককারেরা পথনাটক লিখেছেন এবং পথস্থ করেছেন। আমাদের দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। বিদেশী শাসকের পরিবর্তে দেশীয় বুর্জোয়ারা এবং ভূস্বামীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য দেশে বুর্জোয়ারা যে ভূমিকা পালন করে, আমাদের দেশেও বুর্জোয়া, ভূস্বামীরা সেই ভূমিকাই পালন করেছে। স্বাধীনতার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কেন্দ্রীয় সরকার কায়েমী স্বার্থের দালালি করেছে। এই প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক শান্তিময় গুহ বলেছেন—

'পথনাটিকা বা পোস্টার নাটিকা পরিচালিত হয় শ্রমিক শ্রেণির প্রয়োজন দ্বারা। সেইজন্য শ্রেণি সংঘর্ষ বা সংগ্রাম থেকে, প্রলেতারীয় রাজনীতির বাস্তব এবং প্রত্যক্ষক্রিয়াকলাপ থেকে, যে প্রলেতারীয় কর্তব্যসটি আশু এবং আবশ্যিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, পথনাটিকা বা পোস্টার নাটিকায় তার ইতিকর্তব্যস, বিশ্লেষণ এবং সমাধানও নির্দেশ থাকে।'

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত পথনাট্যকারদের হাত ধরে আধুনিক বাংলা পথনাটকের পথ চলা শুরু হয়েছিল, তারা হলেন- উমানাথ ভট্টাচার্য, পানু পাল, উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, দয়ালকুমার, সজল রায় চৌধুরী, বাসুদেব বসু, চিররঞ্জন দাস, শিব শর্মা, প্রবীর গুহ, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, হীরেন ভট্টাচার্য, বীরু মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সময়কালের পথনাট্যকারদের পথনাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - দেশ ভাগের কুফল, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সঙ্কট, কালোবাজারি, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, যুক্তফ্রন্ট গড়া ও ভাঙা, আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থা, নকশাল আন্দোলন, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, বেকার সমস্যা প্রভৃতি। বাংলা পথনাটকের উদ্ভব এবং তার বিকাশ সম্পর্কে সেই সময়কার নাট্যকার মন্মথ রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

'পথনাটিকা রাজনৈতিক দলের শাণিত হাতিয়ার। অতি সহজে, সরকারি সাধারণ মানুষের কাছে সমাজ সমস্যা মূলক বা রাজনৈতিক বক্তব্য পৌঁছে দেবার একটি মাধ্যম। প্রযোজনার ব্যরয় নেই বললেই চলে, পথের মধ্যেটই বা ছোটো চৌকির ওপর কুড়ি থেকে এক ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে এগুলি অভিনীত হয়।'

অনেক নাট্যসমালোচক মনে করেন জনগণের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন থেকে বিপ্লবী সাহিত্য কর্ম রচিত হতে পারে না। কারণ সমাজের আপামর অংশ যেখানে শোষিত এবং নিপীড়িত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সেখানে আপামর জনগণের চাহিদার দিকেই শিল্পী সাহিত্যিকদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা নাটক এবং নাট্যশালা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যেই কেবল আবদ্ধ ছিল। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও নাট্যশালা সীমাবদ্ধ ছিল। গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নাটক এবং অভিনয় দর্শকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে

দর্শক যায় থিয়েটারে নাটক দেখতে। অপরদিকে পথনাটক নিয়ে গণনাট্য সংঘের কর্মীরা যায় দর্শকদের কাছে। নাট্যকর্মীদের কোন রকম দায়বদ্ধতা এবং শ্রেণি সচেতনতা না থাকলে এই কাজ সম্ভব হত না। নাটক আপামর জনগণের কাছে যাবে এটা একটা সময়ে কল্পনাও করা যেত না, কারণ যেখানে নাটক বিদেশী থিয়েটার থেকে সৌখিন থিয়েটার এবং তারপর পেশাদারি থিয়েটারে আবদ্ধ থেকেছে প্রায় ১৮০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে। বিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা নাটক এবং নাট্যশালা শুধুমাত্র শহরে নয়- সারা দেশে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে গেল। বিষয়টি যত সহজে আমরা ভাবতে পারি, কাজটি তত সহজ ছিল না। গণনাট্যের কর্মীসকল এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মতাদর্শের প্রতি অবিচল আস্থার ফলেই এই কাজ সম্ভব হয়েছে। গণনাট্যের জন্মলগ্ন থেকে কর্মীদের শারীরিক ভাবে নির্যাতন এবং শাসকদলের চোখ রাঙানোকে উপেক্ষা করে এবং অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে গণনাট্য কর্মীরা নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে গণনাট্যকর্মীদের অভিনন্দন প্রাপ্য। নাট্যশহিদ সফদর হাশমি 'পথনাটক একটি পৃথক ঐতিহ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন—

> *'কোনো খোলা জায়গায় যে নাটক অভিনীত হয় তাই হলো পথনাটক - এই ব্যাপখ্যাহটি সম্পূর্ণ যুক্তি ও অর্থহীন। এ যেন নাটকের নায়কের মৃত্যু হলেই নাটককে বিয়োগান্তক বলে অভিহিত করা। পথনাটকের এই জাতীয় ব্যাকখা যে শুধুমাত্র নাট্যনবিদ ও সমালোচকদেরই বিব্রত করেছে তা নয়, সাধারণ মানুষও বিচলিত হয়ে পড়েছে। পথনাটক হল আধুনিক সমাজের অন্তদ্বর্ন ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।'*

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন নাট্যকার হলেন সফদর হাশমি। সারা ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের মুখ ছিলেন সফদর হাশমি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর পথনাটক আছে, কোথাও অনুবাদকৃতও রয়েছে। সফদর হাশমি শুধু নাট্যকারই নয়, তিনি অভিনেতাও ছিলেন। তাঁর পথনাটক অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলে কালো পোশাক পরে নাটকে অভিনয় করে। নতুন আঙ্গিকে পথনাটকে অভিনয় তাঁর হাত ধরেই এসেছে। সফদর হাশমি বাংলাতেও পথনাটক লিখেছিলেন। রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ, মার্কসীয় ভাবনায় অটল থেকে একাধিক পথনাটক তিনি লিখেছেন। আমরা জানি, এই জনপ্রিয় শিল্পী সফদর হাশমি তাঁর 'হল্লাবোল' নাটক অভিনয় করতে গিয়ে ১৯৮৯ সালের ১লা জানুয়ারি খুন হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের শাসকদলের গুন্ডাদের হাতে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একজন শিল্পী ও অভিনেতা প্রকাশ্য জনপথে দিবালোকে হত্যা করেছিল গুণ্ডারা। তার প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আমরা জানি তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার কথা। অপরদিকে উত্তর প্রদেশের সরকারও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বুঝতে পারি, এই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিল্পী, সাহিত্যিকদের প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞার কথা। শুধুমাত্র তাই নয়, সর্বপরি শাসক দল 'কংগ্রেস সরকার' গণ আন্দোলনকে ভয় পায়। তাদের ভাবনা এই বুঝি সংগঠিত হয়ে অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষজন তাদের ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়ে দেয়। অন্যদিকে বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব হাবিব তানবীর 'মঞ্চ আর পথের বন্ধন গড়ে উঠুক' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন —

> *'অনেকেই মনে করেন খোলামাঠে নাটক হলেই সেটা পথনাটক হয়ে গেল। সংস্কৃত*

নাটক, যা খোলা আকাশের নিচে অভিনীত হতো, কিম্বা কেরলে যা সব হয় সেগুলি কি পথনাটক? প্রাচীন ইউরোপের বহু নাটককেই তাহলে পথনাটক আখ্যা দিতে হয় কারণ সেগুলি বাঁধাধরা মঞ্চে অভিনীত হতো না। না, তা হতে পারে না। মনে রাখতে হবে 'পথনাটক' একটি আধুনিক শব্দ। আজকের দিনে আজকের রাজনৈতিক সমস্যারবলী নিয়ে, পথে ঘাটে, রাস্তায় মাঠে-ময়দানে যে নাটক অভিনীত হয় শুধুমাত্র সেগুলিই পথনাটক হিসাবে বিবেচিত হবে।'

আমাদের দেশে মন্দিরে বা রাস্তায় গাজনের সময় অথবা অনন্য সময়ে যেসব লোকনাট্য অভিনীত হত, সেগুলি সবই ছিল ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কখনওই শাসক অথবা রাজা কারোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় কিন্তু অভিনয় হয়নি। অপরদিকে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাও রাজানুকূল্যে। কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী রাজার বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কিছু করার সাহস পেত না বা পায়নি। সুতরাং ঐ সময়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য কোন শিল্পকর্ম রচিত হয়নি। এই জন্য ঐ নাটক আর আধুনিক পথনাটক এক হতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলায় সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা, যেমন চৈতন্যদেবের নগরকীর্তন, অথবা অন্য কোন লোকজ উপাদানকে নিয়ে তৈরি হওয়া অভিনয় লোকনাট্য হলেও আধুনিক পথনাটক নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে আমাদের রাজ্যে এবং সারাদেশে পথনাটক নিয়ে বিপুল চর্চা এবং নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। পথনাটকের অর্নবস্তুর পরম্পরা মান্য করেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পথনাটকের নান্দনিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমাগত নাট্যকাররা এবং অভিনেতারা চর্চা করে চলেছেন। জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি শৈল্পিক তৃষ্ণা মেটাতে পারে, তাঁর ভাবনাও শিল্পী সাহিত্যিকরা ক্রমাগত করে চলেছেন। আবার কেউ কেউ আঙ্গিকগত বৈভবের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পথনাটকে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় বিষয় ভাবনা অস্পষ্ট, জটিল, ধোঁয়াশাময়। অনেক সমালোচক পথনাটকের মূল ভাবনা থেকে সরে এসে বুঝতে পারছেন না অথবা বুঝতে চাইছেন না যে, এই পথনাটকের দর্শক কারা এবং কীসের জন্য পথনাটক অভিনয় করছেন? দর্শকদের মধ্যে শিল্পবোধ জাগানো নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকে না, আবার বিষয় ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে ও নাটক রচিত হয় না। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, পথনাটকের ঐতিহ্যের প্রতি আমরা অনুগত আছি?

কিছু নাট্য সমালোচক মনে করেন যা কিছু প্রাচীন তাই আমাদের ঐতিহ্য- এই বোধ এবং বুদ্ধি থেকেই মধ্যযুগীয় পথ অনুষ্ঠানের ধর্মীয় ভাবাবেগ, আমাদের চিরন্তন আদর্শ হবে এ কথা তাঁরা প্রচার করছেন। এই কথার মূল অর্থ বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করা। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে ভারতীয় বাণিজ্য মেলার কর্তারা পথনাটকের আয়োজন করেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, পশ্চাদপদতাই আমাদের সংস্কৃতি। সেখানে আমরা অভিনীত হতে দেখলাম 'সীতাহরণ', 'বালিবধ', 'প্রহ্লাদ' প্রভৃতি পুরাণের কল্পকাহিনি।

বামপন্থী নাট্যকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পথনাটককে প্রবলভাবে রাজনীতি সম্পৃক্ত রূপেই তুলে ধরতে চান। তাঁর মতে—

'সমাজ বদলের দৃপ্ত প্রত্যকয় নিয়ে পথনাটককে বিপ্লবী নাটক হতেই হবে, মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি আদ্যতন্ত আনুগত্য রাখতেই হবে এবং সফদরের মতোই শুধুমাত্র নাটক নয় বরং দেশ-বিশ্বের পুঁজিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে জীবনকে বাজি

রেখে সমস্ত গণসংগ্রামে রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শরিক হতে হবে- বিকল্প কোনো পথনাটক, পথনাটকের কর্মী হতে পারে না'।

অতীত ইতিহাসকে সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করলে আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে বিভ্রান্তির নানা দরজা খুলে যায়। ইতিহাসের নানা ছোট ছোট ছিদ্রপথই পথনাটকের মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে বিভিন্নভাবে কালিমালিপ্ত করে। আসল কথাটি হল মানব সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস ভালোভাবে অনুধাবন না করলে পথনাটকের মসৃণ চলমানতা বজায় রাখা যায় না। প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টি তৎকালীন সমাজের মানুষের বৈষয়িক অবস্থান ও সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। পথনাটক কী বলতে গিয়ে আধুনিক সময়ের অন্যতম নাট্যসমালোচক অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী 'থার্ডথিয়েটার ও পথনাটক' নিবন্ধে জানিয়েছেন—

'রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের জন্যচই এই পথনাটকের শুরু। শাসকপক্ষের দুর্বলতা, তার রাজনীতির দুর্বলতা, তাদের শোষণের রূপ ও স্বরূপজনতাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য পথনাটকের দল মানুষের কাছে গিয়ে হাজির হয়। বক্তৃতা দিয়ে যে কথা সবার কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় না, নাটকের মাধ্যমে তা অতি সহজেই হাজির করা যায়। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি এই পথনাটকেরও বিস্তার। এতেআমোদ আছে, প্রমোদ আছে, সস্তা মজা রংদার কথা আছেএসবই পথ চলতি দর্শককে আটকে রাখার জন্য। একবার মানুষকে দর্শক করে নিতে পারলে, তখন সেই জনতা-দর্শককে রাজনৈতিক ভাব ও ভাবনা অতি সহজেই তাদের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংযোগ গড়ে ওঠেভাবের আদান-প্রদান অতি মসৃণ ভাবে ঘটে যায়। এখানেই পথনাটকের সার্থকতা। মুক্তমঞ্চের নাটক পথনাটক হিসেবেই সার্থক হয়েছে বেশি।পথনাটক শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের নিজস্ব শিল্প-হাতিয়ার। প্রসেনিয়াম মঞ্চের বিকল্প হিসেবে এই ফর্মের সৃষ্টি হয়নি। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের নিজস্ব মঞ্চ, তাদের লড়াইয়ের মঞ্চ এই পথ নাটকের মঞ্চ।'

বিভিন্ন নাট্যসমাচকের আলোচনা থেকে বোঝা যায় আধুনিক পথনাটক হল সমাজের শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের নিজস্ব শিল্প হাতিয়ার। পথনাটক কখনওই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সমাজের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের নিজস্ব মঞ্চ, তাদের লড়াইয়ের মঞ্চ হল আধুনিক পথনাটক। রাজনৈতিক নাট্যশালার চর্চা আধুনিক থিয়েটারের গোড়াপত্তন থেকেই আছে। পৃথিবীর বিখ্যাত নাট্যকর্মীবৃন্দ এই কাজ করেছেন। যেমন- পিসকাটার, ব্রেখট, প্রগোদিন প্রমুখ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সরাসরি রাজনৈতিক বিষয়কে নিয়ে অথবা রাষ্ট্রসমাজের তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে পক্ষে বা বিপক্ষের বক্তব্য মানুষকে জানিয়েছেন নাটকের মধ্যে দিয়ে একাধিক নাটককারেরা। দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক ভাবনার প্রাণোন্মদনাই অভিনয়কে প্রসেনিয়ামের বাইরে নিয়ে এসেছে। শাসক শোষকের বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগত করে ঘৃণার সঞ্চার করা, তাদের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে দেওয়ার দায়বদ্ধতা থেকেই পথনাটকের পথ চলা শুরু।

আমাদের দেশে পথনাটিকা ও পোস্টার নাটক রচিত হয়েছে বিশ শতকে। নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেই সব নাটকে চিরায়ত শিল্প ভাবনার অভাব আছে। তার কারণ শিক্ষাগত নয়, প্রয়োজনগত শ্রেণিবিভক্ত

সমাজের সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট হয় প্রয়োজন দ্বারা। সেখানে জনগণের যৌথ ইচ্ছা যৌথ চাহিদার কোন মূল্য থাকে না, সেখানে দেখা যায়, শাসক ও শোষক শ্রেণির ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। গোটা সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় শাসক ও শোষক শ্রেণির প্রয়োজনের দ্বারা। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনগণের যৌথ ইচ্ছা এবং প্রয়োজন মতো জনগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা বুঝতে পারি যে উৎপাদনের হাতিয়ার, উৎপাদিত পণ্য, পণ্যের বন্টনের অধিকার সমস্ত কিছুই জনগণের হস্তে অর্পিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বন্টনের অভিমুখ থাকে জনগণের চাহিদার দিকে গুরুত্ব দিয়ে। অপরদিকে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অথবা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উৎপাদনের অভিমুখ থাকে মুনাফার দিকে। আমাদের এই বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে পথনাটক আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আজকাল অনেক সংগঠন পথনাটক বা পোস্টার নাটিকা অভিনয় করছেন। কোথাও মফঃস্বলে, গ্রামে গঞ্জে, পথে হাটে কখনও শহরে কখনও আবার কল কারখানার গেটের পাশে পথনাটক অভিনীত হয়। নাট্যশিল্পের এটা একটি ভালো দিক। অনেক ক্ষেত্রে পথনাটক অভিনয় সাফল্য পেলেও কিছু কিছু জায়গায় ব্যর্থও হচ্ছে। পথনাটকের প্রাণশক্তি হচ্ছে অভিনয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উচ্চমানের অভিনয়ের মধ্যে তা নিহিত রয়েছে পথনাটিকার সাফল্য ও ব্যর্থতা। এই কথা অবশ্য সব নাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পথনাটকের শক্তিশালী এই ভূমিকার কথা অনেকেরই জানা আছে। অনেক নাট্যদল এই শক্তিশালী ভূমিকার কথা স্বীকার করলেও ধারাবাহিক ভাবে পথনাটকের অনুশীলন করেন না। অনেক নাট্যকার এবং অভিনেতা পথনাটককে শিল্প হিসেবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধাগস্থ। আবার কখনও ভাবেন, শিল্প ও রাজনীতি এক হয়ে গেল বুঝি? প্রসেনিয়াম মঞ্চের দর্শকের সামনে যে গভীরতায় ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে নাটককে হাজির করা সম্ভব- পথনাটকে তা সম্ভব নয়। পথ চলতি হঠাৎ দর্শক বা কারখানার শ্রমিক বলেই তা সম্ভব নয়। সেখানে বাংলা থিয়েটার মধ্যবিত্তের প্রচেষ্টায় রাজার প্রাসাদ মঞ্চের বাইরে এসে জনসমর্থন লাভ করেছিল। প্রসেনিয়াম থিয়েটার হল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির থিয়েটার। বিংশ শতাব্দীতে এসে এই প্রসেনিয়াম মধ্যবিত্তের থিয়েটারের সীমানা ছাড়িয়ে জনগণের থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানেই পথনাটকের যথার্থ সার্থকতা। পথনাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শুধুমাত্র কলা কৌশল জানলেই চলবে না। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের দিকটিও আত্মস্থ করতে হবে। অভিনয় তার কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। গ্রাম-নগরের ব্যবধান পথনাটক খুব সহজেই দূর করতে পারে। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং সমাজের শোষিত শ্রেণির মধ্যে সমন্বয় সাধনও করতে পারে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী বুর্জোয়াদের কথা ছেড়ে দিলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য রয়েছে অনেক উপাদান। সমাজের আপামর শোষিত মানুষ এতকিছুর মধ্যে যেতে পারে না, থিয়েটারকে যেতে হবে সেই আপামর শোষিত মানুষের মধ্যে। সমাজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নাট্যকার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বুঝিয়ে দিতে হবে সমাজের শোষিতশ্রেণির মানুষকে যে কি কারণে তার শোষিত এবং বঞ্চিত। স্বল্প শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর মানুষকে থিয়েটারের মাধ্যমে অর্থনীতি, ইতিহাস, রাজনীতি বুঝিয়ে দিতে হবে, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন কেন? পথনাটক তাই শহর ছেড়ে গ্রামে, মঞ্চ ছেড়ে রাস্তায় মধ্যবিত্তের গন্ডী ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে চায়। আমাদের দেশে এক সময় যে দায়িত্ব পালন করত লেটোর দল, যাত্রার দল, ঝুমুরের দল প্রভৃতি। অবশ্য পথনাটকের ভঙ্গি এদের থেকে ভিন্ন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পথনাটকের অভিনয়ের জন্য মঞ্চ ভাড়া নেওয়া, মঞ্চ তৈরি করা, মঞ্চ সাজানো কোনটিরই প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রয়োজন হয় যে মৌলিক উপাদানটির, তা হল অভিনেতার শরীর। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার কণ্ঠস্বর। পথনাটকে বিজ্ঞাপনের খরচ নেই, পোস্টার ছাপানোর প্রয়োজন হয় না। খোলা প্রশস্ত অথবা সংকীর্ণ সব জায়গাতেই পথনাটকের অভিনয় চলে। আবার কলকারখানার গেটেও অভিনীত হয় পথনাটক। পথনাটকে একই আলোর বৃত্তে, একই ভূমিতে শিল্পী ও দর্শকেরা অবস্থান করে। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতো দর্শক অন্ধকারে আর অভিনেতা অভিনেত্রীরা আলোকিত মঞ্চের মধ্যে অবস্থান করে না। প্রসেনিয়ামের মায়াবিভ্রম (illusion) তৈরি করা হয়, তা আমরা পথনাটকে দেখতে পাই না। এক কথায় বলা যায় পথনাটক উপকরণ বর্জিত পথেই অভিনয় হয়। পথনাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের, দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে উঠে। দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে দূরত্ব কমে যায়। পথনাটকে দর্শক এবং অভিনেতারা একাত্ম হতে পারে। অভিনেতা এবং নাট্যকারদের সঙ্গে জনসাধারণের জনসংযোগ গড়ে উঠে। মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং জনগণের সঙ্গে নাট্যকারদের সঙ্গে মেলামেশা একপ্রকার জনভিত্তি তৈরি করে। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় জনগণের সঙ্গে নাট্যকারদের ভাব বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের অভাব-অভিযোগ গুলির সঙ্গে নাটককারেরা সমাজের বাস্তবাচিত্র সম্পর্কে অবগত হন।

বর্তমান দুনিয়া পুঁজিবাদের লাগামহীন আস্ফালনের ফলে মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিপতি গোষ্ঠীর দাপাদাপি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে সর্বত্র। যার ফলে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং যন্ত্রসভ্যতার আকাশচুম্বী হাতছানির মধ্যে দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্ন রাখার যে প্রবণতা তা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। আমাদের বিজ্ঞান যেমন দূরকে আপন করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞানের নব্য আবিষ্কারগুলি। মানুষকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই আটকে রাখার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে মানব সভ্যতার যে অগ্রগতির ইতিহাস আমরা জানি, তা এখন অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস চলছে। পুঁজিবাদ তার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে সঙ্গে নিয়ে ভোগবাদে গোটা সমাজকে আচ্ছন্ন রাখার কাজ করে চলেছে। আমরা জানি মানুষ সমাজবদ্ধ শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে যত বেশি বেশি বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে, মানুষ তত বেশি সংগঠন বা আন্দোলন, লড়াই বিমুখ হবে। একুশ শতকের প্রাথমিক পর্বে দাঁড়িয়ে তাই আমাদের মনে হয়, মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে এবং জীবনবোধকে জাগত করতে এই পথনাটকের কথা বেশি বেশি করে মনে করা প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার বাড়লেও তার প্রয়োগের ব্যর্থতার জন্য ধনবৈষম্য বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। অপরদিকে ভোগপণ্যের প্রতি মানুষের চাহিদাও সীমাহীন ভাবে বাড়ছে প্রতিনিয়ত। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকারদের ভূমিকাও বাড়াতে হবে সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে। বর্তমান সময়ে কোন কিছুই নির্দিষ্ট সীমানায় আটকে থাকতে পারে না। আজ আমেরিকা অথবা রাশিয়ায় যে ঘটনা ঘটে তা পরমুহূর্তে গোটা দুনিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা পৃথিবী মূলত দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। আমেরিকার পক্ষে একটি অংশ, অন্যটি হল অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক অংশ। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। কোন দেশের উপর অন্যায়ভাবে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগাসন থাবা বসাতে পারে নি, কারণ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ভয়ে। ১৯৯০ সালের পর গোটা দুনিয়ার চিত্র বদলে যায় সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলির সাময়িক পতনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজিবাদের ধারক বাহকেরা উল্লাসিত হয়। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুনরায় বর্তমান বিশ্বে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যার ফলে পৃথিবী একমুখী বিশ্বে রূপান্তরিত হয়। এই সময় আমরা লক্ষ্য করি গোটা দুনিয়াতেই সমাজতান্ত্রিক আর্দশে যারা আত্মনিমগ্ন ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরে যায়। কেউ আবার দ্বিধা দ্বন্দ্বে গোল গোল কথাবার্তা বলা শুরু করে। আবার অনেকে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে যায়।

আমরা জানি, বিশ্ব দুনিয়ার সব চলমান ঘটনায় সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখানেও যে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ এবং নাট্যকারদেরও উপর তার প্রভাব পড়েছিল। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও যখন দেখি ধনবৈষম্য, জাতি বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য প্রবল হচ্ছে, তখন বেশি বেশি করে নাটককারেদের দায়বদ্ধতার কথা মনে পড়ে। পথনাটকের সার্থকতা শুধুমাত্র পথে নেমেই নয়, পথের অগণিত শোষিত মানুষের ভাবনার সঙ্গে একাত্মীকরণে। জনগণের চিত্ত জাগরণেই পথনাটকের পথচলা। পথনাটক অভিনয়ের সার্থকতা এর চেয়ে বড়ো আর কী হতে পারে!

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-৩

পথনাট্যকার : পানু পাল

মানুষের স্মৃতির বিস্মরণ হলেও ইতিহাসকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারিনা। কারণ আমাদের স্মৃতির প্রদীপের সলতেকে সর্বদা উস্কে দিতে সাহায্য করে ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই তখন আমাদের স্মৃতি আলোকিত হয় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এরকমই এক বিস্মৃত নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন পানু পাল। যাঁর ভালো নাম পূর্নেন্দু কুমার পাল। বাংলা নাটকের জগতে তিনি পানু পাল নামেই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। পানু পাল ১৯১৯ সালের ২রা জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার গাইবান্ধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হেমন্ত কুমার পাল এবং মাতা প্রিয়বালা দেবী। পারিবারিক সূত্রে তিনি এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পানু পালের পিতা হেমন্ত কুমার পাল একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি নিয়মিত নাট্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (AISF) তৈরি হলে, ১৯৩৮ সালে পানু পাল নিজেকে ওই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি মার্কসবাদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। অবিভক্ত ভারতের কোচবিহার এবং রংপুর জেলার ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন পানু পাল। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি, এবং নিষিদ্ধাবস্থাতে পানু পাল জীবনের সমস্ত সুখ, ভোগকে বিসর্জন দিয়ে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই পানু পাল নাটকের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর নাটকের প্রতি এই আগহ কিছুটা বংশগতও বলা যায়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন উঁচু দরের অভিনেতা। নাটকের পাশাপাশি হেমন্ত কুমার পাল সঙ্গীত চর্চাও করতেন। তবে এসবই চলতো পানু পালের ঠাকুরদার চক্ষুর অন্তরালে। কারণ তাঁর ঠাকুরদাদা ছিলেন গোঁড়া রক্ষনশীল মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই তিনি নাচ, গান বা নাটককে 'বেশ্যা পল্লীর ব্যা পার' বলে মনে করতেন। ঠাকুরদাদার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর পিতার সঙ্গীতচর্চা বা নাট্যাচর্চা কিন্তু থেমে থাকেনি। পরবর্তীকালে যে স্বাভাবিকভাবেই পানু পাল পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হতে পেরেছিলেন, এ কথা বলার অবকাশ রাখে না। পানু পাল নিজের সম্পর্কে ফৌজিয়া সিরাজের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> *'নাটকের প্রতি আগ্রহ কিন্তু বংশগত। বাবা শখের অভিনয় করতেন। ছেলেবেলায় বাবাকে কর্ণার্জুন নাটকে কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হই।'*

তাঁর পিতার অভিনয় তাকে শুধু মুগ্ধ করত তাই নয়, চেতনার জাগরণ ঘটাতেও সাহায্য করেছে। পিতার অভিনয়কৃত নাটক দেখেই পানু পাল 'তরুণ নাটকের দল' নামে একটি নাট্য সংগঠন তৈরি করেছিলেন। পানু পাল ১৯৪০ সালে

রংপুর জেলার কারমাইকেল কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক হন। স্কুলে পড়ার সময়ই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে পিতার সঙ্গে মতবিরোধ শুরু হয়। বিদেশী দ্রব্য বয়কট কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে নিজের জামা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় পানু পালের মধ্যেও সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের প্রতি সর্বদা আত্মিক টান খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি স্কুলজীবন থেকেই কৃষকদের আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তবে তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনুধাবন করেছিলেন, শুধুমাত্র কৃষক আন্দোলন করে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই কৃষক আন্দোলনকে গণমুখী করতে গেলে, তার সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির যোগসাধন ঘটাতে হবে। নাচ-গান-নাটকের মধ্যে দিয়ে সাধারণ বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরতে হবে। পানু পাল প্রথম জীবনে মূলত নৃত্যের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বিশ শতকের চারের দশক থেকেই বাংলার রংপুর জেলার কিষাণসভার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কৃষকদের ঘরে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। অবসর সময়ে পানু পাল কৃষকদের সঙ্গে নাটক-গান-নাচ করতেন। তৎতকালীন সময়ে কমরেড বিনয় রায়ের গণসঙ্গীত তাঁর চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। পানু পাল নিজেও এইরকম কিছু করার প্রতি আগহী হন। তারপর 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য'কে 'মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্যেই' পরিমার্জিত করেন। আমরা জানি, ছেলেবেলা থেকেই তিনি নাচের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সৃষ্টি করলেন 'ক্ষুধা ও মৃত্যু' নামে নৃত্যনাট্য। সেই সময় সমগ্রবিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলছে। সারা পৃথিবীতে একদিকে ফ্যাসীবাদী শক্তির তান্ডব, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন। মানুষ ভীত ও আতঙ্কগস্থ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং পরবর্তীকালে মহামারী, মন্বন্তর, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, রক্তারক্তি, হানাহানি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। কেননা তখন আমাদের দেশে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে ব্রিটিশ রাজশক্তি, যারা সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতের মাটিতে কালোবাজারি, মুনাফালোভী, ধনী মহাজন সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সকল খাদ্যদ্রব্য, নিজেদের গুদামে মজুত করতে লাগলেন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় দেখা যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যদিও এই দুর্ভিক্ষ সব অংশে প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ নয়, সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক ধনী মহাজন, মুনাফালোভী সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। শোনা যায় এই দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় ৩৫ লক্ষ-এর বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন না খেতে পেয়ে। ১৯৪৩ সালের এই দুর্ভিক্ষ বাংলার ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত হয়ে আছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাহাকার, যন্ত্রণা পানু পালকে গভীরভাবে আহত করে। তিনি এই প্রেক্ষাপটেই রচনা করেন 'হাঙ্গার অ্যান্ড ডেথ' বা 'ক্ষুধা ও মৃত্যু' নামে নৃত্যনাট্যটি। এই নৃত্যনাট্যসম্পর্কে সমালোচক প্রদীপকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—

> *'চল্লিশের দশকের শুরুতে.... ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ আয়োজিত শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বিশাল সম্মেলনে পানু পাল আমন্ত্রিত হন। ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয় কালোবাজারি আর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর অসামান্য নৃত্যনাট্য 'হাঙ্গার অ্যান্ড ডেথ' ('ক্ষুধা ও মৃত্যু') এই অনুষ্ঠান যা চতুর্দিকে আলোড়ন তুলেছিল। শুধু এ রাজ্যেই নয়, বাংলার বাইরেও এটি প্রচুর সুনাম অর্জন করে। 'জনযুদ্ধ'য় তখন তাঁর সংবাদ পায় নিয়মিত প্রকাশ পেত।'*

সারা ভারতের ন্যায় রংপুর জেলাতেও 'মহাবুভুক্ষা' নামে যে নৃত্যনাট্যটি সরোজবাবু দেখেছিলেন, সেই খবরটি 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানু পালের সঙ্গে পরিচিত হন। রংপুর থেকে ফেরার পরেই কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনের কাছ থেকে তাঁর কাছে টেলিগ্রাম আসে 'Send Panu Pal Imideetly' বলে। সেই টেলিগ্রামে খবর আসে বিজওয়ারা কৃষক সম্মেলনে যাওয়ার জন্য। ১৯৪১ সালে পানু পাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তারপর থেকেই তিনি তাঁর পুরো সময় ব্যয় করেছেন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজে। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনে বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবীশের মতো পানু পালও বেঙ্গল স্কোয়ার্ডের হয়ে অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন। 'হাঙ্গার অ্যান্ড ডেথ', 'জবানবন্দী' নাটকের রূপান্তর, নাচের ট্যারবলো জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। পানু পাল এই 'হাঙ্গার অ্যান্ড ডেথ' নৃত্যনাট্য দেখে সরোজিনী নাইডু কান্না করেছিলেন বলে শোনা যায়।

১৯৪৩ সালে মানব সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ বাংলার সমগ্র আকাশ বাতাস দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের কালে ব্যথিত হয়েছিল। পানু পাল নিদারুণ সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে নাটক এবং নাচ পরিবেশন করেন। পানু পালকে দেখে শিল্পী জ্যোদতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রর 'নবজীবনের গান'-এ 'ফ্যান দাও প্রাণ দাও নবজীবনের সমীরণ চোখে মুখে ছড়াও' এই বাণী বাংলার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই গণনাট্য সংঘের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই সংগঠনকে ধরে রাখতে হবে এবং এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে, এই সংকল্প গ্রহণ করে আই.পি.টি.এ সদস্যরা। তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বলা যায় এখান থেকেই গণনাট্য সংঘের বীজ রোপিত হয়েছিল। শোনা যায়, শিল্পীদের নিয়ে ১৫ দিনের একটি শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। পানু পাল এই শিক্ষা শিবিরের সম্পাদক ছিলেন। এই শিক্ষা শিবিরের অন্যান্য দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন - সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, বিনয় রায় ও জ্যোলতিরিন্দ্র মৈত্র। এই শিক্ষা শিবিরে বিখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নাটকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা ও নির্দেশ দেন।

১৯৪৩ সালের ২৫ শে মে বোম্বাইয়ের একটি হাইস্কুলে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণনাট্য সংঘের জন্মলগ্ন থেকেই পানু পাল তার সদস্যপদ লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই পানু পাল যে আন্দোলনকে শুধু সংস্কৃতিমুখী নয়, জনমুখীও করতে চেয়েছিলেন, তার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে এই গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে। পানু পাল গণনাট্যে সংঘে যোগদান করার ফলে একাধিক নাট্যকার, শিল্পী-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তারপর বিভিন্ন জেলায় এবং বিভিন্ন প্রদেশে সভা সমিতিতে যোগদান করেন। সারা রাজ্য এবং দেশ জুড়ে তাঁর নাচ ও নাটক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কমরেড ভবানী সেন পানু পালকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করার নির্দেশ দেন। আর এই নির্দেশকে পানু পালও যথোপযুক্ত বলে মনে করেন। কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ভালোবাসা। তিনি 'বেঙ্গল স্কোয়াড' নামে একটি সাংস্কৃতিক দল গঠন করেন। এই দলটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত, ক্ষুধার্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য সংগঠিত হয়েছিল। পানু পাল এই সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দলের সমস্ত কর্মীদের নিয়ে বোম্বাই যান দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে। সেখান থেকে অর্থ সংগহ করে বাংলার ক্ষুধার্ত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধপ্রদেশ, কেরল, কর্নাটক প্রভৃতি প্রদেশের শিক্ষার্থী, শিল্পীদের

নিয়ে গঠিত হয় শিক্ষন শিবির। যা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গণনাট্য সংঘের শাখা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। আর এই আটটি প্রদেশের শিল্পী, শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত দলটি সর্বভারতীয় দলের রূপ পায়। তার পরবর্তী সময়ে এইসব দলগুলি সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শুধুমাত্র বাংলাতেই গণনাট্যে সংঘ সীমাবদ্ধ থাকেনি। গণনাট্য সংঘের প্রভাবে বোম্বাইতেও শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার জাগরণ ঘটেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পেশাদারি রঙ্গালয়ের বাইরে বাংলাদেশে তখন চলছিল 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়। কলকাতার পেশাদারি রঙ্গালয়ে 'নবান্ন' নাটকটিকে অভিনয় করতে দেওয়া হয়নি। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাট্য জগতে শুধুমাত্র নয়, সমগ্র বাংলার গণআন্দোলনে প্রবল ঝড় বয়ে যায়। তৃপ্তি ভাদুড়ী, শোভা সেন, চারু প্রকাশ ঘোষ, সুধী প্রধান প্রমুখ একদল নবীন শিল্পী শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অভিনয় জগতের ভবিষ্যৎ এর দিক নির্দেশ করেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদার এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সময় বাংলা পেশাদারি রঙ্গালয়ের অবস্থাও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিশির কুমার ভাদুড়ী এবং মহেন্দ্রলাল গুপ্ত সহ অনেকেই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নাটক অভিনয় করতে পারেননি। কারণ একদিকে অহিংস নীতি থেকে সরে এসে কংগ্রেসে সহিংস আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, আবার অন্যদিকে বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যা, কমিউনিস্টদের উত্থান এই প্রেক্ষাপটে চিরায়ত পৌরাণিক নাটক এবং ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিজেদের আবদ্ধ রাখেননি। সময়ের চাহিদাকে মাথায় রেখে যুগপযোগী শিক্ষা-সাহিত্য ও নাটক রচনায় এবং অভিনয়ে তরুণ শিল্পীরা এগিয়ে আসেন। শ্রীরঙ্গমে গণনাট্যের 'নবান্ন' এর অভিনয় দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রশংসা করেন। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় শেষে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও গণনাট্য সংঘের সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায়—

> *'শিশির বাবু অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেতা মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এরা কি আজই হঠাৎ এমন অভিনয় করল?'মহর্ষি হেসে জবাব দিয়েছিলেন। 'না, এরা রোজই এমন অভিনয় করে। আপনি বলেছিলেন নতুন প্রতিভা দেখতে পাচ্ছেন না, এবারে দেখুন।'*

গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলার নব্য শিল্পী, সাহিত্যিক সকলে মিলে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে যান। নব্যশিল্পীদের মধ্য সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রবল পরিমাণে নাড়া দিয়েছিল। যে সাহিত্য-শিল্পকলা শুধুমাত্র আনন্দদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সাহিত্য ও শিল্পকলাই নতুন শিল্পীদের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে আনন্দদানের মধ্যে দিয়ে দায়বদ্ধতা, শ্রেণি সচেতনতা এবং সমাজের নানান কিছুর মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটতে লাগলো। পূর্বতন অগ্রজরা নবীন গণনাট্য সংঘের এই প্রয়াস দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। মন্মথ রায় তাঁর লেখা 'কারাগার' নাটকটিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যায়, কংস হল ব্রিটিশ প্রতিনিধি এবং যাদবরা হলেন কংগ্রেস, যারা কিনা প্রতিনিয়ত লড়াই সংগ্রাম করছে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। নাট্যকারের এই ভাবনা তৎকালীন সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকার 'কারাগার' নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

গণনাট্যের সাফল্য তৎকালীন সময়ে রক্ষনশীলদের এবং ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত হানে। তৎকালীন সময়ে

গণনাট্য সংঘের অভিনয়ের জন্য থিয়েটার হল পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে তুলসী লাহিড়ী রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা জনজীবনের কাহিনি 'দুখীর ইমান' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। গণনাট্যে র এই প্রসারতা এবং ব্যাপকতা যে বাধাহীন ভাবে চলবে, তা কখনওই কাম্য নয়। কারণ সমাজের কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদতে নানারকম বাধাবিঘ্ন মোকাবিলা করার জন্য চায়কর্মীদের সাহসী, সংগ্রামী মনোভাব। তৎকালীন সময়ে গণনাট্যব সংঘের অন্যম সংগঠক সুধী প্রধানের নির্দেশে 'ক্ষুধা ও মৃত্যু' নৃত্যবনাট্যা দেখাতে পানু পাল উপস্থিত হয়েছিলেন ঢাকাতে। শোনা যায় পানু পালের পূর্বেই শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে 'জবানবন্দী' নাটকটির দল ঢাকায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঢাকায় অভিনয়কালে অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই ঢিল পড়া শুরু হয়। আবার কিছু লোককে লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বেই ঢাকায় তরুণ কমিউনিস্ট সাহিত্যিক সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। নাট্যেকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। গণনাট্যহ সংঘের কর্মীরা সেদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল অনুষ্ঠান করার জন্য। পানু পালের নৃত্য নাট্যা দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। যারা লাঠি হাতে মারতে উদ্যাত ছিল, তাদের হাত থেকে আপনা আপনি লাঠি পড়ে যায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সকলে অভিনয় দেখতে থাকে। 'জবানবন্দী' নাটকও অভিনীত হয়। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, ললিতা বিশ্বাস প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ে ঢাকার আকাশ বাতাস নব উদ্যরমে আলোড়িত হয়েছিল। প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঢাকা সহ তার চতুর্দিকে। গণনাট্যরর কর্মীদের প্রথম দিকে নাচের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা থাকলেও দুর্ভিক্ষ লাঞ্ছিতা মেয়ের ভূমিকায় তৃপ্তি ভাদুড়ীর প্রাণঢালা আবেদন অগণিত দর্শকের হৃদয় জয় করেছিল। প্রথমদিকে অভিনেত্রী তৃপ্তি ভাদুড়ী নিজের কাছে অসঙ্কোচ থাকলেও অনুষ্ঠান শেষে গণনাট্যককর্মীদের আত্মজয়ের যে গৌরব, তা তিনি অনুভব করেছিলেন।

নাট্যকার পানু পাল একদিকে নৃত্যশিল্পী, নাট্যকার, কৃষক সংগঠনের কর্মী, অপরদিকে গণনাট্যর সংঘের একজন সংগঠক। নাট্যকার পানু পাল রংপুর, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কৃষক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যোতা বজায় ছিল আজীবন কাল ধরে। কৃষক আন্দোলনের ডাকেই তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নৃত্যযনাট্যয় পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ পেতেন। নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পানু পাল গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। জেলায় জেলায় নৃত্যযনাট্যি অনুষ্ঠান করার সুবাদেই তাঁর সঙ্গে শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচয় ঘটে। পানু পাল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বঙ্কিম সেন, কবি রমেশ শীল, নারান পণ্ডিত প্রমুখ গণনাট্যে র সদস্যনবৃন্দ গণসঙ্গীতের ভাণ্ডার এবং নৃত্যঠনাট্যই নিয়ে রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি জায়গায় অনুষ্ঠান করে বেড়াতেন।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। এই সময় তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রের শাসকদল ছিল জাতীয় কংগ্রেস। ব্রিটিশ মনোনীত কংগ্রেস সরকার ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল ছিল। এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কথা বলার জন্য নাট্যকার পানু পাল লিখলেন 'ভোটের ভেট' (১৯৫২) পথনাটকটি। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৪৮ সাল থেকেই পানু পাল নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তার পূর্বে নৃতনাট্যো, ছাত্র সংগঠন এবং কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিবেশ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে পানু পাল 'দখল' নামক একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। তারপরে পানু পাল ১৯৫০ সালে পূর্নাঙ্গ নাটক 'ভাঙাবন্দর' লিখেছিলেন। নৃত্যেনাট্য, নাটক বাদেও চলচ্চিত্র এবং যাত্রার জগতে পানু পালের অবাধ যাতায়াত ছিল। সতম্বর অপেরার হয়ে পানু পাল

'মাতঙ্গিনী হাজরা' যাত্রার পরিচালনা করেছিলেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'নাগরিক' এবং রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ' সিনেমায় পানু পাল অভিনয় করেন।

ভোটের ভেট :

নাট্যকার পানু পাল শিল্পী ও শিল্পের দায়বদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেই তিনি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। একজন শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকলে শিল্পকর্ম কখনওই জনগণের মনে রেখাপাত করতে পারে না। সেইজন্য একজন শিল্পীর সর্বপ্রথম সমাজ, দেশ, রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত বলে মনে করতেন নাট্যকার তথা শিল্পী পানু পাল। পানু পাল কখনওই এইসব ভাবনার বাইরে গিয়ে কোন শিল্প রচনা করেননি। স্বাভাবিকভাবেই এই ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়েই শিল্পকর্ম রচনা করেছেন। সমাজের আপামর শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কথা ভেবে নাটকের মধ্যে তুলে ধরলেন 'কংগ্রেসী নেতাদের' বিশ্বাস ভাঙার কাহিনি। গত পাঁচ বছর (১৯৪৭-৫২) তৎকালীন সরকার ভারতের জনগণের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। উৎপল দত্ত পানু পালের 'ভোটের ভোটে' নাটকটি পড়ে প্রবল উৎসাহ বোধ করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটকেরও এই নাটকটি ভালো লেগেছিল। নাটকটি অভিনয় করার জন্য তৎকালীন সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নিরঞ্জন সেন অনুমতি দিয়েছিলেন। মনুমেন্টের ময়দানে ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বড়ো জমায়েত হয়েছিল। এই নির্বাচনী জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মুজফর আহমেদ। কমরেড মুজাফর আহমেদ পানু পালকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এই নির্বাচনী সমাবেশে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর আসতে একটু দেরী হওয়াতে 'ভোটের ভেট' নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয় করেন মমতাজ আহমেদ, উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক ও পানু পাল। প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাট্যকার পানু পালের 'ভোটের ভেট' নাটকটি চারটি চরিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই নাটকটি কংগ্রেসী নেতা ও তার সাগরেদদের সঙ্গে এক বয়স্ক চাষী ও তার চার ছেলের কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে প্রবঞ্চনার নিদারুণ মর্মস্পর্শী কাহিনিকে রঙ্গ-ব্যাঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন 'ভোটের ভেট' নাটকে। নাটকটির নাট্যরগুণ নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যেতে পারে। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে এই পথনাটকটির প্রয়োজনীয়তার কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি।

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তেমন উল্লেখযোগ্য শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। আবার তার গণসংগঠনগুলিও ভালো করে সংগঠিত হয়নি। অপরদিকে অনেকেই গণনাট্য সংঘ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই সময় পথনাট্যকার পানু পাল 'ভোটের ভেট' এবং 'ভাঙ্গা বন্দর' নাটক দুটি গণআন্দোলনের জ্বলন্ত দলিল হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। পানু পাল এবং তাঁর সহযোগী নাট্যহকর্মীরা উপলব্ধি করেছিলেন নিরক্ষর কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সামনে নির্বাচনের সময় বক্তৃতা দেওয়ার তুলনায়, নাটক এবং গান দিয়ে অনেক সহজে বোঝানো সম্ভব। আমরা জানি নির্বাচনের একটি বড় অংশ হল প্রচার। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় গণনাট্যের অন্যম কর্মীবৃন্দরাও বিভিন্ন প্রকার গণসঙ্গীত, নাটক, নৃত্য সমস্ত কিছু নিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বন্দিমুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় উমানাথ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'চার্জশিট' নাটকটি। পানু পাল 'চার্জশিট' নাটকেও অভিনয় করেছিলেন। নাট্যকার পানু পাল বুঝেছিলেন পথনাটকের মাধ্যমে খুব সহজেই সাধারণ মানুষের সামনে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। পানু পালের লেখা 'ভোটের ভেট' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শোভা সেন লিখেছেন—

'এদিকে পানু পাল লিখে ফেললো 'ভোটের ভেট'পথনাটিকা। তার প্রয়োজন উৎপলকে। কিন্তু উৎপল ইতিমধ্যে গণনাট্য সংঘের মিথ্যে চার্জে সংঘ থেকে বিতাড়িত। তবুও পানু নাছোড়বান্দা। সে নাটকের স্বার্থে আবার উৎপলকে নিয়ে এলো। এবং এই পথনাটিকার তাৎপর্য তখন থেকে পার্টি বুঝতে শুরু করেছে। তার শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা নেতারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এখান থেকেই।'

'ভোটের ভেট' নাটকটিতে সমকালীন দেশের শাসকদলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাশাপাশি, প্রবীণ কৃষক এবং তার সন্তান, অপরদিকে 'কংগ্রেসী নেতা এবং সাগরেদদের' কাহিনি নিয়ে বর্ণিত হয়েছে। কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি হয়ে নটবর এবং বংশীর আগমন ঘটে বৃদ্ধ চাষীর বাড়িতে। অপরদিকে প্রবীণ কৃষক এবং যুবক দুজনেই এই নাটকে আছে। নাট্যকার নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে লিখলেও গ্রাম জীবনে যে সংকট তা কিন্তু নাট্যঘকার তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন নাটকটিতে। অপরদিকে নাটকে দেখা যায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেস সরকার জনগণের সংকট মোচনের জন্য আমুল সমাজ ব্যেবস্থার কোন পরিবর্তন করেননি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস দেশ পরিচালনা করেছে। আমরা দেখতে পাই জোতদার-জমিদার, বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শোষিত-নিপীড়িত মানুষদের জন্য কোনরকম সাহায্যে র পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করেননি। যার ফলে স্বাধীনতার পূর্বে মানুষের যে আশা-প্রত্যাপশা ছিল স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে, তার মোহভঙ্গ হতে বেশিদিন সময় লাগেনি। আমরা দেখতে পাই স্বাধীন দেশের সরকার কায়েমী স্বার্থের দালালি করেছে।

কত ধানে কত চাল :

আমাদের দেশে দ্বিতীয় সাধারণ (১৯৫৭) নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হয়। নতুন 'কংগ্রেস সরকারের' অপরিকল্পিত নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে যে গণআন্দোলন হয়, তা পরবর্তীতে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। সেই সময় খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিয়েছিল। খাদ্যের দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সমস্ত গণসংগঠন যেমন — শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব এবং মহিলা সকলে খাদ্য সংকটের প্রেক্ষিতে গণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কলকাতার রাজপথ প্রতিদিন কেঁপে উঠত মিছিলে মিছিলে। আমাদের স্মরণে আছে খাদ্যের দাবিতে (BPSF) ছাত্র সংগঠন বিশাল মিছিল সংগঠিত করে। সরকারের পুলিশ ছাত্রদের এই মিছিলের উপর গুলি চালিয়েছিল। শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছিল। এই আন্দোলনে একজন ছাত্র মারাও গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই সময়ের খাদ্য সংকট এবং আন্দোলনের প্রচার হিসাবে নাট্যকার পানু পালের 'কত ধানে কত চাল' পথনাটকটি রচিত হয়। শুধুমাত্র শহরেই নয় গ্রাম-গ্রামান্তরেও শিল্পীরা এই নাটকটির অভিনয় করেন। ভারতীয় গণনাট্যব সংঘের একজন অন্যমতম সংগঠক হিসাবে পানু পাল জনগণের মধ্যে প্রচারের অন্যথতম হাতিয়ার হিসাবে এই পথনাটকটিকে তুলে ধরেন। সম্ভবত এই পথনাটকে অভিনয় করেছিলেন - ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আহমেদ, পানু পাল প্রমুখ। খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই পথনাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

খাদ্যের দাবিতে ও অনান্য কারণে পশ্চিমবঙ্গের মাটি বিভিন্ন সময়ে গণআন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে। যেমন-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে ইউ.সি.আর.সি এবং কমিউনিস্ট পার্টি জোতদার-জমিদারদের শোষণের

বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছে এই পশ্চিমবঙ্গে। কখনও আবার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, বর্গাদার আন্দোলন, কেরোসিনের দাবিতে আন্দোলন, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার বিরুদ্ধে আন্দোলন এই বাংলায় বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হয়েছে। উপরোক্ত এই সমস্ত আন্দোলনে রাজ্যেনর 'বামপন্থী দল' এবং তাদের ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক সমিতি জোরদার গণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। খাদ্য আন্দোলনকে সামনে রেখে নাট্যতকার পানু পাল 'কত ধানে কত চাল' পথনাটকে রাজ্যল সরকারের নীরব ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। রাজ্যের খাদ্যে সঙ্কটকালে সরকারের উদাসীনতা ও পরিকল্পনাহীনতার কথা নাট্যসকার সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পথনাটকের মধ্যে। বিভিন্ন আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে শাসকদল আন্দোলনকারীদের উপর দমন-পীড়ন নীতি প্রয়োগ করেছে। খাদ্য আন্দোলনের কথা আসতেই আমাদের মনে পড়ে যায়, শহীদ নরুল ইসলামের কথা। বসিরহাট সন্নিকটে তেঁতুলিয়া গ্রামের সন্তান হাইস্কুলের ছাত্র নরুল ইসলাম কলকাতার রাজপথে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করতে এসে শাসকদলের পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে তার নিথর দেহ গ্রামের পথে ফিরে যায়। এই ঘটনার পরের দিন রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। যা পরবর্তীতে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যোপক গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়। রাস্তাঘাট, শহর, গ্রামাঞ্চলে, স্কুল, কলেজ সর্বত্রই বিক্ষোভ, সমাবেশ, মিছিল সংগঠিত হয়। সারা রাজ্যেটর মানুষ ধিক্কার জানিয়েছিল সরকারের এই জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।

নাট্যককার পানু পাল তৎকালীন সময়ে খাদ্য সঙ্কট নিয়ে রাজ্যা ও মন্ত্রীসভার যে উদাসীনতা, শুধু তাই নয় আন্দোলনকারীদের উপর যে দমন-পীড়ন ও অত্যাচার, তা উল্লেখ করেছেন। খাদ্য সংকট চলাকালীন সময়ে রাজ্যে মন্ত্রীদের বিলাস, ব্যসন ও বৈভবের কোন ঘাটতি ঘটেনি। অথচ সাধারণ মানুষ তীব্র খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে। নাট্যকার এই পথ নাটকের মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী সভার সদস্যদের আমোদ-প্রমোদে গা ভাসানোর চিত্র তুলে ধরেছেন—

> *'**প্রধান :** তোমাদের গিন্নি আছেন, ধন্যে তোমরা। কিন্তু তাদের মন্ত্রীপত্নীর উপযুক্ত করা উচিত ছিল।*
>
> ***মৎস্য মন্ত্রী :** আজ্ঞে উপযুক্ত একটু হয়েছে বইকি। এখানে ওখানে বিয়ের আসরেদ, প্রাইভেট পার্টীতে প্রায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে ও উপহার পাচ্ছে। তবে কি জানেনএখানে যেমন আমাদের ওই নচ্ছার লোকগুলো এসে ঘিরে ধরেছে তেমন যদিওদের বউগুলো গিয়ে আমাদের বাড়ীগুলোও ঘিরে ধরে তবে বউ কি আর বউ থাকবে! ভিমরী খাবেসিটকে লেগে আম কাঠ হয়ে যাবে।*
>
> ***প্রধানমন্ত্রী :** যাও যাও চেঁচিও না। নিজেদের উপস্থিত বিপদ। এখন তোমাদের বউ নিয়ে ভাববার অত সময় আমার নেই। [ভেতরে খাদ্য সংক্রান্ত স্লোগান প্রধানমন্ত্রী বিচলিত হয়ে সংকেত ঘন্টা বাজালেন। ছুটে ভেতরে উপমন্ত্রী এসে দাঁড়াল।'*

তৎকালীন সময়ে রাজ্য বাসীর খাদ্যরসঙ্কটকে কেন্দ্র করে এবং খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পানু পাল তাঁর 'কত ধানে কত চাল' পথনাটকে গণআন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন। খাদ্যাাভাবে ক্ষুধার্ত, অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ একসময়

রাজ্যেথর নেতা, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে সামিল হয়। এই পথনাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন, যেখানে একজন খাদ্যনমন্ত্রী মাত্র একবেলা খেতে না পেলেই শরীরে গ্যাপস হয়ে যায়। খাদ্যয়মন্ত্রীর কথায়-- 'আমার যে আবার রাতে না খেলে পেটে গ্যারস-'। অথচ সাধারণ বুভুক্ষু মানুষ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত না খেয়ে পেটের যন্ত্রণায় ডুকরে ডুকরে কেঁদে ফিরছে, কোথাও অসহায় শিশু একফোঁটা দুধের জন্য হাহাকার করছে, আবার কোথাও বা একমুঠো ভাতের জন্য সাধারণ মানুষ হন্যেট হয়ে ফিরছে। নাট্যকার সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি নাটকের মধ্যে সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে গণআন্দোলনে মুখরিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। নাট্যকার গণ আন্দোলনের ছবি যেমন তুলে ধরেছেন, অপরদিকে শাসকদলের মন্ত্রীদের অকর্মণ্যতাও চোখে আঙুল দিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। সেদিনের সংবাদপত্রের ভূমিকাও সঠিক অর্থে গণআন্দোলনের ছবি প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছে। শাসকদলের ভয়ে সংবাদ মাধ্যগুলি অন্য বিষয়ে খবর প্রকাশ করলেও গ্রাম বাংলার খাদ্য সংকটের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে ব্যির্থ হয়েছে। খাদ্যআন্দোলনের সঙ্গেই শ্রমিকদের বোনাসের দাবি এবং শাসকদলের মন্ত্রীদের বিভিন্ন কেলেঙ্কারিসহ প্রভৃতি যে সমস্যাণগুলি সেই সময় মাথাচাড়া দিয়েছিল, সেই সম্পর্কে সরকার বাহাদুর কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি।

ওরা আর আসবে না :

নাট্যকার পানু পালের অপর একটি পথনাটক হল- 'ওরা আর আসবে না'। এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যককার সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, শিক্ষক, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সব ধরনের চরিত্র তুলে ধরেছেন। এই পথনাটকের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয় ধরনের চরিত্রই পরিলক্ষিত করা যায়। নাট্যকার নাটকের মধ্যে দিয়ে ছয়ের দশকের জনগণের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে গণআন্দোলন, রাজনৈতিক দলের অভ্যকন্তরে মতাদর্শগত বিরোধ, রাজনৈতিক দলের ভাঙন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, কংগ্রেস(ই) এর সঙ্গে সি.পি.আই-এর জোটবদ্ধ হওয়া, চীন-ভারত যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমস্ত কিছুই উল্লেখ করেছেন। এই সময়কালে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা যেমন ছিল, তেমনই রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে বিভিন্ন দলের ভাঙন ও নতুন দলের সৃষ্টি হওয়া- সমস্ত কিছুর প্রতিফলনই নাট্যকার পানু পাল বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন।

'ওরা আর আসবে না' পথনাটকটি শুরু হয়েছে একজন মুসলিম কৃষকের সন্তান হারানোর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে রহমতের সন্তান এবং নিতাই। বিষ্ণু এবং কেষ্টর সংলাপের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস ও সি.পি.আই জোটবদ্ধ হয়েছে, তার উল্লেখও নাট্যকার করেছেন—

*'**বিষ্ণু :** থাম। আমি দুদিনের মধ্যে দেখতে চাই ওদের দেওয়াল গুলো মুছে নিজেদের স্লোগান লিখেছ।*

***কেষ্ট :** অসম্ভব দাদা - এবার কংগ্রেস আর সি পি আই এক হয়ে গেছে — পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শান্তি শপথ জানাতেই কেন জানিনা বোকা লোকদের বেশ কিছু ওদের মদত দিতে শুরু করেছে।*

***বিষ্ণু :** তা দিক, ধৈর্যহারা না হয়ে- 'দালাল, দালাল' করে প্রচার করতে থাক।*

কেষ্ট : করছি,- খুব সুবিধা হচ্ছে না।

বিষ্ণু : কেন? 'দালাল' বলেই তো গতবার ওদের কাত করেছিলাম।'

এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ের নির্বাচনে শাসকদল যে রিগিং করার মধ্যে নির্বাচনে জিতে এসেছে, তা উল্লেখ করতেও নাট্যকার ভোলেন নি। সাধারণ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে বিরোধী দলের এজেন্টদের তাড়িয়ে দিয়ে ভোট সংগহ করে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে বলে নাট্যকার জানিয়েছেন। এই ছাপ্পাভোট, রিগিং, ভয় দেখানো আজও শাসকদল করে চলেছে নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য। এছাড়াও নাট্যকার এই পথনাটকে অনুদানের টাকা চুরির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। 'ওরা আর আসবে না' পথনাটকে পানু পাল বাংলাদেশে স্বাধীনতার লড়াই-এ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সদর্থক ভূমিকা পালনের কথা তুলে ধরেছেন। পথনাটকের মধ্যে দিয়ে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল, বিপ্লবী সংগঠন, অতিবিপ্লবী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ভাঙা, কারখানা বন্ধ করা, কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, চীন-ভারত যুদ্ধ প্রভৃতি ছয়ের এবং সাতের দশকের নানা ঘটনাবলী জনগণের সম্মুখে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

দূর হটো :

বিশ শতকের নয়ের দশকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (৩১.১০.১৯৮৪) দেহরক্ষীর হাতে খুন হন। কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় তখন কংগ্রেস(ই) সরকার আসীন ছিল। ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস(ই) দল পুনরায় ক্ষমতায় আসেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। রাজীব গান্ধীর পাঁচ বছরের শাসন ক্ষমতায় নানা ধরনের দুর্নীতি, বেকারত্ব, নয়া শিক্ষানীতি, সাম্প্রদায়িক উস্কানি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যকার পানু পাল ১৯৮৮ সালে 'দূর হটো' পথনাটকটি রচনা করেন। ১৯৮৯ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নাট্যকার পানু পাল 'দূর হটো' পথনাটকটি লিখেছিলেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজ্য এবং দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে নাট্যরকার সফল হয়েছিলেন। কারণ ১৯৮৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস(ই) দল পরাস্ত হয়। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ (ভি.পি.সিং) প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। জনতা দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় ১৯৮৯ সালে, বাইরে থেকে এই সরকারকে বামপন্থীরা সমর্থন জানায়। এই সরকার বেশিদিন স্থায়ীত্ব লাভ করেনি। এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই, কংগ্রেস সরকারের একাধিক মন্ত্রী নিজেরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মন্ত্রীসভা থেকে ত্যাগ করেন।

'দূর হটো' পথনাটকের মধ্যে দেখা যায়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা লোভের আশায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করাকে কেন্দ্র করেও প্রধানমন্ত্রী দালালি খেয়েছে- এই অভিযোগও সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জনমানসে প্রবলভাবে অসন্তোষ, ক্ষোভ তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গে এসে কেন্দ্রীয় শাসকদল বেকার যুবকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় শাসকদল রাজ্যেবাসীর কাছে আবেদন জানায়, তাদের ভোট দিলে কলকারখানা খুলে যাবে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, কলকারখানা খোলার পরিবর্তে আরও কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় শাসকদলের মিথ্যা আস্ফালনে তাদের দলীয়কর্মীরাও অসন্তুষ্ট। তাদের মনের মধ্যে ও একাধিক প্রশ্ন জমা হয়েছে, যার উত্তর কেন্দ্রীয় শাসকদলের কাছে ছিল না।

এই নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, নন্টে এবং প্রিয়, জনগণের কাছে ভোট চাইতে গিয়ে 'জহর রোজগার যোজনার কথা', 'পঞ্চায়েত আর নগরপালিকা' বিলের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কোথাও হিন্দু এলাকায় রামশীলা স্থাপনের কথা বলেছেন, আবার কখনও সংখ্যালঘুদের মন জয় করার জন্য বাবরি মসজিদ, রাম জন্মভূমির মন্দিরের তালা খুলে দেওয়ার কথা বলেছেন- সমস্ত কিছুই ভোটে জয়ী হয়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করার জন্য কেন্দ্রীয় শাসক দল করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শোষণ, দালালি, দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বলেছেন তিনি নিজে সৎ কিন্তু অন্য রা অসৎ, এই কথা বোঝানোর জন্য জনগণকে বোঝানো হয় যে, সরকারি কাজে একশো টাকা বরাদ্দ হলে ত্রিশ টাকা জনগণের জন্য খরচ হয় বলে মন্তব্য করেন। নাট্যকার পানু পাল 'দূর হটো' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসকদলের অন্তর্দন্দ্ব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা দেখতে পাই কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অনেকেই দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত। অনেকে আবার কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায় একক সিদ্ধান্তেই দেশ পরিচালনা করেছেন। আমাদের রাজ্যেও কংগ্রেসদলের মধ্যে মতবিরোধ চরমে পৌঁছেছে। সরকার এবং দলকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। কেন্দ্রের শাসকদল এই রাজ্যে এসে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার কারখানা খোলার মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচন আসলেই কেন্দ্রীয় শাসকদল একাধিক মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা ডেকে আনেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গিয়ে নানা ধরনের আঞ্চলিকতাবাদকে মদত দিয়েছেন।

বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নানা নাট্য সমালোচক পানু পাল এবং তাঁর পথনাটক নিয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ শতকের শেষ প্রান্তে বিজ্ঞানের সীমাহীন আবিষ্কার বিনোদন মাধ্যমকে গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করেছে। নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে শিল্পকর্মকে। শুধুমাত্র পথনাটক নয়, অন্য শিল্পমাধ্যম গুলিকেও। ভোগবাদীদের সীমাহীন আস্ফালন সমাজকে শুধুমাত্র বিভ্রান্তই করে না, বিপথেও পরিচালিত করে। নানা ধরনের বৈদ্যুতিক মাধ্যম মানুষকে যেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তেমনিভাবে ঘরের মধ্যে সিরিয়ালে বন্দী করে রাখে। দুনিয়ার ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে এই প্রজন্ম অবগত নয়। এই প্রজন্মের মধ্যে নানা ধরনের অপসংস্কৃতি, সংস্কৃতি এবং বিনোদনের নাম করে পরিচালনা করা হচ্ছে। আমারা নিজেরাই বুঝতে পারছি না, যে দিনের পর দিন কীভাবে নগ্ন থেকে নগ্নতর হচ্ছে অপসংস্কৃতি। এই রকম সময়েই পথনাট্যকার এবং তাঁর শিল্পকর্ম অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। পানু পাল মনে করতেন শিল্পীরা হবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে কখনও বৃহৎ শিল্প গড়া যায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্প ও শিল্পীর কদর বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শিল্পীর ক্ষমতা বা দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করতে হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন ছাড়া সম্ভব নয়। এই কাজ শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যকবস্থায় সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। পানু পাল আজীবন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তুলতে শিল্প-সাহিত্য রচনা করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বার্তা দেওয়ার কাজে পানু পাল অগ্রণী হিসেবে আমাদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-৪

পথনাট্যকার : উৎপল দত্ত

'দেশের মার্কসবাদী রাজনীতির সমাসন্ন আপৎকালে বড়ো বেশি করে মনে পড়ে উৎপল দত্ত এবং তাঁর নাট্যকর্মকে।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ উৎপল দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। উৎপল দত্ত স্কুল এবং কলেজ জীবন থেকেই নাটক লেখা এবং অভিনয়ের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় থেকে ইংরেজি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন। শোনা যায়, তিনি স্কুল জীবনেই শেকসপিয়র রচনাবলী পড়ে ফেলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই শৈশবকাল থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ওই কলেজেই ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পড়তে থাকেন।অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় উৎপল দত্তের পূর্বপুরুষরা বসবাস করতেন। অবশ্য উৎপল দত্তের জন্মস্থান নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় তাদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল। উৎপল দত্ত নিজে জানিয়েছেন তাঁর জন্ম শিলং-এ মামার বাড়িতে। তাঁর পিতামহ ছিলেন দ্বিজদাস দত্ত। পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত। মাতা শৈলবালা দত্ত। পাঁচ ভাই, তিন বোনের মধ্যে উৎপল দত্ত ছিলেন চতুর্থ সন্তান। তাঁর পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল উৎপল রঞ্জন দত্ত। উৎপল দত্তের ডাক নাম ছিল শংকর। পরবর্তী সময়ে উৎপল দত্ত নামই তিনি ব্যবহার করেন।

উৎপল দত্তের পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত কলেজের ইংরেজি অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে সরকারের জেলরের চাকরি গ্রহণ করেন। সেই সুবাদে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে হয়েছে তাদের। স্বাভাবিকভাবেই উৎপল দত্তকে পড়াশোনা করতে হয়েছে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ শুরু হয় মামার বাড়ি শিলং-এ। ১৯৩৫ সালে শিলং-এর সেন্ট এডমন্ড স্কুলে তিনি প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর পিতা স্থানান্তরিত হয়ে বহরমপুরে চলে আসেন। উৎপল দত্ত বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে উৎপল দত্ত তার আর এক ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে কলকাতা সেন্ট লরেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই প্রথম দশ বছরের বালক উৎপল দত্ত কলকাতায় চলে এলেন। এই সময় উৎপল দত্ত কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকার অভিজাত পল্লীতে থাকতেন। ১৯৪৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে অর্নাস নিয়ে বি.এ পাশ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের দেশের উপর নানারকম মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে যায়। সারা পৃথিবী নানা সংকটের মধ্যে পড়লে আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমাদের দেশে যুদ্ধ হয়নি ঠিকই, কিন্তু আমাদের

দেশের বিদেশী শাসক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই কলোনী দেশ হিসাবে ভারতেও তার প্রভাব পড়েছিল। দেশজুড়ে ব্ল্যাবকআউটের মহড়া চলছে, সাইরেন বাজছে মাথার উপরে প্রতিনিয়ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব আমাদের দেশের উপর পড়েছিল। এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা যায় বাংলাদেশে। ইতিহাসের পাতায় তা উল্লিখিত আছে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে। এই সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাদের প্রযোজনাগুলির মধ্যে দিয়ে জীবনের কথা বলা শুরু করেছে। যেখানে প্রত্যযক্ষ রাজনীতি ছিল না, পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের অপশাসন এবং দেশীয় কালোবাজারি কারবারিদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার কাজ সম্ভব হচ্ছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটক বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলা নাটকের নতুনত্বের স্বাদ দর্শক ও আপামর মানুষ ভোগ করতে লাগল। ইতিপূর্বে যে দর্শকরা চিরায়ত নাট্যাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের অনেকেই নতুন ও ভিন্ন ভাবনা চিন্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দর্শকদের ভাবনার জগতে এই পরিবর্তন পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটক এবং নাট্যশালার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

কলেজ জীবন থেকেই উৎপল দত্ত শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় এবং শেকসপীয়র সম্পর্কিত নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। শেকসপীয়রের পাশাপাশি উৎপল দত্ত মার্কসবাদের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের রচনাবলী পড়তে থাকেন। এই সময় থেকে উৎপল দত্ত তাঁর ভাবনার জগতে রাজনৈতিক নাটকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ে ফাদার উইভারের নির্দেশনায় শেকসপিয়রের নাট্যচর্চাই সবচেয়ে বেশি হত। ১৯৪৩ সালে ফাদার উইভারের পরিচালনায় শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে দ্বিতীয় কবর খননকারীর চরিত্রে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত। নাটক পড়া এবং অভিনয় করার মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্ত শেকসপিয়রের নাটক সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ফাদার উইভারের নেতৃত্বে উৎপল দত্ত আরও দুটি নাটকের অভিনয় করেছিলেন। নিকোলাই গোগোলের 'ডায়মন্ডকাটস ডায়মন্ড' (১৯৪৭), মলিয়েরের 'দ্য রোগউইয়েরিস অফ স্কাপিন' এই দুটি নাটকই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অভিনীত হয়েছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকেই উৎপল দত্তের নাট্যস অভিনয়ের সঙ্গে যথার্থভাবে যোগাযোগ ঘটে। কলেজ জীবনে উৎপল দত্ত বন্ধুদের কাছে উল্লেখ করেছেন, আমি থিয়েটারের লোক হিসাবেই থিয়েটারে থাকব। ১৯৪৭ সালে জুন মাসে উৎপল দত্ত, বন্ধু প্রতাপ রায়, নীলিমেশ রঞ্জন দত্ত, রজার লেসার, ফ্লোরেথ যোশেফ, জেফ্রি আইজ্যাতক, এথেম মিনি এবং একজন মহিলা অ্যান ক্যাতলেন্ডার প্রমুখরা মিলে 'দ্য আমেচার শেকসপীয়িরিয়ানস' নামে নাট্যদল তৈরি করেন। এই নাট্যদলের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন উৎপল দত্ত।

নাট্যকার উৎপল দত্তের জীবনে মোড় ঘোরানোর পিছনে জেফ্রি কেণ্ডালই অনেক অংশে ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। কেণ্ডালের তীক্ষ্ম দৃষ্টি আসল রত্ন চিনতে ভুল করেননি। ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলের পরিচালক কেণ্ডালের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণে উৎপল কালক্রমে আন্তর্জাতিক মানের পেশাদার অভিনেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কেণ্ডালরা দেশে ফিরে যান। তারপর উৎপল দত্তের জীবনের একটি অধ্যায় সমাপ্তি ঘটে। আবার ১৯৫৩-৫৪ সালে কেণ্ডাল তার নাট্যদল নিয়ে ভারত সফরে আসেন। সেখানেও কেণ্ডালের সঙ্গে উৎপল দত্ত ভ্রাম্যমাণ নাট্যলের শরীক হয়েছিলেন। ১৯৪৮-১৯৫৩ এই পাঁচ বছরে উৎপল দত্ত নিজেকে ক্ষমতাবান নাট্যযক্তিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। অপরদিকে উৎপল দত্ত ১৯৪৩ সালে 'লিটল থিয়েটার' গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন।

আবার উল্লেখ্য উৎপল দত্ত ১৯৫১ সালে গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। বেশ কিছুদিন গণনাট্য সংগঠনে কাজ করেন। সমালোচক অরূপ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> *'জেফ্রি কেণ্ডালের নাট্য দলের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ উৎপল পরবর্তী জীবনে হয়ে ওঠেন 'দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা'। কিন্তু থিয়েটারের কারিগর হবার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাঁর মেধা ও মননের অন্যম সূতিকাগার ছিল এই বিদেশী নাট্যাসম্প্রদায়ের আলয়। তিনি লিখে গেছেন কেণ্ডালরা ছিলেন সঠিক অর্থে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী।'*

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয় এবং বিভক্ত হয়। দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান উভয় স্থানেই নতুন করে সংকট তৈরি হয়। সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার পরপরই পশ্চিমবঙ্গের নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়। ১৯৪৯ সালে শরণার্থীদের আন্দোলন সমগ্র দেশব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে ১৯৪৯ সালে সারা দেশে রেল ধর্মঘট দেশের স্বাধীন সরকারের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে। ১৯৪৯ সালে জুলাই মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় সভা করতে এলে, সেই সভাতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় উৎপল দত্ত কলেজ ম্যাগাজিনে একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। এই একাঙ্ক নাটকটির ইংরেজিতে নাম ছিল 'বেটি বেলসাজার'। পনেরো পাতার ঝরঝরে ইংরেজি ভাষার লেখা স্যা টায়ারধর্মী এই নাটকটির বিষয় ছিল 'একজন বিদেশী ডিক্টেটরের ব্যঙ্গচিত্র'। নাট্যকার উৎপল দত্ত বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানিয়েছেন, তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক 'রিচার্ড দি থার্ড'। এটি অভিনীত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর। এছাড়াও উৎপল দত্ত আংশিকভাবে যে নাটকগুলির ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন, তা হল- 'ম্যাকবেথ' ও 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'। অবশ্য 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' উৎপল দত্ত পরিচালনা করেছিলেন ১৯৪৯ সালে ৬ই মার্চ। তাঁর পরিচালনায় 'ওথেলো' (১৯৪৮ সালে ৪ঠা জুলাই), 'জুলিয়াস সিজার' (১৯৪৯ সালের ১৫ই জুলাই) অভিনীত হয়। অনেক সময় নিজের পরিচালিত নাটক নিজেই সমালোচনা করেছেন, আবার নিজেই প্রশংসা করেছেন। নাট্যকার-অভিনেতা উৎপল দত্ত 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের যেমন সমালোচনা করেছেন, অপরদিকে তেমন 'ওথেলো'র প্রশংসাও করেছেন।

১৯৪৯ সাল স্বাধীন ভারতে বিশেষ করে, দ্বিধা বিভক্ত বাংলার পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৯ সালে ভারতের মিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। একদিকে তেভাগা আন্দোলনের ভয়াল স্মৃতি, অপরদিকে ১৯৪৯ সালে দেশব্যাপী গণআন্দোলন- সব কিছু মিলেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মানচিত্রে দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই উত্তপ্ত পরিবেশে নাট্যকার উৎপল দত্ত মৌন থাকতে পারেননি। জীবনের প্রথম মৌলিক নাটক রচনায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় নাট্যকার উৎপল দত্তের মধ্যে। যতদূর জানা যায় সত্যজিৎ রায় 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের কাহিনি লিখেছিলেন উৎপল দত্তকে সামনে রেখে। সত্যজিৎ রায়ের কথায়, উৎপল দত্তের মতো আন্তর্জাতিক মানের অভিনেতা ভারতে 'আর দ্বিতীয় জন নেই'। সত্যজিৎ রায় উৎপল দত্ত সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা চিররঞ্জন দাস 'পোস্টার নাটক ও উৎপল দত্ত' নিবন্ধের মাধ্যমে জানিয়েছেন—

> *'সপ্রশংস উচ্ছাসিত হয়েছিলেন, সাহিত্যে -শিল্পে দর্শনে-ইতিহাসে-মানব জীবনজ্ঞানে এমন প্রজ্ঞাবান সচেতন অভিনেতা আর কোথায়? কথাচ্ছলে রবি ঘোষ-কে বলেছিলেন,*

ওঁকে (উৎপল দত্ত) 'মনমোহন' চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন ওঁর মত এমন চমৎকার ইংরেজি, জার্মান, লাতিন, ফ্রেঞ্চ নিখুঁত উচ্চারণ আর কোন অভিনেতা করতে পারে?'

নাট্যকার উৎপল দত্ত বলতেন, শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে না, অভিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকভাবে কাজে লাগাতে হবে সজ্জিত পাদ-প্রদীপের মায়াজাল থেকে একেবারে সাধারণ নিম্নস্তরে নেমে। যান্ত্রিক অথবা কৃত্রিমভাবে নাট্যাশালায় অধীশ্বর হওয়া যায়, কিন্তু উজ্জীবিত করা যায় সেই মানুষের অঙ্গনে নেমে গিয়ে। নাট্যকার উৎপল দত্ত বলতেন মঞ্চের যাবতীয় চমক এবং রাজকীয় বৈভব ছেড়ে থিয়েটার চতুর্থ দেওয়ালকে শুধু নয় সমস্ত দেওয়ালকেই অতিক্রান্ত করে নাটককে নিয়ে যেতে হবে মাঠে ঘাটে আপামর মানুষের মধ্যে। মানুষের এই দায়বদ্ধতা, গভীর অনুশীলন, রাজনৈতিকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধ্যা ধারণা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। এই জনগণের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ব্যতীত শ্রমজীবী মানুষের কাহিনি নাটকে তুলে ধরা সম্ভব নয়, এই ভাবনা সারাজীবন বহন করেছিলেন উৎপল দত্ত।

নাটক হল এক প্রকার প্রচার মাধ্যম— সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার এই নাটকের মধ্যেই পথনাটক প্রচার মাধ্যম হিসাবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে- সে কথাও স্বীকৃত। আমরা জানি, মহামতি লেনিন বলেছিলেন- 'দু'রকমের প্রচার আমাদের করতে হবে- প্রোপোগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন'। প্রোপোগান্ডা হল - একটা সমাজ ব্যাবস্থা সম্পর্কে মানুষকে মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দেয়, মানুষের অনাস্থা জাগিয়ে তোলে এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে। সেটা অনেক গভীরে কাজ করে। এই হল প্রোপোগান্ডা। আর অ্যাজিটেশন হচ্ছে একটা তাৎক্ষণিক ইস্যুর ওপরে মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তোলা। পথনাটিকা হচ্ছে এই অ্যাজিটেশনের অংশ। যার জন্য গোড়ার দিকে গণনাট্যসংঘ এটাকে পোস্টার প্লে অথবা অ্যাজিট পোস্টার প্লে বলেছে। অ্যাজিট পোস্টার হল রুশ শব্দ, যা থেকে এসেছে অ্যাজিটেশন। পথনাটকগুলির মধ্যে দিয়ে সামাজিক শোষণ এবং রাজনৈতিক শাসনের চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। আমরা গণশক্তি পত্রিকা থেকে জানতে পারি, উৎপল দত্ত বলেছেন—

'পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।'

নাট্যকার উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে পথনাটকে অভিনয় শুরু করেন। গণনাট্যে সংঘে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে এবং পথনাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী থিয়েটারের উপাদান আহরণ করেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত মনে করতেন, যে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্যের তুলনায় পথনাটকের অভিনয়ে অনেক বেশি জনগণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সময়ে নাট্যকারকে একদিনে তিন-চার জায়গারও বেশি অভিনয় করতে হয়েছে। উৎপল দত্ত মনে করতেন, 'চরিত্র বিশ্লেষণ-টিশ্লেষণ করবার জায়গা পথনাটিকা নয়। এটা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জায়গা।' পানু পালের লেখা 'ভোটের ভেট' নাটকে অভিনয়ে অংশগহণের মাধ্যমে উৎপল দত্ত পথনাটিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। গণনাট্য সংঘের হয়েই প্রথম তিনি এই পথনাটকটি অভিনয় করেন। এই সময় থেকেই উৎপল দত্ত পথনাটক পরিচালনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। এরপর থেকে তিনি একাধিক পথনাটক রচনা শুরু করেন। শুধুমাত্র রচনাই নয়, সফলভাবে অভিনয়ও করেন।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই উৎপল দত্তের পথনাটক রচনার পথ পরিক্রমা শুরু হয়। ১৯৫১ — ১৯৫২ সালে 'পাশপোর্ট' নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্তের পথনাটক রচনার হাতে খড়ি হয়। নাট্যকার

উৎপল দত্তই প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে মার্কসীয় ভাবনা দ্বারা বিশ্লেষণ করতে থাকেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই উৎপল দত্ত প্রকৃত এবং উৎকৃষ্ট পথনাটক রচনা করেছিলেন। এই বিষয়ে উৎপল দত্তের মতবাদও পরিষ্কার। এই সম্পর্কে নাট্য সমালোচক অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী তাঁর 'থিয়েটারওয়ালা' উৎপল দত্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> *'মানুষকে শিল্পের মাধ্যমে আনন্দ দাও, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত করো। উদ্বুদ্ধ করো। পথে নেমে নাটকাভিনয় পথের মানুষকে যে বাঁচার পথ দেখাতে পারে, উৎপল দত্ত সেই পথের দিশারী।'*

পথনাটকই মানুষের কাছে গিয়ে হাজির হয় তাদের অভিনয়ের পসরা নিয়ে। পথনাটকের ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের সবথেকে ভালো লাগার বিষয় ছিল- পথনাটকে কোন মঞ্চ নেই, আলোক সজ্জা বা মেকআপের বাহুল্য বর্জিত, যেখানে দর্শক মিলতে পারে, সেখানেই অভিনেতারা পথনাটক নিয়ে উপস্থিত হন। যেমন- চৌরাস্তার মোড়ে, কারখানার গেটে, পার্কে, হাটে-বাজারে, ময়দানে এবং গ্রামের প্রশস্ত আঙিনায় পথনাটকগুলি অভিনীত হয়। সেখানকার পথচলতি জনতাকেই দর্শকরূপে পরিগণিত করা হয়। তাদের সামনে স্টেজ, মেকআপ, আলো ব্যতীতই নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে যায়। সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন, যন্ত্রনার কথা দর্শকদের সামনে খুব সাবলীলভাবে উপস্থিত করেন অভিনেতারা। নাট্যকার উৎপল দত্ত নিজেই পথনাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> *'পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে।'*

আমরা জানি, নাটক, থিয়েটার কখনও বিপ্লব করে না। পৃথিবীর ইতিহাসে বিপ্লব করে জনগণ। তাদের চেতনার বিকাশ ঘটায় নাটক এবং থিয়েটার। দর্শকদের মনে অথবা জনগণের মনে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে এবং তার শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মনে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যে ক্ষোভ সঞ্চিত থাকে পথনাটক সেই ক্ষোভগুলিকে শাসকের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। পথনাটক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলিকে একমুখীন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। নাট্যকার মনে করতেন পথনাটককারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। পথচলতি জনসাধারণকে দর্শকে রূপান্তরিত করে, সেই দর্শককে নাটকের মাধ্যমে ভাবিয়ে তোলার কাজ পথনাটককারদের।

আমাদের দেশে বহুরূপীর দল বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, বাড়ির উঠোনে, বেলতলায় ধর্মীয় নানা কাহিনি জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য অভিনয় করে দেখাত। আজকের আধুনিক পথনাটক এবং ধর্মীয়কথন এক জিনিস নয়। আজকের যুগে যারা ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে ব্যংবসা করে, তাদের বিরুদ্ধে পথনাটক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পথনাটক মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে পথে পথে অভিনয় করে চলে। নাট্যকার উৎপল দত্তের এই রাজনীতি ছিল মার্কসবাদের রাজনীতি। সামাজিক শোষণ এবং রাজনৈতিক অত্যাতচারের বিরুদ্ধে জাগত জনগণের সমবেত প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি পথনাটকের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার অভিনেতা উৎপল দত্ত লিখিত, নির্দেশিত এবং অভিনীত পথনাটিকাগুলি নিম্নে উল্লেখ করলাম- 'পাশপোর্ট' (১৯৫১), 'নয়া তুঘলক (১৯৫৫), দৈনিক সন্দেশ' (১৯৫৫), 'সমাজতন্ত্র' (১৯৫৭), 'স্পেশাল ট্রেন' (১৯৬১), 'গেরিলা' (১৯৬৪), 'সমাজতান্ত্রিক চাল' (১৯৬৫), 'জনতার কল্লোল' (১৯৬৫-৬৬), 'মৃত্যুর অতীত' (১৯৬৬),

'দিনবদলের পালা' (১৯৬৭), 'ময়না তদন্ত' (১৯৬৮), 'বর্গী এলো দেশে' (১৯৭১), 'অস্ত্র' (১৯৭৬), 'দিনবদলের দ্বিতীয় পালা' (১৯৭৭), 'চক্রান্ত' (১৯৭৯), 'কালোহাত' (১৯৭৯), 'পেট্রল বোমা' (১৯৮২), 'মালোপাড়ার মা' (১৯৮৩), 'তিলজলার জল' (১৯৮৩), 'মূমূর্ষু বাংলা' (১৯৮৫), 'মূমূর্ষু নগরী' (১৯৮৫), 'কাচের ঘর' (১৯৮৭), 'হমে দেখনা হ্যাদয়' (১৯৮৯), 'মায়ের চোখে জল' (১৯৯১), 'সত্তরের দশক' (১৯৯২)। উপরিউক্ত পথনাটকগুলির মধ্যে 'পাশপোর্ট' থেকে 'ময়নাতদন্ত' পর্যন্ত পথনাটকগুলি 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' দ্বারা প্রযোজিত হয়েছে। 'বর্গী এলো দেশ' থেকে 'মায়ের চোখের জল' পর্যন্ত পথনাটকগুলি 'পিপলস লিটল থিয়েটার' কর্তৃক প্রযোজিত হয়েছে। আবার অনেক সময় উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায় নামটিও ব্যযবহার করা হয়েছে।

আধুনিককালে বিভিন্ন নাট্য সমালোচক বিভিন্নরকম ভাবে নাটক তথা পথনাটকের সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন। যে সমালোচকের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা যত স্পষ্ট, সেই সমালোচক তত বেশি পথনাটককে প্রচারকর্ম এবং রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কোথাও আবার ভাবনা চিন্তা দোদুল্যমান, সমালোচকের সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছাপ স্পষ্ট নয়। কখনও বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করে উপর উপর দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ছেড়ে দিয়েছেন। সমস্যার মূল গভীরে সমালোচক যান নি। কোথাও আবার রাজনৈতিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে পছন্দ করেননি কিছু নাট্যকার এবং সমালোচকরা।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৫৩ সালে মহেশতলা উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সুধীর ভান্ডারির সমর্থনে পানু পালের 'ভোটের ভেট' পথনাটকে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত। এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন পানু পাল, ঋত্বিক ঘটক ও উমানাথ ভট্টাচার্য। এই পথনাটকটি অভিনয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পথনাট্যকার পানু পাল। পরবর্তী সময়ে গণনাট্যসংঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উৎপল দত্ত পথনাটকের ধারাকে অব্যাকহত রেখেছিলেন। নাট্যকার, অভিনেতা উৎপল দত্ত ১৯৫৫-৫৯ সাল পর্যন্ত তাঁর লিটল থিয়েটারের গ্রুপের নিয়ে অসংখ্যবার পথনাটক অভিনয় করেছেন গ্রামে, গঞ্জে ঘুরে ঘুরে। সেই সময় লিটল থিয়েটার গুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন- শেখর চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোরপাধ্যায়, কালিন্দী সেন প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গে বা তার বাইরেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি পথনাটক অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার আলোকে সেখানকার মানুষের সমস্যা, দাবি-দাওয়া, প্রশ্ন, বক্তব্য সবকিছু সাবলীল দক্ষতায় নাটকের কাঠামোয় দাঁড় করে অভিনেতারা সুন্দরভাবে অভিনয় করছিলেন। অনেক সময় আবার স্থান বিশেষে পথনাটকের প্রকাশভঙ্গী পাল্টে যেতেও দেখা যায়। উৎপল দত্তর বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, অনেক সময় কোন পথনাটক করবেন তা স্থির থাকত না, যেখানে যখন যেতেন সেখানকার সাধারণ মানুষের সমস্যা জেনে তাদের মতো করে প্লট নির্মাণ করে পথনাটক অভিনয় করতেন। তৎকালীন সময়ে চন্দননগর, এন্টালির উপনির্বাচন, কৃষ্ণনগর লোকসভার উপনির্বাচন, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি, ভারত পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট চালুর প্রতিবাদে, বাংলা বিহার সংযুক্তি করণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, হিন্দমোটর কারখানায় শ্রমিকদের আন্দোলন, সুতাকল ধর্মঘট প্রভৃতি ইস্যুদকে কেন্দ্র করে একাধিক পথনাটক লিখেছেন উৎপল দত্ত।

বজবজ-মহেশতলা, কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর, গয়েশপুর এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ- সব প্রান্তেই তৎকালীন সময়ের পথনাট্যকাররা পথনাটক অভিনয় করেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে পথনাটক যে কতবড় শক্তিশালী হাতিয়ার, সে সম্পর্কে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরই সুস্পষ্ট কোন ধারণা

ছিল না। একাধিক বক্তব্য, সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্ত বারবার বলেছেন, 'গণনাট্য সংঘ' তাকে পথনাটক লিখতে ও অভিনয় করতে প্রবল উৎসাহ জুগিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছিল বলেও স্বীকার করেন। ১৯৬০ সালের পর থেকে উৎপল দত্ত পথনাটককে ধারালো অস্ত্রের মতো ব্যীবহার করেন। নাট্যকারের অসাধারণ বুদ্ধি, তীব্র শ্লেষ, তীক্ষ্ণ সংলাপ, পথনাটকে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে বাংলা পথনাটকের ঐতিহ্যের ধারাকে মর্যাদার আসনে তুলে ধরেছেন।

পাশপোর্ট :

নাট্যকার উৎপল দত্তের বিভিন্ন সময়ের লেখা ও অভিনীত পথনাটকগুলি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো। নাট্যকার ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করেও একাধিক পথনাটক লিখেছেন। উৎপল দত্তের লেখা প্রথম পথনাটক হল- 'পাশপোর্ট' (১৯৫১-৫২)। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয় এবং বিভক্ত হয় ভারত ও পাকিস্তান এই দুই নামে। পাকিস্তানের দুটি অংশ দুই প্রান্তে অবস্থিত। একটি পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ নামে পরিচিত) বা বাংলাদেশ আরেকটি পশ্চিম পাকিস্তান নামে পরিচিতি। তৎকালীন বাংলাদেশের একটি অংশ ভারতের মধ্যে পড়ে, যার নাম পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গের অসংখ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যাবিভিন্ন পার্শবর্তী রাজ্যে(চলে আসে দেশভাগের ফলে। আবার অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অসংখ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। উভয় জাতি গোষ্ঠীই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বাসভূমিতে বসবাস করে এসেছে। তাই উভয় জাতিরই স্ব-ভূমির প্রতি নাড়ির টান ছিল। রাষ্ট্রীয় শাসনের নামে দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে তাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে হয়। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম করেন, পূর্ববঙ্গে যেতে হলে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পাশপোর্ট লাগবে। এই পাশপোর্টের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নাগরিক মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না।

১৯৫০ সালের পর থেকে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রে মিলে চুক্তি করে, দুই বঙ্গের মানুষদের একবঙ্গ থেকে অন্য বঙ্গে যেতে হলে 'পাশপোর্ট' লাগবে বলে আইন ঘোষিত হয়। তখনও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানকে অন্য দেশ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়নি। বাঙালির প্রাণের বেদনার কেন্দ্রে পাশপোর্ট প্রথা তীব্র আঘাত হেনেছিল। অনেকেই নিজের দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য দেশে চলে গেছে। পাশপোর্ট প্রথা বাঙালিদের অবাধ যাতায়াতের পথে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের প্রতিবন্ধকতা বলে প্রতিভাত হতে লাগল। সেইদিন বাঙালি এই ব্যবস্থার বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতেই উৎপল দত্ত ১৯৫১-৫২ সালে 'পাশপোর্ট' পথনাটকটি রচনা করেন। উৎপল দত্তের 'পাশপোর্ট' পথনাটকটি পাশপোর্টের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচারমূলক পথনাটক।

নয়া তুঘলক :

নাট্যকার উৎপল দত্তের লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পথনাটক হল- 'নয়া তুঘলক' (১৯৫৫)। এই পথনাটকটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যকার রচনা করেছিলেন। ১৯৫০ সালে আমাদের দেশের সংবিধান রচিত হলে, দেশের সংবিধানে ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র দেশ হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পরপরই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্য মন্ত্রী (বিধানচন্দ্র রায়) এবং দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (জওহরলাল নেহেরু) পারস্পরিক গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে বাংলা এবং বিহারকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তৎকালীন সময়ে জাতীয় কংগ্রেস সরকারের

এই প্রস্তাব বাঙালির কাছে একপ্রকার আত্মহত্যার সামিল বলেই মনে হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসী শাসকদলের রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রতিবাদে জনগণকে সংগঠিত করে। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের মনে তীব্র ক্ষোভ, ঘৃণা, ধিক্কার জন্মায়, যার ফলে কংগ্রেস সরকার অবশেষে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। নাট্যকার উৎপল দত্ত জনমানসের এই ক্ষোভ, যন্ত্রণাকে 'নয়া তুঘলক' নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। এই পথনাটক রচনার প্রেক্ষাপটই ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদের কথা। এই নাটক সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যা পক সাড়া ফেলেছিল। স্বাধীন দেশের 'কংগ্রেসী সরকারের' ঘৃণ্য চক্রান্ত, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যা খান করেছিল। নাট্যকার এই চক্রান্তকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাসহ দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন।

স্পেশাল ট্রেন :

নাট্যকার উৎপল দত্ত রচিত এবংঅভিনীত অন্যেতম পথনাটক হল- 'স্পেশাল ট্রেন'। বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি একটি মাইলস্টোন। ১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে এই নাটকটি বাংলার রাজনীতিতে এবং ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া এবং কোন্নগর স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে শিল্পপতি বিড়লার হিন্দমোটরস কারখানা অবস্থিত। ১৯৬১ সালে এই কারখানায় ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। আমাদের সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আইনিভাবে স্বীকৃত। ধর্মঘট করার স্বাধীনতাও শ্রমিকদের আছে। রাজ্যক এবং কেন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমদপ্তর আছে, ট্রাইবুনাল আছে, সর্বপরি দেশের আইন ব্যবস্থা আছে। হিন্দমোটরস কারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য ধরে বিধিসম্মত মেনে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। হিন্দমোটরস কারখানার কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে কারখানা লকআউট ঘোষণা করে। তবুও হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যান।

হিন্দমোটরস কারখানার মালিক বিড়লাজি কারখানা বন্ধ হওয়া নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত। কারণ বিড়লাজির লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা বন্ধ। কারখানার মালিক পক্ষ প্রথমে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, বরখাস্ত করে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে ব্যর্থ হলে, পুলিশ ও সমাজ বিরোধীদের দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অফিস, ক্যাম্প ভাঙচুর করে অত্যাচার চালায়। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব স্থানীয় ধর্মঘটীদের প্রহার ও গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরেও যখন শ্রমিক আন্দোলনকে কোন স্তর থেকেই ভাঙতে পারলেন না, তখন শুরু হল কারখানা পার্শবর্তী এলাকায় দমনপীড়ন নীতি। এই দমনপীড়নে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষক, ঘুমন্ত নাগরিক, অসহায় রমনীদের উপর অত্যাচার চলে। আন্দোলন দমন করার নামে চলে দোকান-পাঠ লুঠ করা। পার্শবর্তী গ্রামগুলিতে পুলিশের সাহায্যে নিরীহ কৃষকদের উপর অত্যাদচার চলে। তারপর শ্রমিকদের দমনপীড়ন চালিয়েও বিড়লাজি শ্রমিকদের ধর্মঘটে ফাটল ধরাতে পারেন নি। তখন হিন্দমোটর কারখানার মালিক সরকারের সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে ভাড়াটে দালাল নিয়ে এসে কারখানা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এইজন্য বিড়লাজি স্পেশাল ট্রেনের ব্যেবস্থা করেছিলেন। বিড়লাজিকে সাহায্য করার জন্য তৎকালীন সরকার বেআইনি ভাবে স্পেশাল ট্রেনের অনুমতি দেয়। আন্দোলনরত শ্রমিকেরা বিড়লাজির এই পরিকল্পনা এবং সাহায্য সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন এই

স্পেশাল ট্রেনকে কোনভাবেই উত্তরপাড়া, কোন্নগর স্টেশনে বা কোন কারখানার সন্নিহিত অঞ্চলে দাঁড়াতে দেয় নি। ফলে বিড়লাজির ভাড়া করা দালালরা কারখানায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এই কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি রচনা করেন।

'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি শুরু হয়েছে, লেবার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। লেবার অফিসার শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, তার ধারণার বদল ঘটতেই তিনি বিড়লাজির চরমতম দালালের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। লেবার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, বিড়লাজিদের পক্ষেই সরকার, শ্রমিক অফিসার প্রমুখ। পুলিশ ইন্সপেক্টর শাসন-শোষণ ও দমননীতিতে বিশ্বাসী। হিন্দমোটরের আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর মালিক পক্ষের নির্যাতন এবং নানা উপায়ে ধর্মঘট বানচাল করার কৌশল তৎকালীন সময়ে কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়নি। একজন প্রগতিশীল এবং সংবেদনশীল শিল্পী হিসাবে নাট্যকার উৎপল দত্ত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দমোটর কারখানা সংলগ্ন এলাকায় যান। সেখানকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে নাট্যকার কথাবার্তা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কাছ থেকে মালিক পক্ষ এবং প্রশাসনের অত্যাচারের খবরা খবর সংগহ করেন। একজন প্রগতিশীল শিল্পীর হাতিয়ার যে নাটক, সেই নাটক দিয়েই উৎপল দত্ত মালিক পক্ষের অত্যাচার, নিপীড়ন এবং পার্শবর্তী মানুষের ওপর নির্যাতন ইত্যাদি সংবাদ শুধুমাত্র রাজ্যবাসী নয়, দেশের মানুষের কাছেও পৌঁছে দেবেন এই ভাবনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন। নাট্যকার একজন শিল্পীর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করার অংশত দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকের মধ্যে দিয়ে বিগত দিনে পুলিশ ও শাসকের অত্যাচার নিপীড়নের নানা দলিল তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। যেমন হিন্দমোটর স্টেশনের প্লাটফর্মে লাঠি চালিয়ে, টিয়ার গ্যাস ছাড়িয়ে জনগণকে ঠান্ডা বানিয়েছে, কলেজ ছাত্রের হাতের আঙুল উড়িয়ে দিয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির এম.এল.এ মনোরঞ্জন হাজরাকে বুটের লাথি মেরেছে, এক মহিলার শাড়ি খুলে নিয়েছে, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপকদের লাঠিপেটা করেছে, স্টেশনের ঘরটাকে দখল করে পুলিশ ক্যাগম্প বসিয়েছে। অপরদিকে লেবার অফিসার বলেন- 'কোম্পানিও বসে নেই, কলকাতার রাধাবাজার স্ট্রিটে এক অফিস খুলেছি, সেখানে দালাল জড়ো করে স্পেশাল ট্রেনে নিয়ে আসছি হিন্দমোটর-এ'।

গেরিলা :

নাট্যকার উৎপল দত্ত ১৯৬৫ সালে 'গেরিলা' নামক উল্লেখযোগ্য একটি পথনাটক রচনা করেন। সেই সময় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণিকে উৎখাত করেছিল পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ থেকে। এই সময় আমাদের দেশেও চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। অভ্যন্তরীণ নানা সংকট মোকাবিলা করতে না পেরে চীন আক্রমণ করেছে বলে শাসকদল এবং সরকার দাবি করে। আবার কখনও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধেও জড়িয়েছে আমাদের দেশ। এইরকম পরিস্থিতিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা বলেছিলেন- 'সরকারের হাতে প্রমাণ আছে সি.পি.আই.(এম) ভারতে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির প্রতিবাদে নাট্যকার উৎপল দত্ত 'গেরিলা' নামে পথনাটকটি লিখেছিলেন।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা উল্লেখ করেছেন, সি.পি.আই.(এম) চীন এবং কিউবা থেকে গোপনে অনেক কিছু নিয়ে এসে ভারতে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরিশেষে দেখা যায়, লন্ডন থেকে প্রকাশিত ক্যা সেল কোম্পানি থেকে 'গেরিলা ওয়ার্ক হেয়ার' নামক একটি বই। এই বইটির লেখক ছিলেন মাও সে তুং এবং চে-গুয়েভরা। সেই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন বিখ্যাত যুদ্ধ বিশারদ ক্যানসেল লিভেন হার্ট। গোটা পৃথিবীতেই এই বই প্রচারিত। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে কিংবা অন্য যেকোন স্থানে প্রকাশ্যে এই বই বিক্রি হয় প্রতিনিয়ত। সহজেই বোঝা যায়, এই বই গোপনে আনার কোন প্রশ্নই নেই। এই পথনাটকটি প্রথম অভিনীত হয় নদীয়া জেলার তেহট্টে। অভিনয় শেষ হওয়ার পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ, সাদা পোশাকের সমাজবিরোধীদের একসঙ্গে মিলিত হয়ে নাটক এবং মিটিং আক্রমণ করে। অদ্ভুত বিষয় হল, রঞ্জিত স্টেডিয়ামে সি.পি.আই- এর যুব উৎসবের মঞ্চে জোরপূর্বক 'গেরিলা' পথনাটকটি অভিনীত হয়।

সমাজতান্ত্রিক চাল :

নাট্যকার উৎপল দত্ত ১৯৬৪ সালে 'সমাজতান্ত্রিক চাল' নামে একটি পথনাটক রচনা করেন। এই পথনাটকটি ছিল মূলত একটি ইস্যু ভিত্তিক রচনা। আমাদের রাজ্যেক তখন চলছিল তীব্র খাদ্যই সংকট। প্রতিনিয়ত চালের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে, ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মুখ্য মন্ত্রী হন। তিনি খাদ্য সংকট ও চালের অভাবের দিনে যখন বাংলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তখন তিনি রাজ্যচবাসীকে কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে হাস্য স্পদে পরিণত হয়েছিলেন। 'সমাজতান্ত্রিক চাল' পথনাটকটি যখন নাট্যকার লেখেন, তখন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। চীনের সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র - এই দুইয়ের মধ্যে নাট্যকার উৎপল দত্ত চীনের সমাজতন্ত্রের পক্ষেই অধিক আস্থাবান ছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার 'সমাজতান্ত্রিক' চাল পথনাটকটি বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতরক্ষা আইনে প্রথমে উৎপল দত্তকে গেপ্তার করা হয়। অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী মনে করেন- 'এখানে চাল শব্দটি দুই অর্থেই ব্যহৃত। প্রথমত খাদ্যদবস্তু 'চাল' দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক আচরণ বা 'চাল'।'

জনতার কল্লোল:

নাট্যকার উৎপল দত্ত-এর আরেকটি একটি উল্লেখযোগ্য পথনাটক হল- 'জনতার কল্লোল'। নাট্যকারের বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কল্লোল' রচিত হওয়ার পরেই ১৯৬৬ সালে 'জনতার কল্লোল' নামে একটি পথনাটিকাও রচনা করেন। এই পথনাটকটির প্রস্তাবনা অংশেই নাট্যকার ইতিহাসের নির্মম চিত্র, শোষকের সীমাহীন অত্যা চারের কথা উল্লেখ করেছেন—

> *'পৈশাচিক শোষক শ্রেণি যে ইতিহাসকে রেখেছিল লুকিয়ে বিস্মৃতি ঘেঁটে তারই একপাতা কুড়িয়ে এনেছিলাম। খেতে দিতে না পেরে মালতী শিশু সন্তানকে জলে ফেলে দিয়েছে, ছেলের কান্নায় উন্মাদ হয়ে এক বাপ আছড়ে মেরেছে দুধের ছেলেকে, সপরিবারে গলায় দড়ি দিয়েছে এক ডাক্তার। কৃষক বধূ ঘোমটা খুলে ভিক্ষা চাইছে কংক্রিটের অরণ্যে। কারাগারে রুদ্ধ সহস্র সহস্র ভাই পিতা মাতা; বিচারের প্রয়োজন নেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে।'*

এই পথনাটিকার মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্ত শাসকশ্রেণির অত্যাচার, নিপীড়ন কি পরিমাণে নামিয়ে এনেছিল, তার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তৎকালীন সময়ে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব- সকলেরই প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকার সব ধরনের অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। শুধুমাত্র সাংবাদিক নয়, শুধুমাত্র নাটকের বিজ্ঞাপন নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও কণ্ঠরোধ করেছিল। আমরা এক কথায় বলতে পারি, গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। এই নাটকটি প্রথমদিকে অভিনয় করতেন বিধান মুখোপাধ্যায়-লেবার অফিসার, উৎপল দত্ত-পুলিশ ইন্সপেক্টর, রামবন্ধু চৌধুরী-পুলিশ কনস্টেবল, নুনিয়া-কমল মুখোপাধ্যায়, শংকর দালাল-দেবেশ চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়-নাগরিক, সমরেশ বন্দ্যোরপাধ্যায়-ধর্মঘটী শ্রমিক। এইসময় নাট্যকার উৎপল দত্তকে একটি নিবন্ধ লেখার অপরাধে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে পুলিশ গেপ্তার করে। তৎকালীন ইংরেজি স্টেটসম্যান ব্যতীত কোন পত্রিকাতেই 'কল্লোল'-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি।

দিনবদলের পালা :

১৯৬৭ সালে রচিত নাট্যকার উৎপল দত্তের অসাধারণ নাট্যয়কর্মের অন্যনতম নাটক হল 'দিনবদলের পালা'। মিনার্ভা প্রসেনিয়াম মঞ্চে এই নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। অনেক সময় নাট্যকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই নাটকটিকে পথনাটক হিসাবে অভিনয় করছেন। প্রসেনিয়ামের ঘেরাটোপের মধ্যে এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করেছিল নাটকটি। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের প্রাককালে নাট্যকার 'দিনবদলের পালা' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি লিখেছিলেন। এই নাটকটি প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অভিনয় হয়েছে। পথনাটকের সময় এটিকে সংক্ষিপ্ত করে দেড় ঘন্টায় অভিনীত হত। ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের ভয়ঙ্করতম দিনগুলিতে দেশব্যাপী হইচই পড়ে যায়। বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন একইসঙ্গে হবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই নিয়ে টানাপোড়েনও শুরু হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসনের বিদায় আসন্ন, এই ভেবে কংগ্রেস উঠে পড়ে লেগেছে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য। অন্যরদিকে বামপন্থী রাজনীতি দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে নিজেদের সঙ্গে লড়াই করে। এই প্রেক্ষিতে নাট্যকার উৎপল দত্ত 'দিনবদলের পালা' নাটকটি লেখেন। নাটকে একজন এ.এস.আই পুলিশকে হত্যা করার অপরাধে সুপ্রকাশ নামক এক যুবককে পুলিশ গেপ্তার করে। সুপ্রকাশের আইনজীবী এবং বৌদি সতী তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে পুলিশ অফিসার দেখা করতে দিতে অস্বীকার করে।

> *'বাসু খুব কাছ থেকে গুলি ছোড়া হয় এবং ফুসফুসের জখম থেকে রক্তছিটকোয়। ঘটনার দিন আসামির পররনে যে শার্ট ছিল সেটা একজিবিটবি; তাতে রক্তের দাগ স্পষ্ট। এখানে সাক্ষ্য দেবেন ডাক্তার অম্বুজাক্ষ চক্রবর্তী। তিনি বলবেন শার্টের রক্ত 'ও' টাইপ এবং ইন্সপেক্টর বিশ্বাসের রক্ত ছিল 'ও' টাইপ। অর্থাৎ সুপ্রকাশ বসুর জামায় রয়েছে ইন্সপেক্টর বিশ্বাসের রক্তের ছিটে।'*

ময়নাতদন্ত :

নাট্যকার উৎপল দত্ত ১৯৬৮ সালে 'ময়নাতদন্ত' পথনাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটি যখন নাট্যকার লেখেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন চলছে। এই পথনাটকটি ১৯৬৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর গেস্টকীন উইলিয়মস কারখানার শ্রমিকদের সামনে প্রথম অভিনীত হয়। এই পথনাটকটিতে উল্লেখিত আছে ডাক্তার গৌরাঙ্গ

মিত্র, ম্যানেজিং ডিরেক্টর লক্ষণ চন্দ্র, পুলিশ, ওয়াটারম্যা সাহেব, লেবার অফিসার সত্য, শ্রমিক অঘোরের পিতা জীবন হালদার প্রমুখ চরিত্রের কথা। এই পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন, কীভাবে শ্রমিকদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন করা হয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে মালিক একেবারেই উদাসীন থাকত। কোন শ্রমিক মারা গেলে কর্তৃপক্ষ তার কোন দায়-দায়িত্ব নিতে চায় না। আবার সরকারি শ্রমদপ্তরও শ্রমিকদের পাশে না দাঁড়িয়ে বিভিন্ন উপায়ে মালিকশ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের শোষণ এবং শাসন করার কাজটি মসৃণ করেছে।

'ময়নাতদন্ত' পথনাটকটি নাট্যকার শুরু করেছেন মৃত শ্রমিক অঘোর হালদারকে স্ট্রেচারে করে আনা হয়েছে আচ্ছাদিত অবস্থায় সেখান থেকে। মৃত শ্রমিককে কেন্দ্র করেই নাটকটি আবর্তিত হয়েছে। মৃত শ্রমিককে কেন্দ্র করেই মালিক, পুলিশ, লেবার অফিসার- সকলের স্বরূপ নাট্যকার তুলে ধরেছেন। অপরদিকে শ্রমিক, কৃষক, ডাক্তার এবং সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র নাট্যকার এই পথনাটকে চিত্রিত করেছেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর লক্ষ্মণ মৃত শ্রমিকের নর্মাল অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ডাক্তার গৌরাঙ্গবাবুর উপরে চাপ সৃষ্টি করেন। ডাক্তার গৌরাঙ্গ কোনভাবেই লক্ষ্মণ এবং পুলিশের কাছে প্রথমদিকে মাথা নত করেননি।

দিনবদলের দ্বিতীয় পালা :

নাট্যকার উৎপল দত্ত 'দিনবদলের পালা'র দশ বছর পরে 'দিনবদলের দ্বিতীয় পালা' নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটি যখন তিনি লেখেন এবং অভিনয় করেন, তখন তিনি বেথুন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিদ্ধার্থ রায়ের জমানার কালো দিন অতিক্রান্ত করে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন দিনবদলের স্বপ্নকে নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। পুলিশ-প্রশাসন এবং কংগ্রেস দলের মিলিত প্রচেষ্টায় ৭২-৭৭ সালে যে বীভৎস ও ভয়ংকর সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল, নাট্যকার তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন 'দিনবদলের দ্বিতীয় পালা' পথনাটকে। দর্শক এবং জনগণের মানসিক চেতনার স্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করাই পথনাট্য কারের প্রধানতম দায় এবং দায়িত্ব। শত অত্যাকচারের শেষেও আমরা দেখতে পাই, অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষই শেষ কথা বলে।'দিনবদলের দ্বিতীয় পালা' নাটকটি নিয়ে উৎপল দত্ত এবং পিপলস লিটল থিয়েটার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয় করেছেন। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার এবং প্রশাসনের নির্বিকার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যযকারের অপর এক পথনাটক 'বর্গী এলো দেশে'। সেখানেও আমরা লক্ষ্যে করি, মানুষের জেগে ওঠা, জাগিয়ে তোলা এবং সমকালীন বর্গীদের অত্যাচারের মোকাবিলা করে বাংলা থেকে তাদের বিতাড়িত করার কথা। এই পথনাটকে নাট্যকার উৎপল দত্ত এক অর্থে দেশ থেকে কংগ্রেস শাসনব্যবস্থাকে বিতাড়িত করার কথাই বলেছেন।

মালোপাড়ার মা :

মালদহ জেলার মালোপাড়া গ্রামে কংগ্রেসী মস্তানদের অত্যাগচার, নিপীড়ন চলে। এই অত্যাচারের হাত থেকে বৃদ্ধ, নারী, অসহায় শিশু কেউই বাদ যায়নি, তা নাট্যকার এই পথনাটকে বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেসী গুন্ডাদের নারকীয় হত্যাকলীলা সমগ্র দেশে হইচই ফেলে দেয়। সেই বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নাট্যকার উৎপল দত্ত প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য 'মালোপাড়ার মা' নাটকটি লিখেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর একাডেমী মঞ্চে 'মালোপাড়ার মা' প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর ফলে নির্বাচন এসে যায়। এই

সময় নাট্যকার উৎপল দত্ত 'মালোপাড়ার মা' নাটকটিকে সামান্য কিছু রদবদল ঘটিয়ে পথনাটকের আঙ্গিকে তৈরি করেন। উৎপল দত্ত তাঁর পি.এল.টি দলের কর্মীদের নিয়ে সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই পথনাটকটি অভিনয় করেন।'মালোপাড়ার মা' পথনাটিকায় নাম ভূমিকায় মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী শোভা সেন। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন- 'মালোপাড়ার মা নাটকটিতে মায়ের চরিত্রটি আমার জীবনে অভিনয়ের অন্যইতম একটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র।'

'মালোপাড়ার মা' পথনাটকটি শুরু হয়েছে 'কংগ্রেস নেতা' শওকত এবং বামপন্থী বারির সংলাপের মধ্যে দিয়ে। দুই রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার পথনাটকটি শুরু করেছেন। এই পথনাটকের মধ্যে নাট্যকার নিজেও একটি চরিত্র। মালদহ জেলা কংগ্রেসের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে চিহ্নিত ছিল। সেই দুর্ভেদ্য দূর্গে ক্রমশ বামপন্থী শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে, শুধু তাই নয়, জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছে- এই বিষয়গুলি কংগ্রেস নেতা শওকত, নইমুদ্দিন, বেলাল ভালোভাবে মেনে নিতে পারেন নি।অপরদিকে বারি ও বারির স্ত্রী তহমিনা উভয়েই আশঙ্কিত 'কংগ্রেসী মস্তান' বাহিনী ও জমিদার জোতদারদের অত্যাতচার নামিয়ে আনার ভয়ে। কেননা কিছুদিন আগেই চাঁদমণি অঞ্চলের প্রধান কমরেড আব্দুল হানান শেখ খুন হয়ে যান। কারণ আব্দুল হানান সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতৃত্বে বেলাল চৌধুরীর ২৭৫ বিঘা খাদ্যজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই জমিদার-জোতদার এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব বামপন্থী শক্তিকে ভয় পেতে শুরু করে। তারপর থেকেই কংগ্রেস নেতা নইমুদ্দিন এবং শওকত পরিকল্পনা করে, কীভাবে মালোপাড়া গ্রামে সন্ত্রাসের কালো ছায়া নামিয়ে আনা যায়। মালদহ জেলায় কংগ্রেসের পরাজয়ের ফলে দিল্লিতে শওকতের স্থান দুর্বল হয়ে যায়। এই পথনাটকটির অভ্যান্তরে নাট্যকার দেখিয়েছেন—

> *'**শওকত :** না, উত্তেজিত হবে না, শান্ত হয়ে বসে বসে দেখব কি করে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়! সারা ভারতের সামনে আমার মুখে চুনকালি পড়ল! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমি, লোকসভায় আমার অমন প্রতিপত্তি, সব গেল! দিল্লীতে কংগ্রেসের লোকেরাই বলাবলি করছে এর নিজের এলাকাতেই ওর কোন প্রভাব নেই, সে আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। সেদিন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বাঁকা হাসি হেসে বলে উঠলেনকী হল? সে এমন সুর, এমন উচ্চারণ যে গায়ে জ্বালা ধরে গেল।'*

নাট্যকার জমিদার-জোতদার এবং কংগ্রেস দলের শোষকের চিত্রটি 'মালোপাড়ার মা' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের সম্মুখে উন্মোচিত করেছেন। শওকত, নইমুদ্দিন, বেলাল নিজের দলের কর্মীকে খুন করার মধ্যে দিয়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে। কংগ্রেসরা নিজেদের তৈরি করা সন্ত্রাসের বাতাবরণকে অন্য রাজনৈতিক দলের নামে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে মালোপাড়া গ্রামের উপরে। এই পথনাটকে আমরা দেখতে পাই, কংগ্রেস দলের এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে গিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে উৎপল দত্ত 'মালোপাড়ার মা' পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে 'কংগ্রেসী মস্তানদের' নির্যাতন, অত্যোচারের কথা শুধু উল্লেখই করেননি, গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে মালোপাড়ায় যে নৃশংস ও পৈশাচিক হত্যোকান্ড ঘটেছিল সেই অমানবিক চিত্রটি সারা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। এই পথনাটকে

আমরা দেখতে পাই, বারো বছরের শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, সাইয়েদা বিবির ইজ্জত হানি করেছে। কংগ্রেসী নেতা শওকত সেই হত্যাতকারী ও ইজ্জত লুণ্ঠনকারীদের আবার সম্মান জানিয়েছে। নাট্যকার নাটকটি লেখার পূর্বে দেখেছিলেন মালদহ জেলার আইনজীবী থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং অসন্তোষ। কংগ্রেসী নেতা শওকত, নইমুদ্দিনদের নৃশংস হত্যা কান্ডের বিরুদ্ধে কংগ্রেসদেরই একটা অংশ, যেমন— শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন মিশ্র, শ্রী শান্তিগোপাল সেন প্রমুখ ব্যদক্তি স্বাক্ষর সম্বলিত লিফলেট বিলি করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নাট্যকার উল্লেখ করেছেন- এই হত্যাকান্ড শুধু মালদহের মালোপাড়া নয়, সারা বাংলায় ঘটবে। সারা বাংলার মানুষকেই শওকতরা হুমকি প্রদর্শন করেছেন। তোহমিনার আর্তনাদ, তোহমিনার মতো অনেক মায়ের কোল খালি হওয়া, শব্দুলের রক্তাক্ত লাশ আমাদের মনকে শুধু ভারাক্রান্তই করে না, কংগ্রেসী মস্তানদের নৃশংস হত্যারকান্ড চোখে সামনে ভেসে ওঠে বারংবার এবং আতঙ্কিত করে। উৎপল দত্ত নাটকের শেষপ্রান্তে এসে নাট্যকার ও তোহমিনার সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

উৎপল দত্ত শ্রমিকশ্রেণি এবং সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই একাধিক পথনাটক লিখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে না পারলে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের মুক্তি নেই। পথনাটকের মধ্যে দিয়ে শোষিত মানুষকে শ্রেণি চেতনা দিয়ে জাগাতে হবে। এই কাজে পথনাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের ভূমিকা পালন করবে। আমরা দেখেছি, সমকালীন মানুষের মধ্যে এই পথনাটকগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন- 'দিন বদলের দ্বিতীয় পালা' ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আবার 'কালো হাত' পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসকে বর্জন করার জন্য নাট্যকার সাধারণ মানুষের কাছে জোরালো আবেদন করেছিলেন। নাটককার উৎপল দত্ত একাধিক নির্বাচনের পূর্বে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পথনাটক লিখেছিলেন। যেমন- 'পেট্রোল বোমা', 'মূমূর্ষু নগরী', 'হামে দ্যাকখনা হ্যায়', 'সত্তরের দশক'।

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-৫

পথনাট্যকার : জোছন দস্তিদার

জোছন দস্তিদার বাংলা নাটকের জগতে যখন প্রবেশ করেন, তখন একাধিক নাট্যকার বাংলা নাটক রচনায় খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। যেমন- বিজন ভট্টাচার্য, সলিল সেন, উৎপল দত্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, পানু পাল, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র প্রমুখ। ঠিক এইরকম সময়ে জোছন দস্তিদারের নাটক লেখা এবং অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং পথনাটক উভয় ক্ষেত্রেই জোছন দস্তিদার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও প্রচারের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছেন বলে আমি মনে করি। নাট্যকার জোছন দস্তিদার নিজেই জানিয়েছেন—

> *'আমার জীবনের অ্যামবিশন ছিল ভাল ক্রিকেট প্লেয়ার হব, কিন্তু হয়ে গেলাম নাট্যমশিল্পী। কৈশোর উত্তীর্ণ সবে তখন যৌবনে পা দিয়েছি। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি। ঐ সময় ভারতীয় গণনাট্যী সংঘের প্রযোজনায় সলিল চৌধুরীর লেখা 'সংকেত'নাটকটা দেখি। এ নাটকটা আমাকে ভীষণ নাড়া দেয়। তৎকালীন গণনাট্যই সংঘ আমাকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করে। আই.পি.টি. এ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তখন বহুরূপী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।'*

নাট্যকার জোছন দস্তিদারের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক- 'দুই মহল'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল- 'স্বর্ণগন্থি', 'বিংশোত্তরী', 'বেইমান', 'কাজের লোক', 'প্রতিকার', 'পঙ্গপাল', 'কর্ণিক', 'পদধ্বনি', 'পালিয়ে ফেরা' প্রভৃতি। নাট্যকার জোছন দস্তিদার পূর্ণাঙ্গ নাটক ব্যতিরেখেও উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি পথনাটক লিখেছিলেন। তিনি নিজেকে কেবলমাত্র নাটক লেখা ও অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, চলচ্চিত্র এবং সিরিয়ালে অভিনয় কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

জোছন দস্তিদার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। তিনি একজন বামপন্থী প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। এই বামপন্থী এবং প্রগতিশীল মনোভাব থাকার সুবাদেই সমাজের শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং পথনাটক উভয়ই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন জোছন দস্তিদার। অনেক সময় নাট্যকার নিজেই গণনাট্য সম্পর্কে ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ করেছেন—

> *'তাঁরা আমাদের বন্ধু মনে করবেন ঠিকই, কিন্তু একটা নাটক যদি শ্রমজীবী মানুষের মঙ্গলের কথা বলে, তাহলে তাকে সর্বত্রগামী করার যে দায়ভার তা তাঁরা নেন না।*

আমরা গ্রুপ থিয়েটারগুলো সরাসরি পলিটিক্যাসল পার্টির সাথে যুক্ত না থাকার ফলে, কমিউনিকেশনের জায়গায় কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আমাদের কালচারাল ফ্রন্টের লিডারদের মধ্যেও এটা ধরার ফাকফোঁক আছে। আর আমাদের মধ্যেরও ব্য ক্তি স্বাতন্ত্র্য কাজ করে। তার ফলে গ্যাযপ থেকে যাচ্ছে।'

নাট্যকার জোছন দস্তিদার ১৯৪৮ সালে বৈশাখী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে সেই নাট্যদল থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৬১ সালে 'রূপান্তরী' নাট্যদল গঠন করেন। আবার ১৯৭৬ সালে 'চার্বাক' নামে একটি নতুন নাট্যদল গঠন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮-৭৬ সাল পর্যন্ত এই ২৮ বছরের মধ্যে তিনি তিনটি নাট্যল প্রতিষ্ঠা করেন এবং দলগুলির পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তিনি একাধিক নাটক রচনা, অভিনয় এবং নাট্য নির্দেশনা দিয়েছেন। নাট্যকার জোছন দস্তিদার ভিয়েতনামের কাহিনি নিয়ে 'অমর ভিয়েতনাম' নাটকটি রচনা করলেও সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় নাটকটি দর্শক সম্মুখে তুলে ধরতে পারেন নি। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত নাট্যয়দলগুলি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন- কখনও প্রসেনিয়াম থিয়েটারে আবার কখনও বা পথনাটক করেছেন রাস্তায়, হাটে, বাজারে, মন্দির সংলগ্ন এলাকায়, কলকারখানার গেটে।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার রাজনীতি এবং নাটককে পৃথক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন নি। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেসী সরকারের নিরাপত্তা আইনে তিনি গেপ্তার হন এবং ছয় মাস জেল খাটেন। জেলে থাকা অবস্থাতেই তিনি নাটক অভিনয় করেছেন। জোছন দস্তিদারের নাট্য জীবনের প্রথম পর্বেই উৎপল দত্তের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা, রাজনীতি আর থিয়েটারকে অবিচ্ছিন্ন রাখার প্রেরণা ও কাজের প্রতি অসীম ধৈর্য্য লাভ করেন। নাট্যরকারের স্ত্রী চন্দ্রা দস্তিদার অবশ্য উল্লেখ করেছেন- উৎপলের সঙ্গে নাট্যকার জোছন দস্তিদারের ঘনিষ্ঠতার পর্বটি ১৯৬৩-৬৮ এই পাঁচ বছর। নাট্যকার উৎপল দত্ত যখন 'তীর' নাটকের মধ্যে দিয়ে সাময়িককালের জন্য অতি বামপন্থীর দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেইসময় উৎপল দত্তের নেতৃত্বে পিপলস আর্টিস্ট ফেডারেশন তৈরি হয়। জোছন দস্তিদার এই পি.এ.এফ কর্মকাণ্ডে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। মোট ছটি দলের সম্মিলিত সেই সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার সম্পাদক হিসেবেও জোছন দস্তিদার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। জোছন দস্তিদার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও পার্টির আদর্শের প্রতি আজীবন আস্থাবান ছিলেন। তিনি এল.টি.জি -র সদস্য না হয়েও উৎপল দত্তের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আবার উৎপল দত্তের পরামর্শে অনেক সময় জোছন দস্তিদারকে আন্ডারগাউন্ডে থাকতে হয়েছে নিরাপত্তার অভাবে। নাট্যকার জোছন দস্তিদার জানিয়েছেন, 'পথনাটক রচনায় তাঁর দীক্ষা উৎপল দত্তের কাছেই, আমি প্রথম ইন্সপায়ারড হই উৎপলদার কাছ থেকে।'

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই শ্রমিক আন্দোলনে নাট্যকার জোছন দস্তিদারের নাটক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি এল.টি.জি নাট্যদলে থাকা অবস্থায় উৎপল দত্তের নির্দেশনায় 'ম্যাকবেথ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। নাট্যকার তাঁর লেখা 'দুই মহল' নাটক অভিনয়ের সময় ১৮ ঘন্টা করে রিহার্সেল দিতেন বলে শোনা যায়। এই নাটক নিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পরিকল্পনা করতেন।'দুই মহল' নাটকে অনেকগুলি ভিখারি চরিত্র ছিল, তারা সকলেই আমাদের চেনা। তাদের খুঁজে বের করতে নাট্যকার বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল। এই সমস্ত ভিখারিদের সঙ্গে কথা বলাও ছিল দুঃসাধ্যকর ব্যাপার। কারণ ভিখারিদের টাউটাররা জানতে পারলে প্রাণে মেরে

দেবে। এই দুঃসাধ্য, কঠিন কাজ নাট্যকার জোছন দস্তিদার করেছেন। নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'দুই মহল' নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন দ্বি-মাত্রিক সেটের মাধ্যমে। এই মঞ্চ পরিকল্পনা করতে তাঁর সময় লেগেছিল পাঁচ-দশ সেকেন্ড। এই দ্বিমাত্রিক সেটের বিষয়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন 'বহুরূপী' দলের নির্মল চ্যা টার্জী। ১৯৫৬ সালে কলকাতার হাজরায় 'মহারাষ্ট্র' হলে জোছন দস্তিদারের পরিচালনায় 'দুই মহল' অভিনীত হয়। এই নাটকটি পরিচালনার পাশাপাশি তিনি অভিনয়ও করেছেন। নাট্যকার জোছন দস্তিদারের জীবনে এটাই ছিল প্রথম অভিনয়। নাট্যকার নিজে জানিয়েছেন—

> *'শিল্পসৃষ্টিতে মূল অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে। যথেষ্ট গর্বের সাথেই কথাটি উচ্চারণ করলেন শিল্পী। আবুল বাসের নামে বাটার একজন শ্রমিক নেতা আমার জীবনে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাছাড়া আমার কাকা হিরন্ময় ঘোষ তিনিও পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে জগদীশ চক্রবর্তী (যার নাটক আমরা এখন করছি) আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।'*

নাট্যকার জোছন দস্তিদারের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি আমরা তাঁর জীবন সঙ্গিনী চন্দ্রা দস্তিদারের কথা না বলি। চন্দ্রা দস্তিদার না থাকলে নাট্যকার সার্থক নাট্য শিল্পী হতে পারতেন না। প্রতি মুহূর্তেই চন্দ্রা দস্তিদার নাট্যকারকে একজন সফল নাট্য শিল্পী হতে কঠিন পরিশ্রম করেছেন। নাট্যকারকে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। জোছন দস্তিদারকে নাটক লেখা এবং অভিনয় করার জন্য অনেক সময় এলাকা ছাড়তে হয়েছে, কখনও আবার জেলেও গিয়েছেন। নাট্যকারকে নকশাল বলে ফেরার হতে হয়েছে। কখনও আবার নাটকের অভিনয় ছেড়ে কাজের সন্ধানে ঘুরতে হয়েছে। নাট্যকার জোছন দস্তিদারকে কোন এক সময়ে নকশাল হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। নাট্যকার এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন- 'নকশাল আমি ছিলাম না কোনদিনই। বরং তাদের ভ্রান্ত রাজনীতির আমি সমালোচনা করেছি, ব্যাপারটা কি জানিস? সেই সময়টা খুব ভুল বুঝাবুঝি চলছিল। সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। সেই সময় নকশাল বাড়িতে তিনজন কৃষককে খুন করা হয়েছিল। আমিও সকলের সাথে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছিলাম, বলেছিলাম এটা অন্যায়। ব্যস এই অন্যায় কথা বলার সাথে সাথে আমার নামের আগে 'নকশাল শব্দটি' বসে যায়। আমিও সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারিনি। দ্বন্দ্ব যে ছিল না, তা নয়।'

নাট্যকার জোছন দস্তিদার একাধিকবার জেল খেটেছেন। নাট্যকার নিজে বিভিন্ন সময় আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না বলে, দুমদাম মন্তব্য করতেন। তিনি সবসময় ভাবনা চিন্তা করে গুছিয়ে কথা বলতেন না। আমরা দেখতে পাই, যারা বিপ্লবের ছবি করেছেন, তারা অনেকেই উৎপল দত্তের 'কল্লোল'-এ অভিনয় করবেন না বলে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিলেন। নাট্যকার জোছন দস্তিদার তখন ছিলেন সংযুক্ত গণশিল্পী সংঘের সম্পাদক। তাঁর মুখপত্রেই উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অনেকের বিচারে এটি ছিল বেআইনি লিটেরেচার। একাধিকবার নাট্যকার জোছন দস্তিদার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে ভর্ৎসনা করে নাটক অভিনয় করেছেন। পরবর্তী সময়ে প্রফুল্ল সেনের আমলে আবার জোছন দস্তিদার চার মাস জেল খেটেছিলেন। জেলের ভিতরেও তিনি উৎপল দত্তের 'লৌহমানব' এবং 'কঙ্গোর কারাগারে' নাটকে অভিনয় করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। কোথাও গিয়ে তিনি বলতেও পারেন নি, 'আমি খেতে পাচ্ছি না'।

জোছন দস্তিদারের ছোট্ট একটা ব্যবসা ছিল আর তা থেকে যা আয় হত, তাতে মাসে দিন পনেরো অন্নের সংস্থান হত। তিনি একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র্যকে হার মানিয়েছেন। শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে অগণিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। অগণিত মানুষ, যাদের নাট্যকার চিনতেন না, তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রনার অংশীদার হয়েছেন। জোছন দস্তিদার একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন শ্রমই মানুষকে জীবন্ত করে তোলে এবং প্লাবিত করে তোলে, তাই শ্রমকে নাটকে বহুভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, চিরন্তন এবং শ্বাশত ভাবনা চিন্তাই নাটকের বিষয় হওয়া উচিত। তিনি তাঁর একাধিক নাটকের মধ্যে দিয়ে এই চিরন্তন এবং শ্বাশত ভাবনার উল্লেখ করেছেন। জোছন দস্তিদার নাট্যকার উৎপল দত্তের সংস্পর্শে এসে পথনাটক লেখার অনুপ্রেরণা পান এবং একাধিক পথনাটক লেখেন। তাঁর প্রথম পথনাটক ছিল 'ভোট দিন'। মজার বিষয় হল তৎকালীন শাসকদলের মস্তান কর্মীরা 'ভ' কেটে 'চ' করে দেয়। তাই 'ভোট দিন' নাটক পরিবর্তন হয়ে 'চোট দিন'-এ পরিণত হয়ে যায়। পথনাট্যকার জোছন দস্তিদার সম্পর্কে 'কিছু কথা শিরোনামে' গণনাট্য সংঘের সম্পাদক শিশির সেন লিখেছেন—

> *'শ্রী জোছন দস্তিদার সর্বসাকুল্যে কত পোস্টার নাটিকা লিখেছেন এবং সেগুলির কত অনুষ্ঠান হয়েছে সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই। সম্ভবত কেউই তা কোনোদিন বলতে পারবেন না, কারণ এ সব ঘটনার রেকর্ড আমরা কখনও রাখি না। তবে একটি বিষয় আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে বিগত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারাদেশে যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিসংগ্রাম দানা বেঁধেছে, জোছন দস্তিদার পোস্টার নাটকের হাতিয়ার নিয়ে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত জনগণের পাশে অকুতোভয়ে সামিল হয়েছেন। বিশেষত নির্বাচনের সময়ে সংগ্রামের ময়দান থেকে কখনওই তাঁকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি।'*

নাট্য সমালোচক শুক্লা ঘোষাল তাঁর গন্থে উল্লেখ করেছেন, নাট্যকার জোছন দস্তিদার ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে যে পথনাটকগুলি অভিনয় করেছেন, তার তালিকা। আমি একাধিক উৎস থেকে সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেমন- 'পান্থ জনের নাটক', সীমা সরকারের 'পথের নাটক', নৃপেন্দ্র সাহা সংকলিত 'পথনাটক গন্থপঞ্জি (১৯৩৩-৮৭ পর্যন্ত) এই শীর্ষক তালিকা থেকে। আমার কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার (নৃপেন্দ্র নাথ সাহার দেওয়া) তালিকাটি। নাট্যকার নির্দেশিত এবং পরিচালিত পথনাটকের তালিকাটি পরবর্তীতে উল্লেখ করেছি। নাট্যকার জোছন দস্তিদার মনে করতেন, পথনাটকের জন্য কোন আলাদা মঞ্চ লাগে না, যেন-তেন প্রকারণে পথনাটক অভিনীত হয়। যেখানে পথনাটক অভিনীত হয়, সেখান দিয়ে প্রচুর পথচলতি মানুষ যায়, গাড়ি-ঘোড়া যায়। এই পথচলতি মানুষ যাদের নাটক দেখার মতো কোন মানসিক প্রস্তুতি নেই, সেই অবস্থাতেই তাদের দর্শকে পরিণত করতে হবে বলে মনে করতেন নাট্যকার।

পথনাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় কৌশল পথচলতি মানুষকে থমকে দাঁড় করাবে এবং তাদের তীক্ষ্ণ বক্তব্য, অভিনয় দক্ষতা, বিষয় ভাবনা মানুষকে আকর্ষিত করবে। জোছন দস্তিদার পথনাটক এবং প্রসেনিয়াম

থিয়েটারে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরেও তিনি যাত্রা নিয়ে কাজ করেছিলেন।'ওড়াও কেতন' নামে যাত্রায় তিনি অভিনয় করেছিলেন 'রূপান্তরী' দলের হয়ে। পথনাটকের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই নাট্যকার জোছন দস্তিদার বৃহত্তর জনগণের সামনে উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন যাত্রার মাধ্যমে। যাত্রা যে গ্রামীণ অঞ্চলের একটি শক্তিশালী বিনোদন মাধ্যম, এই উপলব্ধি নাট্যযকারের ছিল। কারণ সমাজের ৬০-৭০ ভাগ মানুষ বসবাস করেন গ্রামে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, নাট্যকার জোছন দস্তিদার পেশাদারি নাটকে সেভাবে আমন্ত্রণ পাননি। পথনাটকের কর্মকাণ্ড স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলেও নাট্যকার জোছন দস্তিদার কখনও অবহেলার সঙ্গে পথনাটককে গ্রহণ করেননি। মঞ্চ নাটকের নির্দশনার জন্য যে মনোযোগ দিতেন, পথনাটক পরিচালনার ক্ষেত্রেও একইরকম মনসংযোগ দিতেন। তাঁর 'রূপান্তরী' দল নিয়ে চারটি পথনাটকের নির্দেশনা এবং অভিনয়ের পরিচয় আমরা পাই। আবার তাঁর চার্বাক নাটদল থেকে ছয়টি পথনাটক অভিনয় করার পরিচয় পাই।

জোছন দস্তিদার তাঁর নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা আড়ম্বরহীণতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। অভিনয়ের প্রকাশ ভঙ্গী এবং নাটকের বিষয় ভাবনার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর পথনাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দক্ষতা, তাদের সংলাপ উপস্থাপনার ভঙ্গিকে বহুবার চর্চার মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন অভিনয়ের জন্য। তিনি মনে করেন- 'নাট্য সাহিত্য ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম। আড়াই ঘন্টা বহু ঘটা করে সাজিয়ে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে চেষ্টা করেও আমি কি করতে চাইছি, আমি কি বলতে চাইছি, তা যদি বোঝাতে না পারা যায় তাহলে ধরে নিতে কোন অসুবিধে নেই যে এই মাধ্যমটিকে যথার্থ ব্যাবহার করা গেল না।' আসলে নাটক এমন একটি মাধ্যম, যা দেখা এবং শোনার মাধ্যমে দর্শকের চেতনার জাগরণ ঘটে। কিন্তু সেখানে যদি অভিনেতা বা অভিনেত্রী তার অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে মূল ভাবনা বোঝাতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে নাটকের কোন মূল্য থাকে না।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার মোট কতগুলি পথনাটক লিখেছেন, তিনি নিজেই তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন নি। তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্যেই তিনি পথনাটক রচনা করেননি, অনেক সময় কোন ধর্মঘট বা রাজনৈতিক আন্দোলন বা সমসাময়িক ইস্যুকভিত্তিক একাধিক পথনাটক লিখেছিলেন। শুক্লা ঘোষাল সম্পাদিত 'পান্থজনের নাটক' গন্থে আমরা যে ছটি নাটক দেখতে পাই, সেগুলি ১৯৭৭-৮৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। এই পথনাটকগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল সমকালীন শ্রমিক আন্দোলন, রাজনৈতিক ঘটনাবলী, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা ইত্যাদি। পথনাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্যকার স্পষ্টত বলেছেন—

> *'আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন কর্মী হিসেবে এই মার্কসবাদকে প্রচার করা আমার দায়। সাধারণ মানুষ খুব নন-ইনটারেস্টেড। তাদের জীবনযাত্রাকে নিয়ে তারা ব্যরস্ত। তারা কখনও ভাবতে পারে না যে তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে রাজনীতি কোথাও জড়িত। তারা ভাবতে পারে না এই ব্যপবস্থার সঙ্গে, সামাজিক ব্যোবস্থার সঙ্গে রাজনীতি কোথাও জড়িত। তারা ভাবতে পারে না যে এই ব্যস্থার সঙ্গে তারা প্রত্যোকদিন কীভাবে নির্ভরশীল। দিল্লিতে বসে যে আইন হবে, সে আইন তার ব্যাক্তিগত জীবনে যে কতটা বিড়ম্বনা নিয়ে আসে এবং এ ব্যেবস্থা চিরন্তন নয়, এটা তারা সহজে বুঝতে*

চায় না, বা বুঝতে পারে না। একজন সচেতন নাট্যকার হিসেবে, আমার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে যে আমরা ওদের কাছে যাব, ওদের বোঝাব এবং ওদের থেকে আমরা বুঝব। তাই দুটো বোঝা যদি একটা জায়গায় মিলিত করতে পারি, তাহলে নতুন একটা ভাবনার পথ উন্মোচন হতে পারে। এই চিন্তা করে প্রথম আমি পথনাটিকা শুরু করি।'

কুমীরের কান্না :

নাট্যকার জোছন দস্তিদার ১৯৭৭ সালে 'কুমীরের কান্না' পথনাটকটি রচনা করেন। এই পথনাটকটি শুরু হয়েছে শ্রমিক পরাশর, পরাশরের স্ত্রী এবং অপর একজন শ্রমিক রতনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। কারখানার মালিক ইতিমধ্যেই কারখানা লক আউটের কথা ঘোষণা করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক পরিবারে যে সংকট নেমে এসেছে নাট্যকার তারই বর্ণনা করেছেন আলোচ্যা এই পথনাটকে। নাট্যকার জোছন দস্তিদার কারখানা বন্ধ থাকলে শ্রমিকদের কি অবর্ণনীয় দুর্দশা হয়, তা 'কুমিরের কান্না' পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। মালিকের সঙ্গে শাসকদলের শ্রমিক নেতাদের গোপন বোঝাপড়া যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনভাবেই মৃত শ্রমিক পরাশরকে কেন্দ্র করে তিনটি শ্রমিক ইউনিয়নই পরাশরকে নিজের দলের শ্রমিক বলে কীভাবে দাবি করেছেন, সেই ঘটনায় এই নাটকে উল্লেখ করেছেন নাট্যকার। তৎকালীন সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে মালিকের সঙ্গে কারা বা কাদের অশুভ আঁতাত ছিল তা নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'কুমিরের কান্না' নাটকের মধ্যে দিয়ে অবর্ণনীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। এই পথনাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, আনন্দ, অনিল, বিজয় - তিনজনই একজন মৃত শ্রমিকের দেহ নিয়ে নিজের নিজের মতো করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে আগহী। এইরকম চিত্র আমরা চিররঞ্জন দাসের 'ষড়যন্ত্র' নাটকের মধ্যে দেখতে পাই। মৃত্যুর আগে একমুঠো অন্নের জন্য ননীবালাকে সকল নেতার দুয়ার থেকেই ফিরে আসতে হয়েছে। অথচ পরাশরের মৃত্যুর পর তার দেহ নিয়ে তাদের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য সকল শ্রমিক নেতৃত্বই ননীবালার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে। মৃত শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর নামে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে শ্রমিক দলের নেতারা—

*'**বিজয় :** (রেগে) টাকা দিয়েছে।*

***ননীবালা :** হ্যাঁ।আমি নেব না তবুও জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিল।*

***বিজয় :** এই তো এই তো ওদের স্বরূপ। মালিকের কাছ থেকে দু'হাতে টাকানিচ্ছে, আর দু'হাতে সেই টাকা উড়িয়ে নিজেদের দলে লোক টানার চেষ্টা করছে।কত টাকা-কত টাকা দিয়েছে?*

***রতন :** বউদি কত টাকা দিয়েছে। (কাছে গিয়ে) আনন্দবাবু দুশো, অনিলবাবু চারশো।*

***বিজয় :** এতেই ওরা এত ভালো লোক হয়ে গেল যদিও আমাদের পার্টি মালিকের কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে কোনও টাকা পায়না। তাতে কি আমাদের টাকা দেবে সচেতন জনতা, সংগ্রামী-শ্রমিক। এই নাও আমি তোমাকে ছ'শো টাকা দিলাম। শোন আনন্দ, অনিল তোমরা পরাশরের সংগ্রামী দেহটা কিনতে চাইছ, কিন্তু আমি তা ছুঁতে দেব না। রতন তুমি তৈরী থেকো সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণিকে মিছিল করে ওখানে নিয়ে আসছি।'*

নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'কুমিরের কান্না' পথনাটকের শেষ প্রান্তে এসে দেখিয়েছেন, তিনটি শ্রমিক সমিতির নেতাই মৃত শ্রমিক পরাশরের দেহ ভাগের পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পথনাটকটির নামকরণও যথার্থ সার্থক বলে মনে হয়। কারণ এখানে সব শ্রমিক নেতৃত্বই নিজেদের শ্রমিকদরদী নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে এবং পরাশরের মৃত্যুতে মিথ্যা শোকের অভিনয় করে গেছে। তারা নিজেদের শোকসভায় পরাশরের মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করতে থাকলে একসময় দেখা যায় মৃত পরাশর উঠে বসেছে। তিনজন শ্রমিক নেতাই চমকে উঠে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি মরলে আবার উঠলে?' তার উত্তরে পরাশর জানায়- 'মরতে আমার ভালো লাগল না'। এ- কথা শুনে শ্রমিকনেতারা জানায় তাদের শোকসভা করতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, তাই পরাশরকে মরতেই হবে।

আমরা ভুলিনি :

১৯৭১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাট্যকার জোছন দস্তিদার রচনা করেন 'আমরা ভুলিনি' পথনাটকটি। নাট্যকার তৎকালীন সময়ে কংগ্রেসী নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফল হিসাবে তরুণ যুবক ইয়াকুবের মৃত্যু হয়েছে কীভাবে, তার উল্লেখ করেছেন এই পথনাটকে। জোছন দস্তিদার 'আমরা ভুলিনি' পথনাটকটি শুরু করেছেন কংগ্রেসী নেতা গোবিন্দ এবং কংগ্রেসী কর্মী নেপালের সংলাপের মধ্যে দিয়ে। গোবিন্দ এবং নেপালের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয় গোবিন্দর দল কংগ্রেস থেকে মানুষ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। এ বিষয়ে নেপাল গোবিন্দকে একাধিকবার সচেতন করলেও গোবিন্দ কর্ণপাত করেননি। সামনে নির্বাচন আসায় গোবিন্দ এবং নেপাল ভোট প্রচারের প্রস্তুতি নিতেই নেপাল দলের দুর্বলতার দিকগুলি প্রকাশ করে।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে গোবিন্দ এবং নেপাল নির্বাচন কৌশল ঠিক করছে। নেপাল একাধিকবার উল্লেখ করে যে, নিরীহ মানুষকে তাদের জমানায় কীভাবে এলাকা ছাড়া করেছে, নেপাল জানায় তারা এক ফুঁয়ে সব বামপন্থী ফাঁকা করে দিয়েছে, অনেক সাধারণ লোককেও ঘরছাড়া করেছে। নির্বাচনের সময়ই গোবিন্দর মতো নেতাদের নেপালরা কাছে পায়। নির্বাচন ছাড়া গোবিন্দদের সাক্ষাৎ মেলে না। তাই নেপাল অনেকদিন পর গোবিন্দকে কাছে পেয়ে তার ক্ষোভ, অভিমান এবং বিগত দিনে নিজেদের কুকর্মের কথা বলে পেট খোলসা করতে চায়। কংগ্রেসী প্রার্থী গোবিন্দর সাধারণ মানুষের কথা তো বহুদূরে, নিজেদের একনিষ্ঠ কর্মী নেপালের কথা শোনার মতো ধৈর্য বা সময়ও তাদের থাকে না। নাট্যকার জোছন দস্তিদার ১৯৭৯ সালে এই পথনাটকটি লিখলেও পূর্বেকার কংগ্রেস শাসিত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এর জমানার কালো দিনগুলির কথা কংগ্রেস কর্মী নেপালের মুখে তুলে ধরেছেন—

> *'**নেপাল :** এতো ফাঁকা করে দিলাম যে পাড়ায় মানুষ বলে আর কেউ রইল না। শালা এগিয়ে গেলাম কিন্তু পিছে তাকিয়ে দেখি কিছু বুড়ো কিছু কুচো ব্য স। তারপর মাইরি গোবিন্দদা পাড়ায় আমরা কেউ ঢুকলে সবাই ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিত।'*

এই পথনাটকে দেখা যায় ভোটপ্রার্থী গোবিন্দ এবং কংগ্রেস কর্মী নেপাল মিলে পূর্ব পরিচিত কংগ্রেস কর্মী মোতায়েব সাহেবের প্রসঙ্গ আসতেই নেপাল জানায়- মোতায়েব সাহেব এখন আমাদের পার্টির কাজ করে না, সে বসে গেছে। গোবিন্দ জানায় তাকে চাগিয়ে তুলতে হবে নির্বাচন কাজে ব্যবহারের জন্য। তারা পার্টির শ্লোগান বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে ভোট প্রচার করতে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার মধ্যেই তাদের বৃদ্ধ মোতায়েবের সঙ্গে

দেখা হয়। কংগ্রেসী নেতারা যে শুধু ভোটের সময়ই মানুষের কাছে যায়, সারা বছরে তাদের কর্মসূচি ভুলে নিজেদের ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না সেই কথা জোছন দস্তিদার এই নাটকের মধ্যে দিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকারের কথা। কংগ্রেস দলের নেতারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া যে কোন পদক্ষেপই ফেলে না তা নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'আমরা ভুলিনি' নাটকের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্মশানে তাত্ত্বিক :

অভিনেতা, নাট্যকার জোছন দস্তিদারের একটি উল্লেখযোগ্য পথনাটক হল- 'শ্মশানে তাত্ত্বিক'। এই পথনাটকটি তিনি ১৯৮০ সালের সাধারণ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে রচনা করেছিলেন। এই পথনাটকটিতে দেখা যায়, একজন মৃত মানুষকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক দাদারা নানারকম তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন। একই সঙ্গে রয়েছে শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করার জন্য নানারকম দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা। এই পথনাটকে দেখা যায় মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ দাহ করা পর্যন্ত- সবকিছুতেই রয়েছে ঘুষের ব্যবস্থা, যা জীবনলালের ভাষায় 'সিস্টেম'। নাট্যকার সমকালীন রাজনৈতিক খুন, সন্ত্রাস, বেকারত্ব, রাজনৈতিক নেতাদের দল পরিবর্তন, সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক নেতাদের বোকা বানানোর কথা- সবই এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত চার্বাক দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এই নাটকটি অভিনয় করেছেন।

'শ্মশানে তাত্ত্বিক' পথনাটকটির সূচনা হয়েছে ডোম জীবনলাল এবং মৃতের পুত্র সিদ্ধেশ্বরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। যদিও সম্পূর্ণ নাটকটিতে সিদ্ধেশরকে 'ছেলে' নামেই নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন। নাটক শুরুর পরবর্তীতে রাজনৈতিক দাদাদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের নিজেদের তত্ত্বকথা মৃতদেহকে শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পথনাটকে দেখা যায় ডোম জীবনলাল ছিলেন হিন্দীভাষী মানুষ। কিন্তু অনেক দিন বাংলাতে থাকতে থাকতে তার ভাষা বিচিত্র ধরণের হয়ে গেছে।'শ্মশানে তাত্ত্বিক' নাটকটি শুরু হয়েছে জীবনলাল ও মৃত্যের ছেলের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। তাদের কথাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তির পরিবারে রোজগারের উৎস ছিলেন একমাত্র তিনি, কিন্তু খাওয়ার লোক ছিল অনেক। তাই তার শরীর খাটুনীর ধকল সইতে না পেরে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সেই মারা যান। নাটকে দেখা যায়, ছেলেটি বারবার ডোম জীবনলালকে অনুরোধ করে, তার বাবার মৃতদেহ আগে দাহ করে দেওয়ার জন্য। ছেলেটি অনেক দূর থেকে এসেছে এবং মাত্র চার জন মিলে খুব কষ্ট করে মৃতদেহ বয়ে এনেছে। তাকে অনেক দূরে যেতে হবে, দেরী হয়ে গেলে লোকসান হয়ে যাবে। জীবনলাল জানায়- 'লোকসান হবে না। ইখানে থাকলে লোকসান হবে না। মুর্দা আদমী যেয়াদা- জিন্দা আদমী কমাতী ব্যস তকলিফ কমিয়ে গিলো।' জীবনলাল জীবনে বহু মৃতদেহ প্রতিনিয়ত দাহ করতে করতে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

জীবনলালের জীবনে সঞ্চায়মান অভিজ্ঞতা বিচিত্র ধরনের। ছেলেটি তার বাবাকে আগে দাহ করার কথা বললে জীবনলাল বারবার সিস্টেমের কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে এই সিস্টেম আর কিছুই নয়, এ হল সমাজের ধনীক শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে পার্থক্যের বেড়াজাল। তাই দেখা যায়, গাড়ি করে বড়োলোকেরা মৃতদেহ সৎকার করতে এলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এমনকি, জীবনলালও বহুবার ছেলেটিকে বলেছে, সে যদি কিছু পয়সা দিতে পারে, তাহলে তার বাবার সৎকারও হয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেটির যেহেতু সামর্থ্য নেই, তাই পিতার দেহ সৎকার করতে দেরি হয়। জীবনলালকে অনুরোধ করলে, সে জানায়—

*'**জীবনলাল** : সিসটিম, মুসকিল। শ্মশানে হোনে ভি ইখানে কানুন আছে।*

খতরনাক। ঝোনঝাট (বাঁ হাতটা ওর দিকে কাঁপাতে কাঁপাতে বাড়িয়ে দেয়)

***ছেলে** : (আশ্চর্য হয়ে) হাতে কী? কী হয়েছে ভাই?*

***জীবনলাল** : কুছ না। সিসটিম। হাত ফাঁকা, ইখানে পাত্তি আসুক, ঝোনঝাট খোতম। পিছের মাল আগে আগের মাল পিছে।'*

কুশের পুতুল

নাট্যকার জোছন দস্তিদার যে সমস্ত পথনাটক রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পথনাটক হল 'কুশের পুতুল'। এই পথনাটকটি তিনি ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাককালে লিখেছিলেন। জোছন দস্তিদার তাঁর চার্বাক নাট্য দল নিয়ে সারা রাজ্যব্যাপী এই পথনাটকটি অভিনয় করেছিলেন। তিনি তাঁর 'কুশের পুতুল' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজের সুবিধাবাদী-সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ উদঘাটনে সফল ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমাজের সংঘাতের জায়গাগুলি তীব্রতর করেছিলেন শ্রমিক, কৃষক ও সমাজের সাধারণ মানুষের সামনে শাসকদলের বাস্তব চিত্র উদঘাটনের মধ্যে দিয়ে। পথচারী দর্শকের সামনে নাটকের কাহিনিগত ও বিন্যাসগত পরিবর্তনে জোছন দস্তিদারের সাফল্য অসামান্য।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'কুশের পুতুল' পথনাটকটি শুরু করেছিলেন সূত্রধরের সংলাপ বলার মধ্যে দিয়ে। এই নাটকটি পশ্চিমবঙ্গে বামশাসিত আমলে রচিত হলেও এই নাটকের কাহিনিতে সিদ্ধার্থশঙ্করের শাসনকাল এবং বাম আমলের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে। পথনাটকটির শুরুতেই সূত্রধর জানিয়েছেন, পুতুল দেবীর বাড়ির সংলগ্ন স্থান। সেখানে কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ভাষণ দেবেন। যেমন হারান, ভূপাল, নন্দ প্রমুখ। নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কংগ্রেসী নির্বাচনী জনসভার মধ্যে দিয়ে। প্রথমে কংগ্রেস কর্মী হারান, জগার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকটি শুরু হলেও পরবর্তীতে যুব নেতা নন্দ এবং ভূপাল উপস্থিত হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতির দৈন্যচিত্র নাট্যকার এই পথ নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

জগা এবং হারান কংগ্রেসকর্মী হয়েও তাদের নেতাদের বিশ্বাস করতে পারে না। কংগ্রেসের ভিতরে নিজের দলের কর্মী এবং সমর্থকদের কাছেই নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে দেখা গেছে এই পথনাটকে।'কুশের পুতুল' পথনাটকে দেখা যায়, কংগ্রেসী নির্বাচন সভায় বামফ্রন্টের এফিজি পোড়ানোই কংগ্রেস নেতাদের একমাত্র অন্যতম কর্মসূচী। মজার বিষয় হল— যে এফিজি পোড়ানো হবে, তার উচ্চারণও ঠিকঠাক করতে পারে না জগা এবং হারান। সেইজন্যে একাধিকবার তারা এফিজির পরিবর্তে কখনও রিফিউজি আবার কখনও এফিউজি উচ্চারণ করে। রাজনৈতিক প্রচার সভার তদারকি করতে যুব নেতা নন্দ ঘোষ জানাই কোনকিছুই ঠিকঠাক নেই—

*'**নন্দ** : মাইক কোথায়? ব্যা নার কোথায়? এফিজি কোথায়? পোস্টার কোথায়? লোক*

কোথায়? সভাপতি কোথায়? প্রোগ্রাম কোথায়? স্বেচ্ছাসেবক কোথায়? মাতাজীর ছবি কোথায়? তার মড়া ছেলের ছবি কোথায়? তার জ্যা ন্ত বড় ছেলের ছবি কোথায়?'

এই পথনাটকটির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের দৈন্যরদশার চিত্র দেখা যায়। মানুষ আর তাদের মিথ্যা ভাষণ শুনতে চায় না। কংগ্রেসের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশের অন্যান্য রাজ্যের মানুষও ধরে ফেলেছে।

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিতে ১৯৬৭ এবং ১৯৭৭ সালের পর একাধিক আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতায় এসেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৪৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস কেন্দ্রে একছত্র শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে। শুধুমাত্র ১৯৭৭-১৯৮০ এই তিন বছর জনতা সরকার দেশের শাসনভার পরিচালনা করেছে। পুনরায় আবার ১৯৮০-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দেশ পরিচালনা করেছে। এমতাবস্থায় দেশের অগণিত শোষিত, বঞ্চিত মানুষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক।'কুশের পুতুল' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে জোছন দস্তিদার উল্লেখ করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমূল ভূমিসংস্কার থেকে শুরু করে ১২ ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে।

রেফারির বাঁশি :

'রেফারির বাঁশি পথনাটকটি নাট্যকার, অভিনেতা জোছন দস্তিদার ১৯৮৪ সালে রচনা করেন। তৎকালীন সময়ে এই পথনাটকটি বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা জানি, ১৯৮৪ সালে আমাদের দেশের তৎকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিহত হন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে নাট্যকার জোছন দস্তিদার এই 'রেফারির বাঁশি' পথনাটকটি লিখেছিলেন। অপরদিকে এই সময় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের দুই-তিন-চার পক্ষের অভ্যন্তরীণ বিরোধও প্রবল ছিল। এই পরিস্থিতিতেই নাট্যকার এই পথনাটকটি রচনা করেন।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'রেফারির বাঁশি' পথনাটকটি শুরু করেছিলেন একজন রেফারি এবং ভাষ্যারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। খেলার মাঠে রেফারি এবং ভাষ্যকারের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। রেফারি খেলার মাঠে নিরপেক্ষ থেকে খেলা পরিচালনা করে থাকেন। যদিও এখানে রেফারির নীতি, আদর্শ বা মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। রাজনৈতিক দলের উপরের নেতৃত্বরা যা বলবেন, উনি সেই মতো কাজ করবেন। আর ভাষ্যকার খেলার মাঠের ধারাবিবরণী দিয়ে থাকেন। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, রেফারি ইন্ডিয়াকে ইন্দিরা বলছে। তার মতে- 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা। ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া।' 'রেফারির বাঁশি' পথনাটকে নাট্যকার ভাষ্যকারের মুখ দিয়ে খেলার নাম দিয়েছেন 'লোফালুফি খেলা'। আবার কখনও বলেছেন ছেলেখেলা। পথ নাটকে দেখা যায়, এটি এমন এক প্রকারের খেলা, যেটা কেউ কখনও দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে এই খেলা হল আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের খেলা। এই পথ নাটকে নাট্যকার রেফারি, ভাষ্যকার, দর্শক, ইতিহাসবিদ, কয়েকজন জনতার প্রতিনিধি এবং একজন বামপন্থী সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

পথ নাটকটি শুরুর পর পর দেখা যায় কয়েকজন কেন্দ্রীয় চরিত্র নিজেদের মধ্যে পরিচয় পর্ব সমাধা করে। এই পথনাটকে দেখা যায় নাট্যকার আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে যারা ঘোষিত হবেন, তাদের খেলোয়াড় রূপে সম্বোধন করেছেন। তাই রেফারি বারংবার বাঁশি বাজানো সত্ত্বেও কোন খেলোয়াড়কেই মাঠে নামতে দেখা যায় না। ভাষ্যাকারের ভাষায় এরকম দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল। নাট্যকার দেখিয়েছেন নির্বাচন এগিয়ে এলেও কংগ্রেসের দুই পক্ষের মতবিরোধের কারণে কোন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারছেন না। রেফারি ক্রমাগত বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন প্রার্থী মনোনয়নের জন্য। এখানে খেলা বলতে দেখা যায়, দুই পক্ষের প্রার্থী তালিকা নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে ক্রমাগত কাদা ছোড়াছুড়ি চলে। দর্শকরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এই খেলা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে মাঠে এসে বসেছিলেন। কারণ সাধারণ মানুষ জানে এইসব প্রার্থীদেরই তারা বছরের পর বছর ভোট

দিয়ে জয়ী করে আর বিনিময়ে পায় শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। স্বাভাবিকভাবেই এই লোফালুফি বা ছেলে খেলা প্রার্থী নির্বাচনের প্রহসন উপভোগ করার জন্য সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

রাজা আসছে :

নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'রাজা আসছে' পথনাটকটি লিখেছিলেন ১৯৮৬ সালে। আমরা জানি, ১৯৮৭ সালে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট প্রচার করার জন্য জোছন দস্তিদার এই পথ নাটকটি রচনা করেন। ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। যুবক প্রধানমন্ত্রী দেশের দায়িত্বভার নিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশজুড়ে নতুন মডেল স্কুল স্থাপন করা সহ একাধিক কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তবিক অর্থে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট তুলনামূলক খারাপ ফল করেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর সমগ্র দেশজুড়ে শোকের ছায়া বয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজীব গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী রূপে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে প্রচার করতে আসেন। তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। তৎকালীন সময়ে রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে এসে সাধারণ মানুষের খোঁজ খবর নিতে আসেন। বলা যেতে পারে তা একপ্রকার আগামী নির্বাচনের প্রচার করতে আসা। এইরকম পরিস্থিতিতে নাট্যকার 'রাজা আসছে' পথনাটকটি রচনা করেন।

'রাজা আসছে' পথনাটকটি শুরু হয়েছে অনুগত এবং টোপার সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এই পথনাটকে মোট ১১ টি চরিত্র রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী থেকে গ্রামবাসী, রাজ্যনেতা, কেন্দ্রীয় নেতা অনেকেই আছেন। নাট্যকার নাটকটি শুরু করেছেন সমকালীন সময়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীজী সজীবজী পশ্চিমবঙ্গে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে এই প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে। টোপা ও অনুগতর মতো কর্মী তাদের রাজা আসার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে পরিশ্রম করে সমস্ত আয়োজন করে। অবশেষে তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটে। রাজা আসে উড়োজাহাজে চড়ে, ধুলো উড়িয়ে গ্রামের পথে নামে। আজকের নির্বাচনী সভার গুরুত্ব টোপা ও অনুগত মিলে সকল দর্শক ও গ্রামবাসীদের বোঝাতে থাকেন।

নাটকে দেখা যায়, রাজার পশ্চিমবঙ্গে আসার মূল কারণ বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় এই রাজ্যের মানুষ কতটা খারাপ আছে, তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জেনে নেওয়া ও সেই সম্পর্কে ভাষণ দেওয়া। অনুগত ও টোপার মতো সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর মনে অজস্র স্বপ্ন তৈরি হয়, তাদের কল্যাণে প্রভুজী অনেক কিছু করবেন এই ভেবে। কিন্তু নাট্যকার দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে সজীবজী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন আগামী নির্বাচনের জন্য ভোট প্রচার করতে। আগামী নির্বাচনে জনমানসে কংগ্রেসদের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য। শুধুমাত্র ভোটের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য সজীবজী পশ্চিমবঙ্গে পদার্পণ করেছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গত নয় বছরে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট আস্থা এবং ভরসা অর্জন করেছে। এই সরকার বারো ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যস্থা চালু করেছে, আমূল ভূমিসংস্কার করেছে এবং গ্রামাঞ্চলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে বিভ্রান্তিসৃষ্টি করার জন্য প্রভু সজীবজী বাংলায় আসছেন। সজীবজী সরাসরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাদের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার আজীবন মেহনতি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন, একথা বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকার এবং তাঁর সমসাময়িক সময়ের অনেকেই উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশের শ্রেণিসংগ্রাম দানা বাঁধতে জোছন দস্তিদারের পথনাটকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পথনাটক অভিনয় করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। বিভিন্ন নির্বাচনে জোছন দস্তিদারকে কখনওই দূরে সরে থাকতে দেখা যায় নি। বিভিন্ন নাট্যসমালোচক মনে করেন, পথনাটকের প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়। কিন্তু নাট্যকার জোছন দস্তিদার মনে করতেন, এই ভাবনা ঠিক নয়। কারণ সারাবছর এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের এবং দেশে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনাকে সবসময়ই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করে জনগণের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ পথনাটক রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা প্রচার করার একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। নাট্যকার জোছন দস্তিদার বামপন্থী লড়াই সংগ্রামের সঙ্গে সারাজীবন ধরে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের নানা রাজনৈতিক ওঠা-নামার সাক্ষী ছিলেন নাট্যকার জোছন দস্তিদার। প্রায় ৬৫ বছরের জীবনে নাট্যকার জোছন দস্তিদার একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একাধিক পথনাটকও লিখেছিলেন। ১৯৭৭ সালের পূর্বে চারটি পথনাটকের কথা পশ্চিমবঙ্গ নাট্যর আকাদেমির বইতে উল্লেখ আছে। পরবর্তী সময়ে শুক্লা ঘোষাল জোছন দস্তিদারের ১৯৭৭-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ছয়টি পথনাটক গণনাট্য প্রকাশনী, ৬৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯ থেকে 'পান্থজনের নাটক' নামে প্রকাশ করেছিলেন।

নাট্যকার জোছন দস্তিদারের পথনাটকগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, 'কুমিরের কান্না', 'আমরা ভুলিনি', 'কুশের পুতুল', 'শ্মশানে তাত্ত্বিক', 'রেফারির বাঁশি', 'রাজা আসছে' এই পথনাটকগুলির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গণসংগ্রামের নানা চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথমেই পথনাটকগুলিতে আমরা দেখতে পাই, সমকালের নানা চিত্র উঠে এসেছে বিভিন্নভাবে। নাট্যকার জোছন দস্তিদার তাঁর উল্লেখযোগ্য পথনাটকগুলিতে সমকালীন দেশ, সমাজ, শাসকদলের ভূমিকা, শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ সমস্যা ইত্যাদি অসাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন। সেই দিক দিয়ে সমকালের পথে তাঁর আবির্ভাব দর্শক এবং পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এই দিক থেকে সমকালীন পথনাট্যকারদের মধ্যে জোছন দস্তিদার একজন স্মরণীয় পথনাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'কুমিরের কান্না' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে সমকালীন শ্রমিকদের জীবন, যন্ত্রণা এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন নেতাদের কার্যকলাপ দর্শকদের সামনে অভাবনীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। আবার, আমরা দেখি, 'আমরা ভুলিনি' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন, তৎকালীন শাসকদল অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতা তথা এম.এল.এ রতন কীভাবে গরিব মানুষের সন্তান ইয়াকুবকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। পথ নাটকে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত ইয়াকুবের মৃত্যু হয়েছে, যে কিনা এক সময় রতনের হয়েই ভোট প্রচার করত। নাট্যকার দেখিয়েছেন, জনগণ নির্বাচনের আগে কংগ্রেসী নেতাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের কথা ভুলতে পারেনি। 'শ্মশানে তাত্ত্বিক' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার জোছন দস্তিদার উল্লেখ করেছেন, কংগ্রেসী নেতারা ভোটের সময় জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা মৃত মানুষের কাছেই তাদের কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

জোছন দস্তিদার তাঁর 'কুশের পুতুল' পথনাটকে বামফ্রন্টের কুশের পুতুল পোড়ানোর মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের ভোট প্রচার করার উদ্দেশ্যকে বানচাল করার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই নাটকে দেখা যায়

কুশের পুতুলটি ছিল জীবন্ত। এই কুশের পুতুলের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেন নি তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। 'রেফারির বাঁশি' পথনাটকটির মধ্যে দিয়েও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সজীবজীর অপদার্থতাকে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। আবার প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক দল, উপদলের কাহিনিও এই পথ নাটকে বর্ণিত হয়েছে। এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার প্রদেশ কংগ্রেসী নেতাদের প্রার্থী তালিকা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই উঠে এসেছে।

নাট্যকার জোছন দস্তিদার 'রাজা আসছে' এই পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মুন্সীর কার্যকলাপ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সজীবজীর মিথ্যা ভাষণ ও প্রতিশ্রুতির কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে উঠে এসেছে। আবার একই সঙ্গে কংগ্রেসী নেতারা রাজ্যা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপপ্রচার করেছে, তারও উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণ মানুষ আর খুব সহজেই কংগ্রেসী নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে নরম হয়ে যায় নি। নাট্যকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে বামফ্রন্টের সাফল্যের নানা দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন- ভূমি সংস্কার, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাসহ নানা কিছুর কথা বলেছেন। নাট্যকার জোছন দস্তিদারের 'রাজা আসছে' এই পথনাটকটি তৎকালীন সময়ে জনমানসের মনে গভীরভাবে সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-৬

পথনাট্যকার : চিররঞ্জন দাস

নাট্যকার চিররঞ্জন দাস দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নাটক লিখেছেন। তিনি শুধু নাট্যকারই ছিলেন না, নাট্যপরিচালক, অভিনেতা গণনাট্য আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী এবং দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গণের কথা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গণনাট্য সংঘের মূল লক্ষ্যই হল জনগণের মুক্তি। অর্থনৈতিক সুবিচার ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন সমাজতান্ত্রিক কর্মী এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো ভারতেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তত্ত্বগত এবং কর্ম প্রণালীতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। শিল্প ও সাহিত্যের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একাধিকবার মতবিরোধ দেখা গিয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অথবা মানবতাবাদ, কোন মতবাদ শিল্প-সাহিত্যজকে নিয়ন্ত্রণ করবে? শিল্প-সাহিত্য কী প্রচারধর্মী হবে, না, প্রচারকে গৌণ রেখে শিল্পের স্বার্থকতাকে দেখবে? এই ধরণের বিতর্ক ও সংশয় সমাজতান্ত্রিক শিবিরে পরিলক্ষিত করা গেছে।

অন্যান্য অনেক নাটককারের মতো চিররঞ্জন দাসও চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জনগণের মুক্তি সংগ্রামী চেতনার বলিষ্ঠ রূপ তাঁর নাটকের সর্বত্র পরিলক্ষিত করা যায়। আমরা জানি, কমিউনিস্ট আন্দোলন কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বের সকল দেশের শ্রমিক-কৃষকদের মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত। সেইজন্য এই মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত। চিররঞ্জন দাসের নাটকের ঘটনাস্থল দেশের পরিচিত মানুষ এবং পটভূমি যেমন রয়েছে, তেমনি বিদেশের পটভূমিতেও তাঁর লেখা পথ নাটক আমরা দেখতে পাই। নাট্যকার পানু পাল যেমন স্তালিনকে নিয়ে নাটক লিখেছেন, তেমনি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী জুলিয়াস ফুচিক নিয়ে নাটক লিখেছেন নাট্যকার চিররঞ্জন দাস। নাট্যকার আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের নিপীড়ন, কালো মানুষদের উপর অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে 'পশ্চিম স্বর্গ', বর্ণ বিদ্বেষের পটভূমিতে নিগোদের নিয়ে লিখেছেন 'মৃত্যুদহীন', ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে লিখেছেন 'ভিয়েতনাম' নাটক। আলোচ্য অংশে এখানে উল্লেখ্য, নির্বাচিত গণতন্ত্রের শত্রুরা একসময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের প্রকৃতি মূলত এবং তাদের প্রতি গণ প্রতিরোধের রূপও প্রায় একই ধরণের। আমরা কোথাও দেখি, হিটলার

বাহিনী, কোথাও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, কোথাও শ্বেতাঙ্গদের বর্ণ বিদ্বেষ আবার কোথাও জমিদারি শোষণ। এদের চেহারা ভূমি বিশেষে আলাদা হলেও সব ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শত্রু প্রত্যেকেই।

চিররঞ্জন দাসের নাটকে জনগণের মুক্তির জন্য যে লড়াই, তা বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি, শোক-দুঃখ ভুলে শোষিত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের দৃঢ় প্রত্যয়, কঠিন সংকল্প, দ্বীপ্ত ঘোষণা এবং অপ্রতিরোধ্য অভিযান প্রায় সব নাটকেই দেখা গিয়েছে। নাটককারের বিভিন্ন নাটকে লড়াই এবং সংগ্রামের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস তাঁর নাটকের মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও চিহ্নিত শ্রেণি শত্রুর বিরুদ্ধে দীপ্ত কণ্ঠে লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন। আবার এ কথা অনস্বীকার্য নাট্যকার চিররঞ্জন দাস তাঁর নাটকে জনগণের আন্দোলন এবং প্রতিরোধ দেখালেও ব্যক্তিগত হত্যা এবং সন্ত্রাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। নাট্যকার বিশ্বাস করতেন, অত্যাচারীকে হত্যা করলে অত্যাচারের সমাধা হয় না, যদি না অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত না করা যায়। সম্মিলিত লড়াই, সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সামগ্রিক ব্যস্থার পতন ঘটানো সম্ভব। নাট্যকার চিররলঞ্জন দাস তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিমুক্তির কথা বলেছেন। সেইজন্য তাঁর নাটকে ব্যক্তি জীবনের আবেগ, প্রবৃত্তি খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, 'সমুদ্রের স্বাদ' এবং 'ক্রীতদাস' নাটকে ব্যক্তি জীবনের আবেগ, প্রেম ভালোবাসার কথা নাট্যকার উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের উদ্দেশ্য মূলক ও প্রচার ধর্মী নাটকগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছে। আবার নাট্যকার বেশ কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকও লিখেছেন। চিররঞ্জন দাস সব থেকে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন, পূর্ণাঙ্গ নাটক ও পথনাটক রচনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটকের কাহিনিগুলিতে পটভূমির বিস্তৃতি, দলবদ্ধ ও শোষিত মানুষের অভ্যুত্থান এবং সংগ্রাম দ্রুত বেগে চমকপ্রদ গতিতে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে ঘনীভূত উৎকণ্ঠা এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সৃষ্টি করে তীব্র বেগে নাটকের কাহিনিকে অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যান। 'ফেরার', 'পালাবদল', 'ক্রীতদাস' প্রভৃতি নাটকগুলি দর্শকদের মধ্যে শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি করে, সেই উত্তেজনাকে আবার কখনও কখনও চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। কথোপকথনের রীতিকে আশ্রয় করেও যে নাট্যরস সৃষ্টি করা যায়, চিররঞ্জন দাস তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই 'জুলিয়াস ফুচকি' নাটকের মধ্যে দিয়ে। কল-কারখানার শ্রমিক এবং গ্রামবাংলার কৃষক উভয় শ্রেণির সংগ্রামই তার নাটকগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। নাটককারের দৃষ্টি সঞ্চারিত হয়েছে গ্রামবাংলার শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মধ্যে। তাঁর নাটকের মধ্যে গ্রামের মানুষের প্রাণের ইচ্ছা এবং মুখের ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্রীতদাস' বা 'পালাবদল' নাটকগুলি পড়ার সময় আমাদের মনে হয়, নাট্যকার সংগ্রামী কৃষক সমাজ ও ভাগ্যহীন মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। 'জুলিয়াস ফুচিক' নাটকে নায়ক বন্দীশালায় বন্দী এবং অবশেষে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত হয়েছে। চেকোশ্লোভিয়ার বিপ্লবী বীর জুলিয়াস ফুচিকের জীবনের শেষ কয়েকটি দিন অবলম্বনে চিররঞ্জন দাস পথ নাটকটি রচনা করেছিলেন। শত প্রকার নৃশংস অত্যাচারের মধ্যেও একটি বিপ্লবী প্রত্যয় যে মৃত্যু জয় করে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পারে, ফুচিকের জীবনে আমরা তার পরিচয় পাই। ফুচিকের সঙ্গে বন্দীশালায় নানারকম লোক দেখা করতে আসতেন। শাসকের নির্মম অত্যাচারে বিধ্বস্ত বিপ্লবী, বিশ্বাসঘাতক অতি বিপ্লবী, দ্বিধাগস্থ হিটলারি সৈনিক, গেস্টাপো বাহিনীর নারকীয়

প্রতিনিধি এবং অবশেষে দেখা করেছে জুলিয়াসের প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী। তাদের সঙ্গে জুলিয়াস ফুচিকের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে হিটলারি বাহিনীর বর্বরতা, চেকোশ্লোভিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন, জনসংগ্রাম ইত্যাদির চিত্র পাওয়া যায়। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস কথার পর কথা সাজিয়ে বেগবান পথনাটক সৃষ্টি করেছেন। এই পথনাটক সৃষ্টিতে নাটককারের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

তাঁর রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, আবার কিছু লেখা অপ্রকাশিত থেকে গেছে। সাহিত্য রচনায় নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নাট্যকার চিররঞ্জন দাস। তিনি একের পর এক নাটক উপহার দিয়েছেন পত্রিকায় লিখে এবং পাঠকদের কাছে। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস একাধিক পথনাটক রচনা করেছিলেন। যদিও বেশ কয়েকটি নাটক নিয়ে বিতর্ক আছে, সেগুলি পথনাটক না কি পূর্ণাঙ্গ নাটক না কি একাঙ্ক নাটক? বিভিন্ন নাট্যসমালোচক ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার ২০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮, মে-জুন সংখ্যায় সমালোচক পরিমল ঘোষ চিররঞ্জন দাসের পথনাটিকার একটি তালিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন —

নাটকের নাম	**মুদ্রণ বছর ও পত্রিকা**
পদক্ষেপ	১৯৬৬, গণনাট্য
জনতার বিচারে	১৯৬৮, গণনাট্য
কম্বোডিয়া	১৯৭১, গণনাট্য
পথে নামার সময়	১৯৭১, গণনাট্য
সময়ের ঘুড়ি	১৯৭২, অভিনয়
দাবার ঘুঁটি	১৯৭২, শলাকা
অসংলগ্ন সংলাপ	১৯৭৩, অভিনয়
আক্রান্ত নাটকের মহড়া	১৯৭৪, অভিনয়
আমিনা কাহিনি	১৯৭৫, অভিনয়
এসমাগলার	১৯৭৭, অভিনয়
দুশমন	১৯৮১, রূপান্তর
বাস্তুঘুঘুর নক্সা	১৯৮৩, পশ্চিমবঙ্গ, গণনাট্য সংঘ
রাজা-প্রজার কড়চা	১৯৮৭, নন্দন
যুদ্ধ শুরু আজ	১৯৯০, গ্রুপ থিয়েটার
শয়তানের হাত	অমুদ্রিত
বাধা আর মানব মা	অমুদ্রিত
সমুদ্রের ঢেউ	অমুদ্রিত
হোঁসিয়ার	অমুদ্রিত

এছাড়াও তাঁর অন্যান্য পথনাটকগুলি হল — 'ষড়যন্ত্র', 'সন্ত্রাস', 'পালাবদল', 'মৃত্যুহীন', 'ভিয়েতনাম', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'তুমি আমি সবাই' প্রভৃতি।

অভ্যুত্থান :

চিররঞ্জন দাস 'অভ্যুত্থান' নাটকে শ্রমিকদের সংগ্রামরত শ্রেণি চেতনার উন্মেষ, এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রতিও শ্রমিকদের একাত্মবোধের জাগরণ ঘটিয়েছেন। চিররঞ্জন দাস দমদম থাকার সুবাদে হিরোজ ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রণতি টেক্সটাইল, রুবি পেইন্টস প্রভৃতি কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে লাল ঝান্ডার আত্মবন্ধনে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করেছেন। এই শোষিত শ্রমিকদের নিয়েই নাটক লেখায় ব্রতী হন তিনি। যাদের জন্য নাটক তাদের চেতনার জাগরণ ঘটানোই নাট্যকারের মূল লক্ষ্য। শ্রেণি সচেতন নাট্যকার চিররঞ্জন দাস মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এলেও শ্রমিক দরদী হতে কখনও মধ্যবিত্ত মন বাধা সৃষ্টি করেনি। বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকেরা চিররঞ্জন দাসকে তাদের আপনজন হিসেবে পরিগণিত করতেন। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস বিংশ শতাব্দীর ছ'য়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে নাটক লিখতে শুরু করেন। এই সময়ে নাটকের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে চেতনা বিকশিত হয়েছে দ্রুত গতিতে। যার ফলে বিভিন্ন নাট্যকার তাদের নাটকের মধ্যে শিল্পবোধ এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ছড়াতে লাগলেন। এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা তরুণ সেনগুপ্ত ও সুনীল সেন বিভিন্ন উপাদান নিয়ে চিররঞ্জন দাসকে নাটক লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন। তারই ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালে চিররঞ্জন দাস 'অভ্যুত্থান' নাটক রচনা করেন।

তুমি আমি সবাই :

নাট্যকার চিররঞ্জন দাস পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশাপাশি অসংখ্য পথনাটক রচনা করেছিলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু একাঙ্ক নাটকও পরবর্তী সময়ে পথে অভিনীত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সেগুলি পথনাটক নামে অভিহিত হয়েছে। চিররঞ্জন দাসের 'তুমি আমি সবাই' পথনাটকটি তৎকালীন সময়ে শিক্ষিত বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে রচিত। ভারতের স্বাধীনতার তিরিশ বছর পেরিয়ে এসেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতে দারিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর পাশাপাশি রাজনৈতিক হানাহানি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা যে কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, তার বীভৎস রূপ আমরা দেখতে পাই চিররঞ্জন দাসের 'তুমি আমি সবাই' নাটকে। নাটকটি শুরু হয়েছে বিজয় নামে একটি যুবকের আত্মহত্যার কাহিনির মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক নেতা রজনীর চোখ রাঙানোকে অগ্রাহ্য করে, নিজের প্রাপ্য চাকরিতে যোগ না দিয়ে সাতাশ জন ধর্মঘটী শ্রমিক মজুরের পাশে দাঁড়িয়েছে বিজয়। বি.এ পাশ করা ২২ বছরের বেকার যুবক বিজয় দত্ত একটি চাকরির জন্য চেষ্টা করেও কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। কিন্তু একদিন সকালে হঠাৎই তার বন্ধু বিমল এসে জানায় পাড়ার নেতা রজনীদা বি.এ পাশ করা বেকারদের চাকরি দেবে, তাই কাল সকালে একবার সেখানে গেলেই চাকরি হয়ে যাবে। জলে ডুবে যাওয়ার সময় মানুষ যেমন হাতের কাছে যেটুকু খড়কুটো পায়, তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, তেমনি বিজয়ও ভেবেছিল বোধহয় তার জীবনে সুদিন আসবে। আমরা জানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, জীবিকা— এইসব মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এই নাটকে দেখা যায়, শাসক দলের নেতা রজনী

সে যেন সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু বিজয়ের এই ভুল ভেঙে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার মনে পড়ে যায়, রজনীর রোজনামচার নানা কুৎসিত ঘটনা।

শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত শোষণ করা মালিকশ্রেণির অন্যতম কাজ। এই নাটকের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারখানার মালিক ২৭ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে তাদের জায়গায় বিমল এবং বিজয়কে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে চাইলে, বিমল চাকরি গ্রহণ করে, কিন্তু বিজয় এই চাকরি গ্রহণ করে না। বিজয় মনে করে ২৭ জনের চাকরি বরখাস্তের মধ্যে দিয়ে নিজের চাকরি গ্রহণ করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। বিমলের মতো যুবকেরা নেতাদের কাছে এবং মালিকের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও বিজয় আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক নয়। বিজয় নিজের বিবেকবোধ বিসর্জন দেয়নি। বিজয় সাময়িকভাবে চাকরিতে যোগ দিলেও নিজের কাছে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছে। বিজয় শ্রমিকদের সামনে উল্লেখ করেছে, আমি এই চাকরি নেবো না। আমার উপায় নেই - আমার বিবেক আমাকে জানিয়েছে, আমি বেইমানি করতে পারবো না। বিজয়ের মধ্যে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করলেও নিজের বিবেক বোধের তাড়নায় নিজেই শ্রমিকদের সামনে শ্রমিক নেতার চক্রান্তের কথা প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন। পরবর্তীতে যার মূল্যে দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। বিজয়ের বিবেকবোধ, চেতনার অবসান ঘটে যায় রজনীর পোষা গুন্ডাদের হাতে নিহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে। নাট্যকার খুব সুন্দরভাবেই দেখিয়েছেন, বিজয় শারীরিক ভাবে নিহত হলেও তার বিবেক, চেতনা, মূল্যবোধের কোন মৃত্যু হয়নি। নাট্যকার এই পথনাটকে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মালিকের অশুভ যোগাযোগ শ্রমিকদের ক্ষতি করে তার উল্লেখ করেছেন এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস এই নাটকে বিজয়কে হেরে যেতে দেননি। বিজয়কে বাঁচিয়ে রেখেছেন অগণিত শ্রমিকদের মধ্যে।

মৃত্যুহীন :

নাট্যকার চিররঞ্জন দাস আন্তর্জাতিক প্রেক্ষপটকে কেন্দ্র করে একাধিক নাটক লিখেছেন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শোষণ, নিপীড়ন, সাম্রাজ্যাবাদী আগ্রাসন প্রভৃতি বিষয় তাঁর পথ নাটকের মধ্যে উঠে এসেছে। এইরকম ভাবনা থেকেই আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে লিখেছেন 'মৃত্যুহীন' পথ নাটকটি। চিররঞ্জন দাসের পথনাটক রচনার ক্ষেত্র পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই, তাঁর নাটক রচনার ক্ষেত্রে কখনও প্লটের অভাব ঘটেনি। তাঁর পথনাটক রচনার বিষয়বস্তু রাজ্য, দেশের সীমানা অতিক্রান্ত করে আন্তর্জাতিক পরিধিতেও বিস্তৃত করেছেন। আন্তর্জাতিক স্তরের একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীও তাঁর নাটকের মধ্যে উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক কাহিনি নিয়ে চিররঞ্জন দাসের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল- 'অক্টোবর বিপ্লব বা কম্বোডিয়া', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'মৃত্যুহীন', 'ভিয়েতনাম' প্রভৃতি। চিররঞ্জন দাসের আন্তর্জাতিক বিষয় ভাবনা নিয়ে নাটক রচনা, বিখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্তকেও বিস্মিত করেছিল। তাই উৎপল দত্ত চিররঞ্জন দাস সম্পর্কে বলেছিলেন—

'আন্তর্জাতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমার চাইতেও তোমার নাটক সংখ্যায় বেশি।'

আমেরিকায় কালো চামড়ার মানুষ হল নিগ্রোরা। সুদীর্ঘকাল ধরে সাদা চামড়ার আমেরিকান নিবাসীরা (শ্বেতাঙ্গরা) কালো চামড়ার মানুষদের (কৃষ্ণাঙ্গ) উপর শোষণ, নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে। বর্ণ বিদ্বেষের শিকার নিগ্রোরা আজীবনকাল ধরে লড়াই চালিয়েছে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে। আমাদের দেশেও অন্যন্যভাবে এই জাতি

বিদ্বেষ সুদীর্ঘকাল ধরে বহমান। সুদূর আমেরিকায় এই বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে নাট্যকার চিররঞ্জন দাস রচিত 'মৃত্যুহীন' পথ নাটকে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই পথনাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চিররঞ্জন দাস শুধুমাত্র দর্শকদের হৃদয় জয় করেছেন তাই নয়, বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ এবং ধিক্কার তৈরি করতে সফল হয়েছেন। নাট্যকার দেখিয়েছেন আর্দশের কখনও মৃত্যু হয় না—

> *'**লুইস :** ক্যাথরিন কেঁদনা। তুমি ফ্রান্সিস লুইসের স্ত্রী। তাকাও, মুখ তোল। আমরা সুখের জন্য বেঁচেছিলাম, তারই জন্য লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তারই জন্য হল আমার মৃত্যু। পৃথিবীর সব মানুষ জানুক আমরা লড়েছি। আমাদের লড়াইয়ের ফললাভ একদিন হবেই। আমেরিকার শোষণের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা বিরামহীন সোচ্চার আওয়াজ তুলছি। আমরা শহীদ হব ইতিহাসে, উত্তরকালের যোদ্ধাদের মুখে মুখে ছড়াবে আমাদের নাম। আবার বলছি পৃথিবীর মানুষকে, আমরা পৃথিবীকে ভালবেসেছি, দেশকে ভালবেসেছি, আমরা সাম্য চাই। সাম্যের জন্যে আমরা জীবন দান করছি। আমাদের নামের সাথে যেন অশ্রুজল জড়িয়ে না থাকে।'*

চিররঞ্জন দাসের 'মৃত্যুহীন' পথ নাটকে দেখা যায়, পিটারদের মতো কৃষ্ণাঙ্গদের হয়ে যারা কথা বলতে যায়, তাদের চিহ্নিত করা হয় কমিউনিস্ট বলে। আমরা দেখতে পাই, শ্বেতাঙ্গদের সমস্ত রকম শোষণ, নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করে পিটারের প্রতি লুইস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তার জীবনেও নেমে আসে চরমতম বিপর্যয়ের ঘনঘটা। শ্বেতাঙ্গরা মিলে লুইস-এর পরিবারকে এক ঘরে করে দেয়। লুইসের বাড়ির পরিচারিকাকেও তার বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেয় শ্বেতাঙ্গরা। এই নাটকে ভিক্টর এবং গেগরীর মতো শ্বেতাঙ্গরা পিটারকে হত্যা করার জন্য তাড়া করলে সে লুইসের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আর এই পিটারকে আশ্রয় দিতে গিয়ে লুইসের জীবনেও চরম বিপর্যয় নেমে আসে, তারা শেষ পর্যন্ত আশ্রয়দানকারী লুইসকে হত্যা করে। শ্বেতাঙ্গরা লুইসকে শুধুমাত্র হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। লুইসের স্ত্রী ক্যাথরিনের ওপর বর্বর, অমানসিক অত্যাশচার চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। নাট্যকার তাঁর পথনাটকের মধ্যে দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের এই নির্মম অত্যাচার আমাদের সামনে যথার্থ ভাবে তুলে ধরেছেন।

ভিয়েতনাম :

ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে যে সকল নাট্যকার নাটক লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যিতম হলেন চিররঞ্জন দাস। তাঁর বিখ্যাত পথনাটক হল 'ভিয়েতনাম'। এই পথনাটকটি চিররঞ্জন দাস ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছিলেন। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামবাসীদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে লেখা পথনাটক হল 'ভিয়েতনাম'। আমরা দেখতে পাই, সম্মিলিত ভিয়েতনামবাসীরা সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে কীভাবে জনগণের ঐক্যাবদ্ধ প্রতিরোধে দেশীয় শাসক এবং সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেছিল তার উল্লেখ রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য ভিয়েতনামবাসীরা হো-চি-মিনের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী, বিপ্লবী বাহিনী প্রস্তুত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে জয়ী হয়েছিল। এই মুক্তিযুদ্ধের কাহিনির মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের এক সৈন্যকর্তা রিচার্ড যুদ্ধ চাই না, মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপক্ষে লড়াইকে সমর্থন করে। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস এ প্রসঙ্গে নাটকে দেখিয়েছেন—

*'**রিচার্ড** : [ম্লান হেসে] আমার মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে যাতে*
একটি মহান কাজ করে যেতে পারি তার সুযোগ আমাকে দাও। তোমার
জীবন বহু মূল্যবান, তোমাকে আরও দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে। যাও
[নগুয়েনকে ঠেলা দেয় রিচার্ড। বাইরে থেকে রাইফেলের শব্দ ভেসে
আসে। চিৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় রিচার্ড।]
***রিচার্ড** : আঃ! আমার কর্তব্যশ আমি করেছি বন্ধুশুধু একটা কথা জেনো বন্ধু,*
আমি ভালোবাসতে চেয়েছি পৃথিবীকে, মানুষকে, মানুষের শুভ বুদ্ধিকে।
মনেপ্রাণে শোষণ বঞ্চনা থেকে মানুষের মুক্তিই আমি চেয়েছি।
[রিচার্ড কিছুটা নিস্তেজ হয়ে আসে।]
***নগুয়েন** : রিচার্ডবন্ধু।'*

এই পথনাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে নগুয়েনদের লড়াইকে নৈতিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন রিচার্ড। রিচার্ড পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। রিচার্ড সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের সৈনিক হয়েও অগণিত মানুষের শুভ বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রিচার্ড মনে করে পৃথিবীর বুক থেকে শোষণ-নিপীড়ন বন্ধ হওয়া উচিত। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে একদিন এই শোষণের অবসান ঘটবেই এই পৃথিবীতে।

'ভিয়েতনাম' পথনাটকে দেখা যায়, দক্ষিণ ভিয়েতনামের ফুকভিনে অঞ্চলে আমেরিকার সেনাবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। এই সেনাবাহিনীর দায়িত্বে থাকা দু'জন আমেরিকান সেনা কর্তা হলেন রবিনসন এবং ব্রিগস। এই দুই সেনা অফিসার মুক্তিবাহিনীকে দমন করার জন্য নগুয়েনকে গ্রেপ্তার করে। নগুয়েনের উপর দমনপীড়ন করলেও সে কোন গোপনকথা সেনাবাহিনীর কাছে বলে না। সমস্ত রকমের লোভ, লালসা, মৃত্যুর হুমকি উপেক্ষা করেছে। আমরা নাটকের মধ্যে দেখতে পাই—

*'**নগুয়েন** : আপনি ভুল করছেন। দেশের মুক্তির জন্য আমার স্ত্রী, সন্তানের*
ভবিষ্যৎ আমার কাছে নগণ্য। কাপুরুষতাকে তারা ঘৃণা করে।'

নগুয়েনের মতো বিপ্লবীদের কাছে দেশের স্বাধীনতা আগে। পরিবার, সংসার, স্ত্রী, সন্তান সবকিছুর উপরে স্থান পেয়েছে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও নগুয়েন পিছপা হয়নি। সেনাবাহিনীর কর্তা রবিনসন নিজেদের সাময়িক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট রিচার্ড ও নিগ্রো সেনা প্যাটারসনকে কটাক্ষ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। রিচার্ড নিজের চাকরির বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছে - 'যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ভিয়েতনামের জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, সেই তুলনায় আমার একটা চাকরির মূল্য অনেক তুচ্ছ।' এই মুক্তিযুদ্ধ সারা পৃথিবীর শোষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে জাগ্রত করে। ভিয়েতনামী মুক্তিবাহিনীর এই লড়াই আমাদের প্রেরণা জাগায়। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস এই পথনাটকের মধ্যে দেখিয়েছেন, ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনীর স্বপক্ষে কলকাতার রাজপথে শ্লোগান উঠেছিল - 'তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম' চিররঞ্জন দাসের এই পথনাটক তৎকালীন সময়ে জনমানসের

মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। 'ভিয়েতনাম' ছাড়াও তৎকালীন সময়ে চিররঞ্জন দাস আন্তর্জাতিক নানান প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে একাধিক পথ নাটক রচনা করেছিলেন। যেমন— 'ফিডম রোড' (১৯৭৯), 'যোসেফ স্তালিন', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'রক্তাক্ত রোমিও জুলিয়েট', 'যুদ্ধ শুরু আজ', 'পৃথিবীর জন্য', 'দেশে দেশে মৃত্যু হীন বেঞ্জামিন', 'অক্টোবর বিপ্লব বা কম্বোডিয়া' প্রভৃতি। নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের নাটক রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর নাটকের আন্তর্জাতিকতা। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার ফাঁসি দিয়েছিল বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজকে। তখন পশ্চিমবঙ্গের লেখক-শিল্পীরা প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। সেই সময় বাংলা সাহিত্যের নানা গান, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। নাট্যকার চিররঞ্জন দাসও সেই সময় দ্রুত গতিতে লিখেছিলেন নাটক 'মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন'।

আমিনা কাহিনি :

চিররঞ্জন দাস ১৯৭৫ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহেশ' ছোটগল্প অবলম্বনে অসাধারণ একটি পথনাটক রচনা করেছিলেন, তার নাম হল 'আমিনা কাহিনি', আমরা অনেকেই পথনাটক বলতে সচরাচর নির্বাচনমূলক নাটক বা রাজনৈতিক ইস্যু ভিত্তিক নাটক বুঝি। কিন্তু চিররঞ্জন দাসের এই পথনাটকটি তুলনামূলক ব্যতিক্রমী পথনাটক।'আমিনা কাহিনি' নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যলকার একাধিক প্রশ্ন দর্শকদের মনের গভীরে তৈরি করে দিয়েছেন। সেই প্রশ্নগুলি আমাদের নানাভাবে সমাজ, অর্থনীতি, বেকারত্ব, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ প্রভৃতি বিষয়কে স্পর্শ করে গেছে। গফুর জোলার আত্মযন্ত্রণা, গ্রামীণ জমিদারী শোষণ, ফুলবেড়ে চটকলের মালিকের শাসন, বস্তি জীবনের যন্ত্রণা, দু-মুঠো অন্নের জন্য গফুরের লড়াই, আমিনার ইজ্জত বাঁচানোর লড়াই ইত্যাদি নাট্যকার খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। নাটককারের এই মর্মস্পর্শী কাহিনি, অভিনেতাদের অসাধারণ অভিনয় তৎকালীন সময়ে দর্শকদের হৃদয় জয় করেছে। আমরা এই নাটকের মধ্যে দেখতে পাই, দর্শকবেশী বিবেক গফুরকে বলেন, 'তুমি খুনী!' নাটকটি প্রচলিত প্রথা ভেঙে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে শুরু হয়েছে। দর্শক বিবেকের প্রশ্ন এবং গফুরের জীবন যন্ত্রনার কাহিনি উল্লেখের মধ্যে দিয়ে নাটক এগিয়ে গেছে।

'আমিনা কাহিনি' পথনাটকটি শুরু হয়েছে গফুরকে আমিনার মৃত্যুর খুনী সাব্যনস্ত করে। তার মৃত্যুর কারণের উত্তরে গফুরের সমগ্র জীবন যন্ত্রণা, অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাস গফুর উল্লেখ করেছেন দর্শকদের সামনে- 'দর্শক বিবেক 'আলবৎ! অত্যাচারের গ্লানিতে তুমি তোমার প্রতিশোধ স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলেছ দীর্ঘদিন ধরে! তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও জগৎ সংসারের উপর! কিন্তু তুমি অক্ষম, তাই অক্ষম নিরীহ মহেশের উপর প্রতিশোধ নিয়েছ!' গফুর অগণিত দর্শকদের মধ্যে বলতে শুরু করেন তাঁর জীবনের এবং আমিনা, মহেশের উপর কীভাবে নানা প্রকার অত্যাচার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সময় নেমে এসেছিল। প্রথমেই উল্লেখ করেছেন হিন্দু গ্রামের জমিদারের শোষণ, নিপীড়নের ঘৃণ্য ছবি। কীভাবে মহেশকে আগলে রেখেছিল, গফুর তার বিবরণও দিয়েছে। গফুরের প্রশ্ন প্রকৃতির দেওয়া সম্পদে তার এবং মহেশের কোন অধিকার নেই কেন? গ্রাম্য জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়েছে মহেশকে হত্যা করতে। সন্তানাধিক ভালোবাসা ছিল তার মহেশের প্রতি, সে কথা গফুর পথ নাটকে জানিয়েছে। মহেশের শেষকৃত্যের জন্য গফুর তার জীবনের শেষ সম্বলটুকু রেখে আসে।

চিররঞ্জন দাস রচিত 'আমিনা কাহিনি' নাটকটির অভ্যন্তরে দেখতে পাই, দর্শকরূপী বিবেক গফুরকে জিজ্ঞাসা করে, আজ তুমি প্রতিশোধ নিয়েছ নিজের মেয়ে আমিনার উপর? তার উত্তরে গফুর বলে—

*'**গফুর** : তোমার নিজের সন্তান, যে অনন্ত পরমায়ু নিয়ে দুনিয়াতে এসেচে, সে যদি বেঁচে থাকার মত দু'মুঠো অন্ন না পায়, মান ইজ্জত যেতে বসে, চোখের সামনে ক্ষিদের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ায় আর তার চারপাশের লোভ-পাপের শকুন যদি তার দেহটারে ধারালো দাঁত দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে নিকেশ করতে চায়—তুমি মুখ বুজে থাকতে পারবে? বল জবাব দাও?'*

নাট্যকার পথনাটকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, কোন পরিস্থিতিতে, কেন সে মহেশ এবং আমিনার হত্যা র রহস্য উন্মোচন করেছেন। গ্রাম্য জমিদারদের অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন, জাতিগত বৈষম্য- সব কিছু মহেশকে হত্যা করতে বাধ্য করেছে। অপরদিকে নিজের মাতৃহারা কন্যা আমিনাকে নিয়ে কোন পরিস্থিতিতে গফুর কাশীপুর গ্রাম থেকে ফুলবেড়ে চটকলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন সুন্দর ভাবে, যা কিনা দর্শক হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। চটকলে কাজ নেওয়ার পর গফুর ও আমিনা বস্তি জীবনে বসবাস শুরু করে। এই জীবন ভালো না লাগলেও তারা দু'মুঠো অন্নের জন্য বেঁচে থাকার জন্য বস্তিতে থেকে যায়। একদিকে মালিকের শোষণ, নিপীড়ন, ছাঁটাই অন্যদিকে ধানকলের মালিকের ব্যভিচারিতা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি সমস্ত কিছুই গফুর এবং আমিনার জীবনে বড় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছিল। লোকলজ্জা, লোকনিন্দা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, ছাঁটাই হওয়া ইত্যাদির ভয়ে গফুর অস্থির ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বস্তিতে মদন ও গোপালের মতো লোকজন সর্বদা বিভ্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত থাকে। গফুর পরবর্তীতে আমিনার কথায় শান্ত হয় এবং বুঝতে পারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে কার ক্ষতি আর কার লাভ। সুবল সম্পর্কে গফুরের ভুল ভাঙে আমিনা বোঝানোর পরে। সমগ্র পথনাটক জুড়ে আমরা দেখতে পাই, গফুর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শাসনের শিকার। আবার কোথাও মাথা উঁচু করে সম্মান-ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে পারেনি, কারণ চটকলের মালিক এবং ধানকলের মালিকের অত্যানচার তাকে সর্বদা মাথা নুইয়ে রাখতে বাধ্যা করেছে।

আক্রান্ত নাটকের মহড়া :

নাট্যকার চিররঞ্জন দাস রচিত একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য পথনাটক হল- 'আক্রান্ত নাটকের মহড়া'। এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার তৎকালীন সময়ের নাট্যাভিনেতাদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সমাজবিরোধীদের দ্বারা নাট্যকর্মীরা প্রতিনিয়ত কীভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, তার জ্বলন্ত উদাহরণ চিররঞ্জন দাসের 'আক্রান্ত নাটকের মহড়া' নাটকটি। নাট্যকার দেখিয়েছেন, কীভাবে নাট্যকর্মীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকোচ সব কিছু উপেক্ষা করে পথনাটক এগিয়ে নিয়ে গেছে। নাটকের মধ্যে নীলমণি, শংকর, রথীন প্রত্যেক কর্মীকেই প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হয়েছে। নাটক এবং নাট্যদলকে সবসময়ই শাসক দল ভয় করে। কারণ পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যরকার শোষক শ্রেণির শাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে তীব্র ক্ষোভ ঘৃণা সঞ্চার করে। পথনাটকের মধ্যে দিয়ে জনগণকে সমবেত করা বা জনগণের মনে শোষক শ্রেণির প্রতি ঘৃণার বীজ রোপনের কাজটি শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে। আমরা দেখেছি ১৮৬০ খ্রিঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটক তৎকালীন ইংরেজ সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সময় বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার এই নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তেমনি চিররঞ্জন দাসের পথনাটক 'আক্রান্ত নাটকের মহড়া' নাটকের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ খুব সহজেই শাসকের চরিত্র অনুধাবন করতে পারে। তাই শাসকশ্রেণিও সর্বদা তার গুণ্ডাবাহিনী এবং প্রশাসনকে কাজে

লাগিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অত্যাচারিতদের সংগঠিত হতে দেয় না। নাট্যকার চিররঞ্জন দাস তাঁর পথনাটকে সমাজের নাট্যকর্মীদের করুণ চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি শাসকের অত্যাচারের কথাও উল্লেখ করেছেন। নাট্যকর্মীদের মধ্যে রাজনীতি যেমন থাকবে, তেমনি আবার তাদের সাহস, প্রতিবাদী দিকগুলিও উঠে আসবে। নাট্যকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন শাসকদলের মস্তান বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি উল্লেখ করেছেন।

সময়ের ঘড়ি :

'সময়ের ঘড়ি' চিররঞ্জন দাসের একটি উল্লেখযোগ্য পথনাটক। এই পথনাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, নাট্যকার স্বৈরাচারী শাসকের চিত্র বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। স্বৈরাচারী শাসক কীভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন, তা পথ নাটকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি, সমতলের থেকে উঁচুতে শাসক অধিপতি বিরাজ করেন। শাসকের সমতলে নামার পূর্বে সকলকেই ঘরে চলে যেতে হয়। অধিপতির কোন সমস্যা হবে, এই ভেবে সকলকে অন্ধকারেই সব কাজ শেষ করতে হয়। আলোতে একমাত্র অধিপতিই থাকবেন, আর কেউ থাকবে না। শুধু নাটক নয়, আমাদের সমাজ জীবনেও এই ধারা চিরকাল বহমান। সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং নীচুতলার সাধারণ মানুষরা এক মুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করে চিরকাল অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে। 'সময়ের ঘড়ি' পথনাটকে দেখা যায়, জলদ ঘড়ি বেজে উঠলে সকলকেই ঘরে প্রবেশ করতে হয়। জলদ ঘড়ি গভীরভাবে বেজে উঠলে সকলে উচ্ছ্বসিত প্রবাহে চলাচল করে। অধিপতির কথা মতো রক্ষকরা যে তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

এই পথনাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে, সাধারণ মানুষ কলকারখানা থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষক তাদের সতর্ক করে দেয়। স্বৈরাচারী শাসক সব সময়ই সংগঠিত জনগণকে ভয় পায়। জনমানসের ভীড় শাসকদলকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তোলে। একত্রিত জনগণ দেখলেই তাদের মনে হয়, তাদের শোষণযন্ত্রের বিরুদ্ধে হয়তো জনগণ সংগঠিত হচ্ছে। অধিপতির সান্ধ্যন ভ্রমণের ভয়ে জনগণ সূর্যের আলো পর্যন্ত দেখতে পায় না। অপরজন নামে এক সাধারণ লোক জানে, অধিপতির ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটানোর কোন অধিকার নেই তাদের। এই পথনাটকে তাদের দেখা যায়, একজন, আরেকজন, অপরজন সকলেই সূর্য ওঠার পূর্বে কারখানার কাজে যায়, আবার সূর্য ডোবার পর ফিরে আসে। এদের প্রবল ইচ্ছা একবার সূর্যকে দেখতে চায় - 'আমরা আলোর সামনাসামনি হতে ইচ্ছুক'। এই ইচ্ছা প্রকাশ করতেই রক্ষক বলেন—

> *'**খবর্দার:** কেউ কথা বলো না। চুপচাপ যে যার আস্তানায় চলে যাও। - যাও অধিপতির নির্দেশ মনে রেখো।'*

'সময়ের ঘড়ি' এই পথনাটকে দেখা যায়, অধিপতির নির্দেশ রক্ষক অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এখানে লক্ষ্য করা যায়, যুবক বা বৃদ্ধ প্রত্যেকেই জোরে জোরে পা চালিয়ে রাস্তা শেষ করে। বৃদ্ধ নিজের মতো করে চলতে চাইলে যুবক জানায়- অধিপতির আদেশ অমান্য করলে শাস্তি পেতে হবে। তার উত্তরে বৃদ্ধ জানান- 'বুকের হাতুড়ি থেমে থাকে না। 'সময়ের ঘড়ি' পথনাটকে শোষকরূপী অধিপতি যন্ত্রসভ্যতার সাহায্যে মানুষের জীবনের বিশ্রাম কমিয়ে দিয়েছেন তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সাধারণ মানুষকেও যন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' নাটকে যেমন দেখেছিলাম যন্ত্রসভ্যতার বাড়বাড়ন্ত, মানুষের

সমগ্র চেতনাকে যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা, ঠিক তেমনি এই পথনাটকেও অধিপতি সর্বদা যন্ত্রখানার মজুরদের যন্ত্রমানবে পরিণত করতে চেয়েছেন। তাই নাটকে দেখা যায়, একজন বলেন- আমাদের আলো দরকার, এইভাবে বেঁচে থাকা যায় না। আমাদের চোখে আলো প্রয়োজন। ২য় রক্ষী অপর এবং একজনকে সাবধান করে দিয়ে বলেন- অধিকারের কথা বলা যাবে না। অপর তরুণ অকপটে জানায় তার আলো চাই। অপর তরুণকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করলেও সে একই উত্তর দেয়— 'আমি অন্ধকারে আলো চাই'। আমাদের বিশ্ব প্রকৃতির এটি অধিকার। সকলের এই আলোর মধ্যে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু এই নাটকে সেই অধিকার দাবি করলেও ২য় রক্ষী তরুণকে বিদ্রোহী বলে সাব্যকস্ত করে। কিন্তু অপর তরুণ কোনভাবেই অপরাধ স্বীকার করে না। এই প্রসঙ্গে ১ম রক্ষী জানায় - 'সৃষ্টির যা নিয়ম-অন্ধকারের জীবকে অন্ধকারেই থাকতে হয়।' এর জবাবে নাটকে অপর তরুণ জানায়- 'ওটা সৃষ্টির নিয়ম নয়- ওটা তোমাদের বানানো নিয়ম।'

এস্মাগলার :

নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের আর একটি বিখ্যাত পথনাটক হল 'এস্মাগলার'। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন, কীভাবে পেটের দায়ে দু'মুঠো অন্নের জন্য সমাজের গরিব মানুষগুলি বাধ্য হয়ে স্মাগলিং করত। এই স্মাগলারদের ব্যবসাদার, কালোবাজারিরা, মজুতদাররা কীভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতেন, তার চিত্র নাট্যকার এই পথনাটকে তুলে ধরেছেন। এই 'এস্মাগলার' নাটকে নন্দু, ভজন, লখাই, গোবিন্দ, বিহারীর জীবন যন্ত্রণার কাহিনি উঠে এসেছে। আবার অপরদিকে দেখা যায়, মালিক ভগবতী সাহা, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলরা নিজ নিজ স্বার্থে এইসব সাধারণ গরিব, অসহায় মানুষের উপর অত্যাচারের চিত্র। নন্দু, ভজন, লখাই, গোবিন্দ এরা প্রত্যেকেই পেটের দায়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই স্মাগলিং-এর মতো কালোবাজারি কাজে নেমেছে। তারা বাধ্যা হয়েছে এই পেশা নির্বাচন করতে। কিন্তু এই পেশায় একবার ঢুকে গেলে এর থেকে ফেরার আর উপায় থাকে না। এই স্মাগলিং জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে নন্দুর জীবনে চরমতম বিপর্যয় নেমে আসে। এই চাল পাচারকারীদের জীবন যন্ত্রনার কাহিনিকে নাট্যকার চিররঞ্জন দাস মানবিক দিক দিয়ে বিবেচনা করে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

'এস্মাগলার' পথনাটকে দেখা যায়, নন্দু, ভজন, লখাই- এদের জীবন নির্ভর করে ডাউন বর্ধমান লোকাল প্লার্টফর্মে কখন ঢুকবে, তার উপর। এই ট্রেনে চাল কলকাতায় আসে বিভিন্ন হাত ঘুরে। এই ট্রেনের চাল নামানো ও মালিকদের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজই হল ভজন, লখাই, নন্দুদের। ট্রেন লেট হলে তারা তাস খেলে এবং জীবন জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ট্রেন চলাচলের উপরই যে তাদের জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়, তা বোঝা যায় ভজনের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে—

> *'ভজন হক কথা। হালার টেরেণ তো দুই তিন ঘন্টা লেট করেই। এ লইয়া এত ভাবনের কি আছে? জানস লখাই, জীবনে পেরথম টেরেণ চাপলাম যেবার ঢাকা থিইক্যা কইলকাতা আসি। খুব ভদ্দরলোক টেরেণ ছিল কিনা তাই মাত্তর দুইদিন চার ঘন্টা লেট ছিলমা কালীর দিব্যি কইত্যোছি।'*

ভজন, লখাই, নন্দুর আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে ভগবতী, বিহারী এবং মালিকরা প্রতিনিয়ত অন্যাভাবে তাদের কাছ থেকে কমিশন নেয় এবং তাদের দিয়ে জোর পূর্বক পরিশ্রম করিয়ে নেন। ভজন বা লখাই এরা কেউই এই কাজ অন্তর থেকে পছন্দ করে না, কিন্তু পেটের দায়ে বাধ্য হয় এইরকম নিকৃষ্টমানের কাজ করতে।

ষড়যন্ত্র :

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। তৎকালীন সময়ে এই বামফ্রন্ট সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা অপপ্রচার করেছেন। বিরোধী দলের মুখোশ খুলে দিতে তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চিররঞ্জন দাস 'ষড়যন্ত্র' পথনাটকটি রচনা করেন। পথ নাটকে দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র ফটিক প্রকৃতপক্ষে একজন খুনী আসামী। যদিও তার এই দাগী আসামীর চরিত্র গঠনে পিছনে ছিল কিছু স্বার্থান্বেষী বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা। জীবিত থাকতে ফটিককে একমুঠো অন্নের জন্য নেতাদের কথায় একের পর এক খুন, ডাকাতি করতে হয়েছে। অথচ মৃত্যুর পরে খুনী আসামী ফটিকের মৃতদেহ রাজনৈতিক নেতাদের কাছে রাতারাতি দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর লেখা নাটকগুলির মধ্যে অন্যেতম উল্লেখযোগ্য পথনাটক হল— 'ষড়যন্ত্র'। যেখানে দেখা যায় শাসকশ্রেণি কীভাবে সমাজের নীচুতলার সাধারণ মানুষের উপর অত্যাজচার, নিপীড়ন ও শোষণ করেছে। ফটিকের এই মৃত্যুাকেও বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে ঘুঁটি হিসাবে দীর্ঘদিন কাজে লাগিয়েছে।

'ষড়যন্ত্র' নাটকে আমরা দেখতে পাই, এই পথনাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফটিক একজন দাগী আসামী, গুণ্ডা পর্যায়ের লোক। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই ফটিকের শবদেহ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তর্জা লেগে যায়। মৃত্যুর আগে ফটিক গুণ্ডা থাকলেও মৃত্যুর পরে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী সে হয়ে যায় একজন দেশপ্রেমিক, সংগ্রামী, লড়াকু ব্যজক্তিত্ব। যুবনেতা কমল ফটিকের মৃত্যুতে জানাই- 'ফটিক চন্দ্রের মৃত্যু গৌরবের, দেশপ্রেমের'। এই দেশপ্রেমের জন্য প্রাণ দিয়েছেন ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন-ফটিকচন্দ্র তাঁদের সুযোগ্য উত্তরাধিকার'। রাজনৈতিক দলনেতারা সকলেই ফটিককে নিজেদের দলের কর্মী বলে দাবি করতে থাকেন। রাজনৈতিক নেতা কমল-ফটিককে অহিংস গান্ধীবাদী জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে আর এক দলনেতা সুবিনয় জানায়, ফটিক ইন্দিরাজীর জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য। আবার কোন দলনেতা জানায়, ফটিক জনতাদলের সদস্য। প্রত্যেক দলের নেতাদেরই কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্টদের নামে কালিমা লিপ্ত করা। তারা নিজেদের গণতন্ত্রের প্রতিনিধি মনে করে এবং কমিউনিস্টদের স্বৈরাচারী শাসকরূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে।

চিররঞ্জন দাসের নাটকের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের আবেগ-ভাবাবেগ প্রেম-লীলা খুব কমই লক্ষ্য করা গেছে। দু'একটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, যেমন- 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ক্রীতদাস' ইত্যাদি। নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের পথনাটক উদ্দেশ্যূলক এবং প্রচারধর্মী হলেও জনমানসে সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়াও নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের পথনাটকের কাহিনিতে যে বিস্তৃত দলবদ্ধ মানুষের অভ্যুত্থান ও লড়াইয়ের দ্রুত বেগ দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে রচিত একাধিক নাটক যেমন 'ভিয়েতনাম' 'জুলিয়াস ফুচিক', 'মৃত্যুীহীন', 'কম্বোডিয়া' প্রভৃতি মধ্যে দিয়ে নাটককারের আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ দর্শকদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। গণনাট্যের প্রতি অনেক ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখ, বেদনা চিররঞ্জন দাসের থাকলেও তিনি কখনও

গণনাট্য সংঘ ছাড়েননি, অপরদিকে গণনাট্য সংঘও চিররঞ্জন দাসকে ত্যাগ করেননি। চিররঞ্জন দাসের নিজের গড়ে তোলা নাট্যদলগঠন হল 'সীমান্তিক'। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক নৃপেন্দ্র সাহা জানিয়েছেন—

> *'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমিও চিরর মতো একজন সক্রিয় সদস্যর প্রয়াণেও কোনও স্মরণসভার আয়োজন করেছে বলে জানি না। সীমান্তিক আজ চিরকালের জন্য চিরহীন হয়ে গেল। ব্যক্তি প্রতিভা কেন্দ্রীক বহু গুপ থিয়েটারের যা দশা হয় বা হয়েছে সেই ব্যক্তিপ্রতিভার দেহাবসানে বা নিষ্ক্রিয়তায়, চিরর সীমান্তিকেরও তাই হবে আশা করি।আশা করিকথায় অনেকে দুঃখ পাবেন, কিন্তু তার লক্ষণ যে আশির দশকের শেষ থেকে আমরা অনেকে লক্ষ করেছিলাম। 'বীরাঙ্গনা'-র সাফল্যের পর থেকেই সীমান্তিকে যেন ক্ষয় রোগ ঢুকতে থাকে। দলের প্রবীণ সদস্যরা অনেকেই বসে যেতে থাকেন, সুনীল কর, মণীশ চট্টোপাধ্যায়, অলোক বাগচি, শঙ্কর চক্রবর্তী, নিমাই ভট্টাচার্য, প্রণব চক্রবর্তী, তারপর বীরাঙ্গনার প্রধান অভিনেত্রী সুনন্দা নাগ, ইনিও যখন বসে গেলেন, তখন থেকে অবশ্য বন্ধু হিসেবে আমিও ওর বাতিলের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছি।'*

সমকালীন সময়ের কোন নাট্যসমালোচক চিররঞ্জন দাসের কোন ঘাটতি বা দুর্বলতা উল্লেখ করেননি সেইভাবে, প্রথম দিকের দু-একটি নাটকের ক্ষেত্রে সাময়িক দুর্বলতা কিছু জায়গায় পরিলক্ষিত করা গেলেও পরবর্তীতে তা পাওয়া যায় নি। চিররঞ্জন দাস দুবছর আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কারণেই হয়তো তার মধ্যে একটা জাতশিল্পী ভাব লক্ষ করা যায়। চিররঞ্জন দাস ছিলেন প্রচার বিমুখ একজন শিল্পী। আমরা জানতে পারি, তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে খালেদ চৌধুরী, সুবোধ দাশগুপ্তের মতো বড় মাপের শিল্পীরাও দ্বারস্থ হতেন।

পর্যায় গ্রন্থ : ২

পথ নাটক

একক-৭

পথনাট্যকার : শিব শর্মা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত পথনাট্যকারদের হাত ধরে আধুনিক বাংলা পথনাটকের পথ চলা শুরু হয়েছিল, তারা হলেন- দয়ালকুমার, উমানাথ ভট্টাচার্য, পানু পাল, উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, চিররঞ্জন দাস, শিব শর্মা, সজল রায় চৌধুরী, বাসুদেব বসু, প্রবীর গুহ, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, হীরেন ভট্টাচার্য, বীরু মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সময়কালের পথনাট্যকারদের পথনাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - দেশ ভাগের কুফল, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সঙ্কট, কালোবাজারি, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, যুক্তফ্রন্ট গড়া ও ভাঙা, আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থা, নকশাল আন্দোলন, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, বেকার সমস্যা প্রভৃতি। বাংলা পথনাটকের উদ্ভব এবং তার বিকাশ সম্পর্কে সেই সময়কার বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

> *'পথনাটিকা রাজনৈতিক দলের শাণিত হাতিয়ার। অতি সহজে, সরকারি সাধারণ মানুষের কাছে সমাজ সমস্যা মূলক বা রাজনৈতিক বক্তব্য পৌঁছে দেবার একটি মাধ্যম। প্রযোজনার ব্য য় নেই বললেই চলে, পথের মধ্যেরই বা ছোটো চৌকির ওপর কুড়ি থেকে এক ঘন্টা সময়সীমার মধ্যেল এগুলি অভিনীত হয়।'*

অনেক নাট্যসমালোচক মনে করেন জনগণের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন থেকে বিপ্লবী সাহিত্য কর্ম রচিত হতে পারে না। কারণ সমাজের আপামর অংশ যেখানে শোষিত এবং নিপীড়িত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সেখানে আপামর জনগণের চাহিদার দিকেই শিল্পী সাহিত্যিকদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা নাটক এবং নাট্যশালা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যেই কেবল আবদ্ধ ছিল। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও নাট্যশালা সীমাবদ্ধ ছিল। গণনাট্যক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নাটক এবং অভিনয় দর্শকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে দর্শক যায় থিয়েটারে নাটক দেখতে। অপরদিকে পথনাটক নিয়ে গণনাট্য সংঘের কর্মীরা যায় দর্শকদের কাছে। নাট্যকর্মীদের কোন রকম দায়বদ্ধতা এবং শ্রেণি সচেতনতা না থাকলে এই কাজ সম্ভব হত না। নাটক আপামর জনগণের কাছে যাবে এটা একটা সময়ে কল্পনাও করা যেত না, কারণ যেখানে নাটক বিদেশী থিয়েটার থেকে সৌখিন থিয়েটার এবং তারপর পেশাদারি থিয়েটারে আবদ্ধ থেকেছে প্রায় ১৮০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে। বিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা নাটক এবং নাট্যশালা শুধুমাত্র শহরে নয়- সারা দেশে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ আপামর জনগণের কাছে পৌঁছে গেল। বিষয়টি যত সহজে আমরা ভাবতে পারি, কাজটি তত সহজ ছিল না। গণনাট্যের কর্মীসকল এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মতাদর্শের প্রতি অবিচল আস্থার ফলেই

এই কাজ সম্ভব হয়েছে। গণনাট্যের জন্মলগ্ন থেকে কর্মীদের শারীরিক ভাবে নির্যাতন এবং শাসকদলের চোখ রাঙানোকে উপেক্ষা করে এবং অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে গণনাট্য কর্মীরা নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে গণনাট্যকর্মীদের অভিনন্দন প্রাপ্য। নাট্যশহিদ সফদর হাশমি 'পথনাটক একটি পৃথক ঐতিহ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন—

> *'কোনো খোলা জায়গায় যে নাটক অভিনীত হয় তাই হলো পথনাটক - এই ব্যাপখ্যাহটি সম্পূর্ণ যুক্তি ও অর্থহীন। এ যেন নাটকের নায়কের মৃত্যু হলেই নাটককে বিয়োগান্তক বলে অভিহিত করা। পথনাটকের এই জাতীয় ব্যানখা যে শুধুমাত্র নাট্যকবিদ ও সমালোচকদেরই বিব্রত করেছে তা নয়, সাধারণ মানুষও বিচলিত হয়ে পড়েছে।পথনাটক হল আধুনিক সমাজের অন্তর্দ্বর্ন ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।'*

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন নাট্যকার হলেন সফদর হাশমি। সারা ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের মুখ ছিলেন সফদর হাশমি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর পথনাটক আছে, কোথাও অনুবাদকৃতও রয়েছে। সফদর হাশমি শুধু নাট্যকারই নয়, তিনি অভিনেতাও ছিলেন। তাঁর পথনাটক অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলে কালো পোশাক পরে নাটকে অভিনয় করে। নতুন আঙ্গিকে পথনাটকে অভিনয় তাঁর হাত ধরেই এসেছে। সফদর হাশমি বাংলাতেও পথনাটক লিখেছিলেন। রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ, মার্কসীয় ভাবনায় অটল থেকে একাধিক পথনাটক তিনি লিখেছেন। পরবর্তী অধ্যায় সেগুলি বিস্তারিত আলোচনা করব। এই জনপ্রিয় শিল্পী সফদর হাশমি তাঁর 'হল্লাবোল' নাটক অভিনয় করতে গিয়ে ১৯৮৯ সালের ১লা জানুয়ারি খুন হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের শাসকদলের গুন্ডাদের হাতে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একজন শিল্পী ও অভিনেতা প্রকাশ্য জনপথে দিবালোকে হত্যা করেছিল গুণ্ডারা। তার প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আমরা জানি তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার কথা। অপরদিকে উত্তর প্রদেশের সরকারও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বুঝতে পারি, এই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যে সরকারের শিল্পী, সাহিত্যি কদের প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞার কথা। শুধুমাত্র তাই নয়, সর্বপরি শাসক দল 'কংগ্রেস সরকার'গণ আন্দোলনকে ভয় পায়। তাদের ভাবনা এই বুঝি সংগঠিত হয়ে অত্যা চারিত, নিপীড়িত মানুষজন তাদের ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়ে দেয়। অন্যিদিকে বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব হাবিব তানবীর 'মঞ্চ আর পথের বন্ধন গড়ে উঠুক' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন—

> *'অনেকেই মনে করেন খোলামাঠে নাটক হলেই সেটা পথনাটক হয়ে গেল। সংস্কৃত নাটক, যা খোলা আকাশের নিচে অভিনীত হতো, কিম্বা কেরলে যা সব হয় সেগুলি কি পথনাটক? প্রাচীন ইউরোপের বহু নাটককেই তাহলে পথনাটক আখ্যাম দিতে হয় কারণ সেগুলি বাঁধাধরা মঞ্চে অভিনীত হতো না। না, তা হতে পারে না। মনে রাখতে হবে 'পথনাটক' একটি আধুনিক শব্দ। আজকের দিনে আজকের রাজনৈতিক সমস্যানবলী নিয়ে, পথে ঘাটে, রাস্তায় মাঠে-ময়দানে যে নাটক অভিনীত হয় শুধুমাত্র সেগুলিই পথনাটক হিসাবে বিবেচিত হবে।'*

শম্ভু মিত্রের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য আন্দোলনের বিপক্ষে নতুন নাট্য প্রবাহের সৃষ্টি হয় তবুও একথা অনস্বীকার্য তৎকালীন কংগ্রেসী সরকার তারাও গণনাট্য, আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি পছন্দ করতেন না। সরকার বিভিন্ন দিক দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করেছেন। কখনও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার উপর গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। আবার কখনও রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়মের বেড়াজালে নাটক মঞ্চস্থ হতে বাধা সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের শিল্পী-সাহিত্যিকরাও সরকারের ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন। অনেকে আবার সরকারী সাহায্যের লোভে সর্বদা তাবেদারী করতেন। কেউ বা কারা নিরবতাও পালন করেছেন সমকালীন সময়ে। একদল গণনাট্যের সমালোচক বলতে শুরু করেছিলেন যে, গণনাট্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তৎকালীন সময়ের নাট্যে সমালোচক মৃগাঙ্কশেখর রায় বলেছেন- 'পেশাদারি থিয়েটারের বাইরে যে নাট্যপ্রচেষ্টাকে নবনাট্য আন্দোলন নাম দেওয়া হয়েছে, সাধারণভাবে তার সূচনা হয়েছে গণনাট্যট সংঘের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ের পর থেকে।' নবনাট্যা সৃষ্টির তাৎপর্য ব্যাখ্যো করতে গিয়ে অন্য একজন সমালোচক বলেছেন, পেশাদারী থিয়েটারের মেকি জগৎ আর নবনাট্যয যোদ্ধাদের তৃপ্ত করতে পারছিল না এবং সাধারণ বুদ্ধিমান দর্শক সম্প্রদায়ের একাংশও পুরোনো পথে আর তাদের শিল্পবোধের রসতৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। অনেকে মনে করেন, মঞ্চ ছাড়া নাটক করা যায় না, গান বা যাত্রাও করা যায় না। পথনাটকের ভূমিকা অ্যাজিট প্রপের মতো। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে এবং মানুষের কাছে দ্রুত প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত পথনাটকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পথনাটকের গুরুত্ব যে কতখানি অপরিসীম, নাট্যকার চিররঞ্জন দাস তাঁর পথনাটকগুলির মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।'

নাট্যকার শিব শর্মার প্রকৃত নাম ছিল প্রমথেশ মজুমদার। তিনি জন্মগ্রহণ করেন অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। পরবর্তী সময়ে বি.এস.সি পাশ করে চাকরিতে নিযুক্ত হন। নাট্যপকার শিব শর্মা একাধিক নাট্য দল এবং নাট্যনপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়ার সময় থেকেই নিয়মিতভাবে নাটকে অভিনয় করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ার একটি ক্লাবে 'ইস্কাবনের বিবি' নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর নাট্যকার এবং অভিনেতা জীবনের সূচনা ঘটে। ১৯৫৬ সালে তিনি একঝাঁক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকুরিয়াতে শিল্পী পরিষদ নাট্যাদল গঠন করেন। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প অবলম্বনে শিব শর্মা 'সূর্য জাগে' নাটকটি রচনা করেছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে শিল্পী পরিষদের নাম পরিবর্তন করে 'রূপক' নামে দল পরিচালনা করেন। গণনাট্য সংগঠনের পুনর্গঠনের সময় 'রূপক' নাট্য দলটির সকলেই গণনাট্য সংঘের আদর্শে আস্থা রাখেন। নাট্যকার শিব শর্মা জীবনের শেষ প্রান্তে সাঁতরাগাছিতে কলা কেন্দ্র গঠন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গণনাট্যেরর ঢাকুরিয়া শাখাতেও নাট্যকার দীর্ঘ কয়েক বছর কাজ করেছেন। গোর্কি শতবর্ষেও নাট্যকার শিব শর্মা 'রাজাধিরাজ' নামে একাঙ্ক নাটক লেখেন এবং এই নাটকটি তৎকালীন সময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

নাট্যকার শিব শর্মা বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার পাশাপাশি একাধিক একাঙ্ক নাটক ও বেশ কিছু পথনাটক লিখেছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পথনাটকগুলি হল- 'প্রশ্ন করুণ', 'ময়লা হাত', 'অবরুদ্ধ ঝড়', 'মরা গাঙে বান', 'বুড়ো আঙুল', 'জ্যাঠামশায়ের বঙ্গদর্শন', 'ক্ষমতা', 'একটি রাজনৈতিক পরীক্ষা', 'চাবি', 'মুস্কিল আসান', 'নাটক', 'হাত', 'রক্ত থেকে জন্ম', 'আমরা নতুন', 'সমীক্ষা', 'মুরগী', 'হাতের মুঠোয় সূর্য', 'হ্যা লো লাইন কি অচল', 'ধর্মের বেশে' ইত্যাদি।

অবরুদ্ধ ঝড় :

নাট্যকার শিব শর্মা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'অবরুদ্ধ ঝড়' নামে পথনাটক রচনা করেছিলেন। নাট্যকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারের কৃত্রিমভাবে খাদ্য সঙ্কট তৈরি করা এবং কালোবাজারী মুনাফাকরদের সহায়তা করার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। শিব শর্মা ১৯৬৮ সালে তাঁর বিখ্যাত পথনাটক 'মরা গাঙে বান' রচনা করেন। এই পথনাটকটির মাধ্যমে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসনের অবসানের দিককেই উল্লেখ করেছেন। এই নাটকে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকালীন কংগ্রেসী অপশাসনের চিত্র যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনভাবেই নাট্যকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার খুশিতে আপ্লুত হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার করে মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোনারের নেতৃত্বে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই দিক দিয়ে নাট্যয়কার দেখিয়েছিলেন দীর্ঘ দিন পর মানুষের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন।

প্রশ্ন করুন :

১৯৭৭ সালে নাট্যকার লেখেন 'প্রশ্ন করুন' পথনাটকটি। নাট্যকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন ১৯৮৫-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কার্যকলাপ জনজীবনের স্বাভাবিক গতিকে কীভাবে ব্যহত করেছিল। নাট্যকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধির জন্য জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অফিসার প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নির্দেশ মতো গ্রাম পরিদর্শন করতে এলে সাধারণ মানুষ সতীশ এবং দুলাল প্রশ্নবাণে কেন্দ্রীয় অফিসারকে জর্জরিত করেছে। দুলাল এবং সতীশ একাধিক প্রশ্ন করেছেন। যেমন—

*'**দুলাল** : কিন্তু সারের দাম বাড়লে কি হয় জানেন না?*

***অফিসার** : সার খায় নাকি?*

দুলাল পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ার কথা বলুন।

***অফিসার** : পেট্রোল ডিজেলও খাচ্ছে নাকি?*

***দুলাল** : রেলের ভাড়া কত বার বাড়ছে?*

***অফিসার** : রেলের ভাড়া খাকিন্তু আপনি এ সব দামী দামী জিনিসের নাম বলছেন কেন?*

***দুলাল** : এই সব দামী জিনিসই শাকসব্জী বহন করে বলে শাকসব্জীর দামও বাড়ে। তাহলে বলুন শাকসব্জীর দাম বাড়াচ্ছে কারা? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এর জন্য দায়ী কিনা বলুন?*

***সতীশ** : দাম বাড়িয়ে সব আখের রসটুকু আপনারা যদি কেড়ে নেন, তা হলে গরীবদের জন্য শুধু ছিবড়ে পড়ে থাকে না কি?*

***দুলাল** : গরীবদের অবস্থা উন্নতি করতে হলে যা যা করা দরকার, আপনারা তা করবেন? প্রধানমন্ত্রী ত গ্রামে গ্রামে গরীবদের দেখে আকুল হয়ে উঠেছেন। গরীবদের*

কাছে কি উনি গ্যা রান্টি দিতে পারবেন যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন জিনিসের দাম বাড়বে না? তিনি কি আগামী পাঁচবছরের মধ্যে ভারতের পাঁচ কোটি বেকারের সংখ্যা কমাতে পারবেন?'

নাট্যকার 'প্রশ্ন করুন' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, যার ফলেই সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র পুঁজিপতি এবং ভূস্বামীদের জন্যেই নীতি গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ নাট্যকার তুলে ধরেছেন। সারাদেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে বিনা বিচারে অনেক সাধারণ মানুষকে গেপ্তার করে। মিশা আইন, সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের গ্রেপ্তার প্রভৃতি ঘটনা জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। আমাদের রাজ্যেগ সিদ্ধার্থ রায়ের শাসনব্যবস্থায় আধা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ জনগণের জীবনে বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জমানায় ১১০০ রাজনৈতিক কর্মী খুন, কয়েক লক্ষ কর্মী ঘরছাড়া হয়। নাট্যকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণ জনগণ যেমন সতীশ, জিতেন, দুলাল প্রমুখ প্রশ্ন করেন নানা বিষয়ে। এই নিয়ে পথনাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

রক্ত থেকে জন্ম :

নাট্যকার শিবশর্মার অপর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'রক্ত থেকে জন্ম' এই পথনাটকটি তিনি ১৯৯০ সালে রচনা করেন। এই পথনাটকটি নাট্যকার লিখেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা, পথনাট্যকার শহীদ সফদর হাশমিকে নিবেদন করে। বিখ্যাত পথনাট্যকার সফদর হাশমি 'হল্লা বোল' নাটক অভিনয় করার সময় তৎকালীন উত্তর প্রদেশের সরকারের গুন্ডাবাহিনীর হাতে খুন হয়। সফদর হাশমিকে স্মরণে রেখে নাট্যার শিব শর্মা 'রক্ত থেকে জন্ম' পথনাটকটি লিখেছিলেন। নাট্যকার শিব শর্মা এই পথনাটকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, রক্ত মাখা কলম থেকেই 'রক্ত থেকে জন্ম' পথনাটকটির সৃষ্টি হয়েছে। এই পথনাটকটি শুরু হয়েছে মজুর, বেকার এবং শংকরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণা নিয়ে মিছিল, মিটিং, সভা এবং আন্দোলন করলে শংকরদের ভালো লাগে না। শাসকগোষ্ঠী এবং শংকরেরা মিছিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সাধারণ শ্রমিকদের লড়াই সংগ্রামে বাধা দেয়। কাজের দাবিতে বেকাররা সংগ্রাম করে। এই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যকার খুব সুন্দর ভাবে এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উল্লেখ করেছেন—

*'**বেকার :** আমি এক বেকার/বুকে আমার এক রাশ যন্ত্রণা। আমার যন্ত্রণা দিয়ে অনুভব করি মজুরের বঞ্চনা/বেকারের জীবন নিয়ে শাসকেরা শুধু খেলা করে। প্রতিশ্রুতির ভস্মস্তূপ, শুধু ভস্মস্তূপ সেখানে বেকারের অশ্রু ঝরে- আমার কি অধিকার নেই চাকুরি পাওয়ারমজুরের কি অধিকার নেই বেতন চাওয়ার- (মণি ও শংকর ঢোকে। পুলিশ দাঁড়িয়ে ওদের ইশারা করে। মণি ও শংকর কাছে আসে।)*

***মণি :** এই, তুই এখানে ছিলি?'*

বেকারের জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে নাট্যকার সত্যিকারের বাস্তবচিত্র উল্লেখ করেছেন এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে। একজন বেকার যুবক নিজের জীবনের যন্ত্রণা দিয়ে একজন মজুরের জীবন যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। এই

পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন শাসকগোষ্ঠীর মস্তানরা নারীদের ধর্ষণ করতেও পিছুপা হয় না। শাসকের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে নারীরা ধর্ষিত হয়। তারা মন্ত্রীর কাছে এই ঘটনার বিচার চাইতে গেলে মন্ত্রী তাকেও ভর্ৎসনা করেন এবং যারা ধর্ষণ করেছে তাদের দেশপ্রেমিক বলে আখ্যা দেন। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার পথনাটকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন—

*'**নারী** : আমরা আপনার কথার তীব্র প্রতিবাদ করি। দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলব।*

***মন্ত্রী** : চেষ্টা কর, তার ফলটা বুঝবে।*

***নারী** : গণধর্ষণ হবে, আমরা তার প্রতিবাদও করতে পারব না?*

***মন্ত্রী** : প্রতিবাদ আমরা সহ্যব করি না।*

***নারী** : অন্যায় হলে প্রতিবাদ হবেই। প্রতিবাদ করবই।*

***মন্ত্রী** : প্রতিবাদ করবই! গেট আউট।'*

নাট্যকার পথনাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন, শাসকদলের নেতা এবং গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচারে কীভাবে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়েছে। নাট্যকার রাজা, তরুণী, নেতা, শঙ্কর, বেকার, মণি, নারী প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পথনাটকটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। সফদর হাশমির মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ জুড়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে বাধ্য হন। এই আন্দোলনে শুধু আমাদের দেশের লোকই নয়, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

জয়াদের কথা :

শিব শর্মার অপর একটি উল্লেখযোগ্যর পথনাটক 'জয়াদের কথা' এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার একটি সাধারণ পরিবারের কথা তুলে ধরেছেন। এই পথনাটকের মাধ্যমে শিব শর্মা সমাজে নারীর অবস্থান এবং দুর্বলতর জায়গা থেকে শক্তিশালীভাবে নারীদের তুলে ধরার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে লক্ষ্য করি, ব্যক্তিত্বময়ী নারীদের আত্মবর্ণনা এবং আত্মচেতনার কাহিনি। সমাজের নানা ধরনের বাধা, বিঘ্ন, প্রতিকূলতাকে দূর করে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরা কীভাবে সমাজে নিজেদের স্থান আদায় করে নিয়েছে, তার বর্ণনা করেছেন নাট্যকার। নাট্যকার 'জয়াদের কথা' নাটকে দেখিয়েছেন কীভাবে নারীরা প্রতিনিয়ত সমাজপতিদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কোন নারীর কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরতে দেরি হলে বা কেউ যদি শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে চলে আসে, তাহলেও তাকে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। গৌরী, জয়া, ঝিনুক এবং খেলার সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার আমাদের সমাজে নারীর অবস্থানটি কেমন তা তুলে ধরেছেন। নারীরা স্বাধীনভাবে থাকতে চাইলেও সামাজিক শাসন এবং নানাভাবে চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয়। নাট্যচকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন—

*'**ঝিনুক** : (জয়ার হাত ধরে) জয়াদি, আমি তোমার পাশে আছি। তুমি যা করেছ — যে ভাবে চলছ -কটা মেয়ে তা পারে? মুখ বুজে হজম করা ছাড়া মেয়েদের কিছু করার থাকে না বলেই তো জানি।*

জয়া : *বাইরে থেকে আমাদের সমাজটাকে মনে হয় কত পাল্টাচ্ছে। কত রঙীন হয়েছে। কিন্তু আমি জয়া মুখার্জি চোখে আঙুল দিয়েসবাইকে দেখিয়ে দিতে পারি কত ক্লেদ, কত অপমান এখনও টিকে আছে। আর ক্লেদ যদি থাকেই তবেপরিবর্তনের বড়াই করি কোন মুখে? আমরা বড় গলায়চিৎকার করি, পরিবর্তনের কথা বলি, অথচ দাঁড়িয়ে আছি পচা কাদার উপর।*

ঝিনুক : *জয়াদি তুমি আবার বিয়ে করো।*

জয়া : *হ্যাঁ জানি, ওই পথে গেলে আমি অনেক প্রশ্নের জ্বলন্ত বুলেট থেকে বাঁচতে পারি। কিন্তু ঝিনুক তুমি বলো, আমি যদি বিয়ে করতে ইচ্ছুক না হইতবু যদি বিয়ে করতে হয় সে তো শেষ অর্থে প্রতিকূলতার আত্মসমর্পণ করাই হল।*

ঝিনুক : *মেয়েদের নিজের ইচ্ছায় বোন সব হয় না। তাই না জয়াদি? আমার তো শরৎচন্দ্র মুখস্থ; তুমি যা বলছ সে তো শরৎচন্দ্র করে গেছেন'*

নাট্যকার শিবশর্মা এই 'জয়াদের কথা' পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে আমাদের এগিয়ে চলা মানবসভ্যতার কদর্য রূপটি তুলে ধরেছেন। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমাদের সমাজের পুরুষদের নারী সম্পর্কে রক্ষনশীল মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা থেকে সরে আসতে পারিনি। সমাজে পুরুষরা যা খুশি তাই করতে পারবে, তাদের সব অধিকার আছে অথচ নারীদের কোন অধিকার নেই এই ধারণার বিরোধিতা করেছে জয়া, ঝিনুকের মতন মেয়েরা। সামাজিক শাসন শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পুরুষদের ক্ষেত্রে কোন শাসন থাকবে না, অনুশাসন থাকবে না। নাট্যকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে এই গর্বিত সমাজের কালো দিকগুলি আমাদের সামনে উল্লেখ করেছেন। একাধিক, অজস্র প্রশ্ন নাট্যকার তুলে ধরেছেন দর্শকদের সামনে। আমাদের সমাজে যে ডিভোর্সী নারীদের স্থান কোথায় তা নাট্যকার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তবে নাট্যকার এ কথাও বলেছেন নারীরা আর পিছিয়ে থাকবে না, তারা লড়াই সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে।

সমীক্ষা :

শিব শর্মার 'সমীক্ষা' পথনাটকটি পাঠ করলে দেখা যায়, এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে লোকসভা নির্বাচনের সময় স্থায়ী সরকারের শ্লোগান দেওয়া হত প্রতি নির্বাচনেই। কারণ ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে শেষ ৫ বার লোকসভা নির্বাচন হয়েছে আমাদের দেশে। নাট্যকার শিব শর্মা 'সমীক্ষা' পথনাটকটির মধ্যে দিয়ে একদিকে কংগ্রেসীদের স্থায়ী সরকারের নামে মিথ্যা ভাওতা, দুর্নীতির স্বর্গ রাজ্য, মন্ত্রীদের একাধিকবার পরিবর্তন, জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া প্রভৃতি বিষয় সুধাময় নামক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। এছাড়াও অগ্রিম একটি পোলের নাম করে ভোটারদের প্রভাবিত করার বিষয়টিও নাট্যকার দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

*'**বাসু :** একটা স্ট্রং সরকার, একটা স্ট্রং সরকার—*

সুধাময় : *তুমি বোধ হয় একটা স্ট্রং ম্যা নের কথা বলছ।*

বাসু : *ইয়েস ইয়েস। স্ট্রং ম্যা মানে রাজীব গান্ধী।*

সুধাময় : *আমি জানি তুমি এতক্ষণ ধরে ওই নামটাই।বলতে চাইছ। তুমি তা হলে রাজীব গান্ধীকে চাইছ।*

বাসু : *নিশ্চয়*

সুধাময় : *দল নয়, একটা স্থায়ী সরকারও নয়। পারিবারিক শাসনের ধারাটাই স্থায়ী হোক, তাই চাইছ।*

বাসু : *স্ট্রংকেন্দ্রকে স্ট্রং করতে হবে।'*

নাট্যকার 'সমীক্ষা' পথনাটকের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তথা কংগ্রেস দলের (১৯৮৪-৮৯) এই পাঁচ বছরের দেশ পরিচালনার অপদার্থতা এবং দুর্নীতিমূলক একাধিক কার্যকলাপের এই কথা উল্লেখ করেছেন আমাদের সামনে।

মহাজন :

নাট্যকার শিবশর্মা 'মহাজন' পথনাটকে মহাজন, বিজয়, কেলো, ঘোষক, কোরাস এবং অফিসযাত্রীদের মধ্যে দিয়ে মহাজনী শাসনের সুদের কারবারের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বিজয় নামক বেকারের যন্ত্রণাকে সুন্দরভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। নাট্যকার বিজয়ের মুখ দিয়ে কাজহারা যুবক বিজয়ের জীবন যন্ত্রণার নানাদিক যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনভাবেই মহাজনের পোষা দালাল কেলোর মুখ দিয়েও সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেছেন। মহাজন তার দালাল কেলো সম্পর্কে বলেন—

*'**মহাজন :** ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাচ্ছিস।*

কেলো : *তাতেও আপনার আপত্তি?*

মহাজন : *হ্যাঁ হ্যাঁ আপত্তি। তোর ছেলেটা বেঁচে আছে আমার টাকায়।*

কেলো : *আপনার কথা শুনতে গিয়ে সবই তো ত্যা গ করেছিবৌ ছেলেও ত্যাগ করব বাবু?*

মহাজন : *আমি যদি বলি, তবে তাই করতে হবে।*

কেলো : *গেলো বছর, ছেলেটার যখন খুব অসুখ হয়েছিল আপনি ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেন নি। বলেছিলেন ওঝা ডাকতে—'*

এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার কংগ্রেসী শাসন আমলে মহাজনদের শোষণের নানা চিত্র দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকার দেখিয়েছেন পথনাটকে মহাজনের শোষণের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না। বিজয়ের মতো সাধারণ মানুষ যেমন মহাজনের শোষণের শিকার হয়েছে তেমনভাবে মহাজনের পোষা দালাল কেলোরও মুক্তি নেই মহাজনী শাসন থেকে। প্রত্যেককেই মহাজন শাসন এবং শোষণ করতে পিছপা হয় না। মহাজন মুনাফার জন্য নানাবিধ খারাপ কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না। ঘোষকের মাধ্যমে নাট্যকার এই পথনাটকের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসীদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে মিথ্যা ভাষণের বেসাতি উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেসীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিজয়, কেলো এবং সাধারণ মানুষের কোন উপকারে আসে না। কংগ্রেসীদের স্বরূপ তুলে ধরতে

নাট্যকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন 'মহাজন' পথনাটকটিতে। এই পথনাটকে দেখা যায় বিজয় ও ঘোষকের সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেশের নির্বাচন এবং কংগ্রেসী নেতাদের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন—

*'**ঘোষক :** তা হলে বেকাররা কি করবে?*

***বিজয় :** কি জানি, কি করবে। এক সময়, আমি যখন বেকার ছিলাম, অল্প বয়স ছিল খুব উত্তেজিত হতামযারা কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে। ভাবতামওরা হটে গেলেই ভালো। আমার ঘরে জ্বলবে আলো। তখন বেকারদের অন্তত এই রকম একটি উত্তেজনা ছিল, আজ তাও নেই! এখন ওরা কি করবে, কি নিয়ে থাকবে কে জানে।*

***ঘোষক :** কিন্তু মশাই, পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি ছিল বছের ১ কোটি বেকারের চাকরি হবে।*

***বিজয় :** প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি! অনেক শুনেছি মশাই। আমরা হচ্ছি মূর্তিমান বাস্তব, সেই দিকে তাকিয়ে কথা বলুন! প্রতিশ্রুতি! খুব হয়েছে। আর নয়।'*

নাট্যকার শিব শর্মা পথনাটকটির শেষ প্রান্তে এসে উল্লেখ করেছেন, কোরাস, ঘোষক, বিজয় সকলে মিলেই মহাজনের অপকীর্তির কথা জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এই মহাজনদের শাসক কংগ্রেস দল সুদীর্ঘকাল ধরে আশ্রয় এবং লালন পালন করে এসেছে। এইজন্য আসন্ন নির্বাচনে মহাজন সুদখোরের দল কংগ্রেসকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যকার।

নাট্যকার শিব শর্মা দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছর ধরে বাংলা নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাট্যকার গণনাট্য সংঘের একজন সক্রিয় সংগঠকও ছিলেন। আজীবন গরীব মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন। সমাজের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার কথাই তাঁর পথনাটকগুলিতে সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। আজীবন বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী নাট্যকার শিব শর্মা অনেক পথনাটক লিখে বাংলা পথনাটকের ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। নাট্যকার পথনাটকগুলিতে শাসকের অত্যাথচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর এবং লড়াইকে সর্বাগ্রে তুলে ধরেছেন। তাঁর পথনাটকগুলির মধ্যে দিয়ে সমকালীন নানা বিষয়ের সম্ভার উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে শিব শর্মা একজন উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

১) অজিত কুমার ঘোষ বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৫।

২) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৭৯৫ - ১৯১২), এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ-বইমেলা ২০০২।

৩) ড. অজিত কুমার ঘোষ, রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, জুন ১৯৯৪।

৪) পানু পাল, 'গণনাট্য সংঘ ও আমি', এপিক থিয়েটার, 'গণনাট্য সংঘ স্মৃতি সংখ্যা' মে - ১৯৭৭।

৫) শোভা সেন, উমানাথ: কিছু স্মৃতি ও পথনাটিকার গুরুত্ব - এপিক থিয়েটার, ১৯৯১-৯২।

৬) পানু পাল, 'দায়বদ্ধতা নিয়ে আমি গণনাট্য সংঘ ও আমার থিয়েটার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন: ফৌজিয়া সিরাজ।

৭) বাবলু দাশগুপ্ত (সম্পাদক), গণনাট্য পত্রিকা পথনাটক সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, কলকাতা-০৯।

৮) রথীন চক্রবর্তী (সম্পাদক), নাট্যচিন্তা পত্রিকা, পথনাটক সংখ্যা, ১৯৯০, কলকাতা-১০১।

৯) রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদক), থিয়েটার, নাট্য ত্রৈমাসিক, পথনাটক সংখ্যা, ৪৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট।

১০) শুক্লা ঘোষাল (সম্পাদক), পান্থজনের নাটক, প্রকাশক—বাবলু দাশগুপ্ত, গণনাট্য প্রকাশনী ৬৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯।

১১) বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথনাটকের কথা' মোম, কলকাতা, ১৯৮৭।

১২) সীমা সরকার, পথের নাটক, প্রমা প্রকাশনী ৫৭/২ই কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

১৩) নৃপেন্দ্র সাহা, চন্দন সেন (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৯, পথনাটক সংখ্যা ২০০৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র

১) আধুনিক বাংলা পথনাটকের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

২) কোন্ প্রেক্ষাপটে আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৩) আধুনিক বাংলা পথনাটকের সৃষ্টি এবং গণনাট্য সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে যা জানো তা লেখো।

৪) বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে যেকোনো দু'জন উল্লেখযোগ্য পথনাট্যকার সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রচিত উৎপল দত্ত এবং চিররঞ্জন দাশের পথনাটক সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত উৎপল দত্তের যে কোন দুটি পথনাটক সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭) সমকালীন উল্লেখযোগ্য পথনাট্যকার হিসেবে জোছন দস্তিদারের ভূমিকা আলোচনা করো।

৮) আধুনিক বাংলা পথনাটকের ইতিহাসে শিব শর্মার গুরুত্ব আলোচনা করো।

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষপত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-১

গ্রুপ থিয়েটার

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.১.১ : ভূমিকা

৪০৫.৩.১.২ : গ্রুপ থিয়েটার কী?

৪০৫.৩.১.৩ : আইপি টি এ এবং নবান্ন

৪০৫.৩.১.৪ : গ্রুপের ধারণা

৪০৫.৩.১.৫ : আই পি টি এ এর পরবর্তী গোষ্ঠীসমূহ ও অন্তঃকলহ

৪০৫.৩.১.৬ : বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ

৪০৫.৩.১.৭ : বিশিষ্ট থিয়েটার ব্যক্তিত্ব

৪০৫.৩.১.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪০৫.৩.১.৯ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.১.১ : ভূমিকা

নাটক একটি প্রাচীন শিল্প মাধ্যম। সভ্যতার গোড়ার দিকে মানুষের সাথে নিয়তির দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে নাটকের প্রধান উপজীব্য। এরই বিবর্তিত পর্যায়ে নাটকের বিষয়বস্তুতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের সাথে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীর প্রধানের সাথে অন্যদের দ্বন্দ্ব, রাজার সাথে জনগণের দ্বন্দ্ব, যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব, অসত্যের সাথে সত্যের দ্বন্দ্ব, সুন্দরের সাথে অসুন্দরের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি সর্বহারার সাথে শোষকের দ্বন্দ্ব। বিষয়ের সাথে সাথে এভাবে এসেছে আঙ্গিকগত পরিবর্তন। আজ থেকে প্রায় দুই শত বছরেরও অধিক সময় পূর্বে সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাষাবিদ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফ প্রথম বেঙ্গল থিয়েটার (১৭৯৫) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে বীজ রোপন করেন তা আজ মহীরূহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্গদেশে আধুনিক ইউরোপীয় গোছের

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রবর্তক হিসেবে তাকে স্মরণ করতেই হবে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, সংস্কৃত পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সক্রিয় উৎসাহে ও অনুবাদে 'উরংমঁরংব' নামক প্রহসনটির মঞ্চায়নের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা মঞ্চ নাটকের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতা হিসেবে বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গরা রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাট্য চর্চার ধারাকে বিকশিত করে। যদিও সে সময় মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলো মঞ্চায়িত হতো। মৌলিক বাংলা নাটকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রায় অর্ধশত বৎসর। ১৮৫২ সালে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নামক দুটি রচিত হলেও ১৮৫৪ সালে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কেই বাংলার সুধীজনরা প্রথম সার্থক মৌলিক নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা নাটক সূচনা থেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই জীবন ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিকে বুকে ধারণ করেছে তারই পথ ধরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইতিহাস আশ্রিত ট্র্যাজেডি ও প্রহসন এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন সাড়া জাগিয়েছিল। তারপর মনমোহন বসু, মীর মোশারফ হোসেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আরো অনেকের নাটক সমকালের মঞ্চকে সচল রেখেছিল।

৪০৫.৩.১.২ : থিয়েটার কী?

গ্রুপ থিয়েটার বা সংঘ নাট্যচর্চা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে এবং লাভ করে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ফলে নাটক হয়ে ওঠে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাগরণের মাধ্যম।

গ্রুপ থিটেটারের উদ্ভব মূলত বিদেশে। ১৯৩১ সালে নাটকই নিবেদিত তিন মার্কিন তরুম হ্যারল্ড ক্লারম্যান, চেরিল ক্রাফোর্ড এবং লী স্ট্রসবার্গ আমেরিকান নাটকের গতানুগতিক চেহারা বদলে দেবার সংকল্প নিয়ে গঠন করেন 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটি নাট্যদল। তখনকার সময়ে সস্তা জনপ্রিয় বিনোদনসর্বস্ব নাটকের বিপরীতে জীবনঘনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় এমন নাটক প্রযোজনা করতে উদ্যোগী হলেন এই নতুন দলের ২৮ জন অভিনয়শিল্পী। তাঁরা এমন মার্কিন নাটক অভিনয় করতে চাইলেন যা সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

অভিনয়ে গ্রুপ থিয়েটার গোষ্ঠীর আদর্শ ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব স্তানিস্লোভস্কি। তাঁর মেথড অনুসরণ করে এরা নাট্যচর্চা শুরু করেন। দলটির ১০ বছরের জীবনে বাইশটি নাটক সাফল্যের সাথে প্রযোজিত হয় এবং গ্রুপ থিয়েটার সত্যিকার অর্থেই মার্কিন নাট্যচর্চায় নতুন ধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে ১৯৩২ সালে গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি ছোট্ট নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। সাত বছর পর তিনটি অপেশাদার নাট্যদল গ্রুপ থিয়েটার নামই এখানে তাদের নিজ নিজ প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতে শুরু করে। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে ১৯৭৮ সালে নাট্যশালাটি নতুন করে উদ্বোধন করা হয় প্রধানত অপেশাদার নাট্যদলগুলোর প্রযোজনার জন্য।

লন্ডনে ১৯৩৩ সালে গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক, অবাণিজ্যিক এবং নিরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্য নিয়ে। বেশিরভাগ নাটকই নির্দেশনা করতেন রুপার্ট ডুন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল নিরাভরণ মঞ্চে খুব কম দৃশ্যসজ্জা ও প্রপ্স ব্যবহার করে নাটক প্রযোজনা করা। ১৯৫৩ সালে দলটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবান্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে।

৪০৫.৩.১.৩ : আই পি টি এ এবং নবান্ন

১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সংঘের নবান্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার এক নতুন পথে যাত্রা করে। নবান্ন অনুষ্ঠানপত্রীতে লেখা হয়েছিল:

বাংলার নাট্যশালাগুলো দর্শকদের সত্যিকার চাহিদা মেটাতে পাচ্ছে না. বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তার সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াস পেলো। সেদিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক। এই সংঘের কাজ হলো যেমননি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যক্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।'

'নবান্ন' নাটকটি নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লেখেন। শম্ভু মিত্রের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত করেন। তারা দুজনই বামপন্থী থিয়েটার শিল্পী সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। গণনাট্য সংঘের প্রথম নাটক 'আগুন' বিজন ভট্টাচার্যের রচনা। এই নাটকটি ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে লেখা নাটক 'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন' অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরপর ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় কুমার রায়ের পরিচালনায় নবান্ন মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বিষয় পঞ্চাশের মন্বন্তর (ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ)। গণনাট্য সংঘ এই নাটকটিকে ভারতের নানা জায়গায় তাদের 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মঞ্চস্থ করে দুর্ভিক্ষের ত্রাণে লক্ষাধিক টাকা তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার ২০ লক্ষ মানুষ অনাহার, অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। তিনি বাংলার এক চাষি। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার অনাহারে যেমন কষ্ট পেয়েছিল তাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নবান্ন নাটকে কৃষকদের একটি দলকে দুর্ভিক্ষের শিকার হিসাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে কৃষকদের তাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল এবং তারা বেঁচে থাকার আশায় বড় শহর কলকাতায় চলে আসে। যাই হোক তারা একটি সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে তারা কলকাতার সর্বাধিক অবহেলিত দারিদ্রতা, যেখানে তারা তাদের যন্ত্রণা একটি রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়।

৪০৫.৩.১.৪ : গ্রুপের ধারণা

সাধারণ দর্শকদের প্রত্যাশ্যা পূরণের লক্ষ্যে ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয় সাধারণ রঙ্গশালা। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়ের। এ সময়ের প্রধান পুরুষ, নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ ঐতিহাসিক পৌরাণিক

নাটকের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা তুলে ধরনের তার নাটকে সমকলীন রাজনৈতিক বিষয়, বিদ্রোহ ও জনগণের নিয়ে নাটক করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদাসীন।

সেইসময় বাংলার নাট্যশালাগুলি সমকালীন সঙ্কট থেকে দূরে গিয়ে দর্শকদের বাস্তব চাহিদা মেটাতে পারছিল না। সমকালীন সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত তখন মানুষের মন। এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য আন্দোলন নতুনভাবে সম্পদশালী হয়ে উঠতে চাইল বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের ধারাপথে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাতে যে সংকট বাংলায় তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালি প্রত্যক্ষ করেছিল মানুষের তৈরি করা মন্বন্তরে তারই স্বজাতির সগোত্র সাধারণ মানুষের অসহায় করুণ পরিণতি। সেদিন এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি কোনো রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের শপথ নেয়নি। কিন্তু সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবন চর্যা ও বিশ্বাসে সচেতনতা সঞ্চার করে বাঙালি তার সংগ্রাম করে তুলতে চেয়েছিল 'সামগ্রিক'। সরকারের এই 'অন্তর্দাহ ও অকুণ্ঠ স্বভাবের আর্তি স্বরলিপি মত পড়তে পেরেছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন-ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।'

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের শুরুতে কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটার জনপ্রিয় তারকা অভিনেতাদের উপর ভিত্তি করে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যেমন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী ও অন্যদের মতো জনপ্রিয় অভিনেতাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। গ্রুপ থিয়েটার এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রস্থান করার চেষ্টা করেছে। খ্যাতিমান অভিনেতৃবর্গের পরিবর্তে গ্রুপ থিয়েটারে জোর দেওয়া হয় গ্রুপ যা সাধারণভাবে অপেশাদার অংশগ্রহণ করেছিল। প্রচেষ্টা ছিল গণনাট্য (জনগণের থিয়েটার) তৈরি। যদিও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংকট ও আদর্শগত কারণে গণনাট্য ভেঙ্গে যায়। একসময় যারা গণনাট্য পতাকা তুলে জড়ো হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বের হয়ে গেলেন গণনাট্য থেকে। এটা সত্য যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ চিন্তা ধারা ও বস্তুবাদী চিন্তার কারণেই এই গণনাট্যের এই ভাঙ্গন পরবর্তী সময়ে তারই পথ ধরে শুরু হলো নবনাট্য চর্চা বা আজকের গ্রুপ থিয়েটার।

৪০৫.৩.১.৫ : আই পি টি এ এর পরবর্তী গোষ্ঠীসমূহ ও অন্তঃকলহ

কলাকুশলীদের দক্ষতা সাংগঠনিক শক্তি ও অসচেতনতার ফলে অভিনয়ে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করলেও গণনাট্য সংঘের অন্তঃকলহ ক্রমশ প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে তোলে। নাটক ও নৃত্য এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, সংগঠক প্রধানের সঙ্গে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখদের নিত্য মতান্তর তীব্রভাবে ব্যঘাত সৃষ্টি করল গণনাট্য সংঘের দৈনন্দিন কর্মে। তবে শিল্পী বনাম সংঘটকদের এই বিরোধ কিন্তু শুধুমাত্র বাংলার অর্থাৎ প্রাদেশিক শাখার নিজস্ব সংকট ছিল না। প্রখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্করের স্মৃতিকথা থেকে এই বিবাদের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'...প্রথম প্রথম স্কোয়াডে এসে কাজের স্বাধীনতায় পার্টির ততখানি উপস্থিত বোধ করিনি।।... কিন্তু সেটাই ধরা পড়েছিল আস্তে আস্তে... ক্রমে ক্রমে পার্টির অফিস থেকে নানারকম ফরমায়েশ আসতে শুরু করল....যেখানটায় অসুবিধা দেখা দিলো তা হল ওদের পার্টির হুকুম, অর্ডার নিয়ে। একটা সময় বুঝতেই পারছিলাম বড় বেশি মাপজোকের মধ্যে প্রবেশ করেছি।...ক্রমে পার্টি অফিসের প্রস্তাবগুলো একটু যেন বেশি আসতে লাগল।... ওদের কালচারাল স্কোয়াডের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গ্রামে শো দেখাবে, মোটর বা লরি নিয়ে গিয়ে লরির পিছনে একটা অস্থায়ী স্টেজের মত করে মানুষকে সচেতন করার জন্য কিছু কিছু নাটক, ট্যাবলো প্রেজেন্ট করবে। জোতদারের অত্যাচার, মজুতদারের স্বার্থপরতা, শঠতা এসবই ওদের বিষয়সূচির মধ্যে ছিল।

নিশ্চয়ই খুব ভালো উদ্দেশ্য এবং এতে ওদের জোরটা ক্রমশ বেড়ে গেল। শিল্পের দিকটায় আগ্রহ যেন কমতে লাগতে থাকলো।...স্থায়ী সাহিত্যের সাথে সাংবাদিকতার যে দূরত্ব, এদের কাজ কারবারের সঙ্গে দেখলাম স্থায়ী কোনও শৈল্পিক কাজের সেই দূরত্ব থেকে গেছে। এই হচ্ছে, এই করছি-ভাবখানা মোটের উপর এই। আর তার ওপর সেই পার্টি লেভেলের নির্দেশ-এটা কর, ওটা বাদ দাও। প্রায়ই এই নির্দেশ আমার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল... কিরকম যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠেকতে লাগলো।'

পরাধীন ভারত গণনাট্য সংঘের অন্তঃকলহ তত প্রকট হয়নি, দারুণভাবে তা প্রকট হয়ে উঠল স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে-এমনকি বাংলা প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘ সচিব প্রকাশ ঘোষ তাঁর প্রতিবেদনে নানা বিভেদের স্বরূপ উদঘাটন করে পেশ করেছিলেন সাত দফা সমাধান সূত্র। এত কিছুর সত্ত্বেও গণনাট্য সংঘের ভাঙ্গন রোধ করা গেল না। অপরদিকে স্বাধীন বঙ্গদেশের সরকার যখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন তখন গণনাট্যের অনেকেই বিপন্ন বোধ করলেন, বিশেষতঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন গণনাট্যে যুক্ত থাকার ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন ছিলেন না।

সেই সময় সাধারণ রঙ্গশালা সঙে গণনাট্য সংঘের কখনওই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। গণনাট্য অভিনীত নবান্নের সাফল্যের পর শঙ্কিত মঞ্চ মালিকরা কেউ গণনাট্যকে অভিনয় প্রদর্শনের জন্য মঞ্চ রাজি ছিলেন না। জীবিকার প্রয়োজনে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (যিনি মহর্ষি নামে পরিচিত) যুক্ত ছিলেন চলচিত্র সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে কিন্তু প্রগতি সংঘের আদর্শে তার অনুরাগ ছিল। এদিকে রংমহল, নাট্যনিকেতন, মিনার্ভাশ্রীরঙ্গম ইত্যাদি মঞ্চাভিনয়ে অতৃপ্ত শম্ভু মিত্র আবার বিজন ভট্টাচার্যের আহ্বানে কলকাতার ধর্মতলার ৪৬ নম্বর বাড়িতে পৌঁছালেন। এখানেই গড়ে ওঠে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। এরপর ১৯৪৮-এ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে গণনাট্যের সংঘের এক সভায় জনৈক সভ্য তাচ্ছিল্য করলে, শম্ভু মিত্র এই সংঘ পরিত্যাগ করেন।

এরপর মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কালিম শরাফি, মোহম্মদ ইসরাইল প্রমুখ শিল্পীগণ যৌথভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন নতুন কিছু করা শুরু করার। এরপর ১৯৪৮-এ রঙমহলে 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' প্রযোজিত নবান্ন নাটক ১৩, ১৪, ও ১৬ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হলো। অনুপ্রেরণা শম্ভু মিত্রের পরিচালনা এবং কালিম শরাফিসহ তার তিন সহকর্মী অমর গাঙ্গুলী, অশোক মজুমদার এবং মুহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখের প্রচেষ্টা এবং কালীশংকর, ঋত্বিক ঘটক, সত্য জীবন ভট্টাচার্য, জলদ চট্টোপাধ্যায় আরো অনেকের সহযোগিতায় উৎকৃষ্ট প্রযোজনার সত্ত্বেও 'নবান্ন' আর্থিক ভাবে সাফল্য পেল না। এরপর সংগঠন থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—

(ক) পেশাদারী পথ ছেড়ে অবলম্বিত হলো পরীক্ষামূলক পন্থা।

(খ) মাসিক ৮ আনা চাঁদা স্থির হলো।

(গ) দলে কাজের বিভাজনে অমর গাঙ্গুলী দায়িত্ব পেলেন মহলার এবং মহম্মদ জ্যাকেরিয়া হিসাব রক্ষার।

(ঘ) অনুশীলনের নির্দিষ্ট সময় স্থির হলো সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে নটা পর্যন্ত।

এরপর তুলসী লাহিড়ীর পরিমার্জিত নাটক 'পথিক' রেলওয়ে ম্যানশন ইনস্টিটিউট' প্রেক্ষাগৃহে ১৯৪৯-এ ১৬ অক্টোবর 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' নিজস্ব প্রযোজনায় মঞ্চ সাফল্য লাভ করে। নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়, নাম হয় 'বহুরূপী'। মর্ষির ভাবনায় 'দ্যাখ, আমরা তো রংচং মেখে সব নাটক করি, থিয়েটার করি, তা আমরা তো

সব বহুরূপীর দল-এক এক নাটকে এক এক রূপ। অতএব বহুরূপী দল নাম দিলে কেমন হয়?'। ৯ মে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'বহুরূপী'র জন্মদিন নির্ধারিত হয়।

যদিও উৎপল দত্তের 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা আগেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এঁরা তখন শেক্সপিয়ার ও বার্নার্ড শ এর নাটক ইংরেজি অভিনয় করতেন। তাই মনে করা হয় 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই প্রথম বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সূত্রপাত ঘটে। এরপর একে একে রূপকার, গন্ধর্ব, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি দলগুলি এসে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করল।

৪০৫.৩.১.৬ : বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার অস্তিত্ব রক্ষায় প্রথম পর্বে টিকিট বেঁচে থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেও, তাদের লক্ষ্য কোনদিনই 'কমার্শিয়াল থিয়েটার' ছিল না। ব্যবসাভিত্তিক কমার্শিয়াল থিয়েটারে নাট্যকর্মীদের ওই দলের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। এখানে প্রধান লক্ষ্য মালিকের স্বার্থ। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য সুস্থ ও প্রগতিশীল নাট্যচর্চা। আর গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা অখণ্ডভাবে একটি যৌথ পরিবার। ১৯৪৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এরকম দলগুলি বেশিরভাগই কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার বাইরে গ্রুপ থিয়েটারের ধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তবে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সাংগঠনিক ভিত্তি সর্বত্র একই ধরনের। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা একজনের নেতৃত্বে একত্র দল তৈরি করে। এছাড়া অধিকাংশক্ষেত্রেই দলের সদস্যদের স্ত্রী বা বোন অথবা বান্ধবী। গ্রুপ থিয়েটারের নেতৃত্ব যিনি, তিনি পরিচালক। তিনি সাধারণত দলের সবথেকে সমর্থ এবং অভিজ্ঞ অভিনেতা, ফলে একথা অস্বীকার করার উপায় নে, যে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম অবধি পরিচালককেন্দ্রিক কিছুটা একনায়কতন্ত্র চলে আসছে অর্থাৎ যদিও নামে গ্রুপ বা অনেকের দল কিন্তু বাস্তবে গ্রুপ থিয়েটার মূলত 'ডিরেক্টরস্ থিয়েটার' একাধিকের নেতৃত্বে বা যৌথ নেতৃত্বে দল চলে এমন দল প্রায় নেই বললেই চলে। মনে পড়ে প্রথম পর্যায়ে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' দলে যৌথ নেতৃত্ব ছিল।

যদি সাল অনুযায়ী সময়ের প্রেক্ষিতে গ্রুপ থিয়েটারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেখাচিত্র করি তাহলে দেখব ১৯৪৪-১৯৬০ (আনুমানিক) নবনাট্য (গণনাট্য)-গণনাট্য, সৎনাট্য। সৎনাট্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েন 'বহুরূপী সম্প্রদায়'। আবার নান্দীকার, রূপকার ইত্যাদি কয়েকটি দল অরাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (যেমন ব্যাপিকা বিদায়, নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র) ইত্যাদি। নান্দীকার নিজের ইচ্ছা বা দ্বিধার বিরুদ্ধে সৎনাট্য করেন বলে অভিহিত হন। পরে অবশ্য 'নান্দীকার' তার দলের স্লোগানে ঘোষণা করে 'ভালো নাটক করবো, ভালো নাটক ভালো করে করব।'

৪০৫.৩.১.৭ : থিয়েটার ব্যক্তিত্ব

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ :

◆ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৩৩-অক্টোবর ১৪, ১৯৮৩)

ছাত্রজীবন থেকে তিনি নাটক রচনা ও অভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৫০ থেকে ৫৪-এই পাঁচ বছরে ৯টি নাটকে নির্দেশনা ও অভিনয় সূত্রে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪-তে লিখেছেন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সংঘাত'। ২ বছর

পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। এই সংঘে ১৫টি নাটকে অংশ নেন তিনি। ১৯৬০ সালে ২৯শে জুন প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দীকার'। প্রায় ৪০টি নাটকে নির্দেশক বা অভিনয় অথবা উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। তিন পয়সার পালা নাটকে নির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিচালনার জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন। সেতু বন্ধন, সওদাগরের নৌকা তার রচিত নাটক। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭-এ নান্দীমুখ নামে নামে এক নতুন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এদের বিখ্যাত নাটক পাপপুণ্য।

◆ বাদল সরকার (১৫ জুলাই, ১৯২৫-১৩ মে, ২০১১)

একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি নাট্যব্যক্তিত্ব। যিনি থার্ড থিয়েটার নামক ভিন্ন ধারার নাটকের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। ৭০ দশকের নকশাল আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠান বিরোধী নাটক রচনার জন্যে তিনি পরিচিত হন, মঞ্চের বাইরে সাধারণ মানুষের ভেতর নাটক'কে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম কাজ বাদল সরকারের। তার নিজস্ব নাটক দল শতাব্দী গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে। ভারতে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে হাবিব তনভীর, বিজয় তেণ্ডুলকর, মোহন রাকেশ এবং গিরিশ কার্নাডের পাশাপাশি বাংলায় বাদল সরকারের নাম উচ্চারিত হয়।

◆ শম্ভু মিত্র (২২ অগস্ট, ১৯১৫-১৯ মে, ১৯৯৭)

বাংলার তথা ভারতীয় নাট্যজগতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলী মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল: নবান্ন, 'বিভাব', ছেঁড়া তার, পথিক, দশচক্র, চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, কাঞ্চনরঙ্গ, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তার রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তার রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উলুখাগড়া, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গ: নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।

◆ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (৩১ জানুয়ারি ১৯৩৫-)

১৯৬১ সালে তিনি কলকাতায় নান্দিকার নামের এক নাট্য গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ১৯৭০ সাল থেকে উনি ঐ নাট্য সংগঠনের পরিচালক হিসেবে অনেক নাটক পরিচালনা করেন ও ওই বছর থেকেই উনি ঐ নাট্য

সংগঠনের প্রধান হন। ১৯৮০ সালের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার, যা উনি সঙ্গীত নাটক একাদেমি থেকে লাভ করেন। তার স্ত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত-যিনি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ঘরে বাইরে (চলচ্চিত্র)-এ অভিনয় করার জন্য বিখ্যাত।

তৃপ্তি মিত্র (ইংরেজি: Tripti Mitra) ডাকনাম তৃপ্তি ভাদুড়ী (২৫ অক্টোবর, ১৯২৫-২৪ মে ১৯৮৯) ছিলেন বাংলা ভাষার থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী এবং শম্ভু মিত্রের স্ত্রী যিনি নাটক পরিচালনার জন্য খ্যাত ছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে বহুরূপী নাট্যদল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। তিনি যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, ধরতি কে লাল ইত্যাদি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন।

এছাড়া আগুন, নবান্ন, জবানবন্দি, রক্তকরবী, রাজা, ডাকঘর প্রভৃতি বহু নাটকে অভিনয় প্রযোজনা ও পরিচালনা কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উষা গাঙ্গুলী, ১৯৭৬ সালে রঙ্গকর্মি থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উৎপল দত্ত: উৎপল দত্ত বিভিন্ন নাটক রচনা করেছেন, পরিচালনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন।

কৌশিক সেন: ১৯৯২ সালে স্বপ্নসন্ধানী প্রতিষ্ঠা হয়, গত দুই দশক ধরে তারা ৪০টিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন।

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাকটিউল থিয়েটার আর্টস-এর (আইএফটিএ) প্রতিষ্ঠাতা দেবাশীষ দত্ত।

অরুণ কুমার সরকার, ১৯৬১ সালে গ্রিন অ্যালবাম গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অরিন্দম সাহা, ২০০২ সালে নাট্যচেতনা '০৩ (গণ শিক্ষা) থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়, আগস্ট, ২০১৩ সালে একেটিও প্রতিষ্ঠা করেন।

নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত: থিয়েটার কমিউন-এর প্রতিষ্ঠাতা

বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়: ২০১৩ সালে দমদম বিশ্বরূপম প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্র গুপ্ত: ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন অগ্রানের নবান্ন।

দীপ-গুঞ্জন (দীপঙ্কর বসু ও গুঞ্জন গাঙ্গুলি) ২০১২ সালে ঘোলা কালমুকুর প্রতিষ্ঠা করেন।

পিঙ্কি ঘোষ দস্তিদাল ২০১১ সালে স্যামপন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৪০৫.৩.১.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গ্রুপ থিয়েটার কী? আই পি টি এ এফ পুরো নাম কি? এর প্রতিষ্ঠা কবে?

২। গ্রুপ থিয়েটার নবান্নের সম্পর্ক নির্ণয় করো।

৩। গ্রুপ থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখো।

৪। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার এর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম লেখো।

৫। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার এর ধারণা ও স্বরূপ বিস্তারিত আলোচনা করো।

৪০৫.৩.১.৯ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ-পবিত্র সরকার।

২। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ-সাধন কুমার ভট্টাচার্য।

৩। নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা-সাধন কুমার ভট্টাচার্য।

৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ-অজিত কুমার ঘোষ।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস-আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী।

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-২

সৎ নাট্য

বিন্যাসক্রম

৪০৫.৩.২.১ ভূমিকা

৪০৫.৩.২.২ সৎ নাট্য

৪০৫.৩.২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪০৫.৩.২.১ ভূমিকা

শম্ভু মিত্র (২২ আগস্ট ১৯১৫ — ১৯ মে ১৯৯৭) বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন। কম বয়স থেকেই থিয়েটারের প্রতি শম্ভুমিত্রের আগ্রহ ছিল। নাট্যকার, নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবেও তিনি ছিলেন স্মরণীয়। বিশ শতকের চারের দশকে শম্ভু মিত্র ভেবেছিলেন — 'সৎ ভাবে নাটক করব, ভালো নাটক করব'। তিনি বলেছিলেন— 'আমরা ভালো নাটক, ভালো করে করতে চাই।' এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে 'সৎনাট্যে'র বিষয়ে পাঠকদের একটা ধারণা জন্মগ্রহণ করবে। শম্ভু মিত্রের এই নাট্যচর্চার ধারাকে বলা হয় নবনাট্য আন্দোলনের ধারা। শম্ভু মিত্রের যা কিছু কাজ-সবই থিয়েটারকে ঘিরে। থিয়েটার সমাজের ভালো করে,সেখানেই থিয়েটারের সার্থকতা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একদিকে গণনাট্য সংঘের পথচলা অপরদিকে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শম্ভু মিত্র তৈরি করলেন 'বহুরূপী' নাট্যদল (১৯৪৮)। বিজন ভট্টাচার্য তৈরি করেছিলেন 'ক্যালকাটা কয়ার' (১৯৪৯) নাট্যদল। পরবর্তী সময়ে একের পর এক গ্রুপ থিয়েটারের দল বাংলা নাট্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেইসময় শম্ভু মিত্র মনে করতেন— নিজেদের সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার মন নিয়ে থিয়েটারে আসতে হবে। মন থেকে পাপকে দূরে সরিয়ে রেখে নাট্যশিল্পে অংশগ্রহণ করতে হবে। 'গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র' গ্রন্থে শাঁওলী মিত্র বলেছেন— 'নিজেরা সৎ না হলে কি সৎনাট্য,আধুনিক নাট্য, প্রগতিবাদী নাট্য— এসব কথার কোনো মানে থাকে?' শম্ভু মিত্র কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সৎ থাকবার চেষ্টা করেছেন। তাই কি 'সৎনাট্য'

শব্দটির উদ্ভব? বাংলা নাট্য আন্দোলনে 'গণনাট্য', 'নবনাট্য', 'সৎনাট্য', 'গ্রুপ থিয়েটার' এবং বাংলা নাটকের পথ চলার বিভিন্ন ধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শম্ভু মিত্র পেশাদারী মঞ্চের অভিনয় রীতি পরিত্যাগ করে নতুন রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাবনা চিন্তা সৎভাবে শুরু হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বপূর্ণ, আত্মচিন্তায় মগ্ন। শম্ভু মিত্র জনমুখী চেতনার পরিবর্তে সাহিত্যমুখী চেতনার উপর গুরুত্ব দিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তে নাটকে সাহিত্য, ইমোশন, মঞ্চ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেইসময় নাট্য আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার আগ্রহে সৎ নাট্যের প্রতি মানুষের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সফোক্লিস-এর রাজা অয়দিপাউস, ইবসেনের ডলস হাউস জাতীয় প্রাচীন ক্লাসিকস-এর প্রযোজনা শুরু হয়েছিল।

আমরা সকলেই জানি, ১৯৪৩ সালের ২৫ মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর স্মরণীয় ঘটনা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘে শম্ভু মিত্র যোগ দিয়েছিলেন অভিনয়ের তাগিদে। গণনাট্য সংঘ এবং তার পরবর্তীতে গ্রুপ থিয়েটার জীবন ভাবনার এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পেরেছিল। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর নাট্য ব্যক্তিত্বদের সকলের মন খারাপ। সংকটময় পরিস্থিতিতে তখন তারা কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। নাট্যকর্মী ও নাট্য ব্যক্তিত্বরা সকলেই দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনকী নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা সকলেই অস্তিত্বের সংকটে সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। সংকটময় পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যমে, নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে বহুরূপীতে যোগ দিলেন— কালী সরকার,তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। সেইসময় বহুরূপী নাট্যসংস্থাটি তাদের কর্মসমিতির বৈঠকে স্থির করেছিলেন—

(১) 'আমরা ভালো নাটক ভালো করে করব। আমরা সেইসব নাটক করব যে,— নাটক আমাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। যে-সব নাটক আমাদের আত্মমর্যাদাসহ বাঁচতে শেখাবে।'

(২) 'আমরা কবিতা এবং গানের মাধ্যমে কিছু উপস্থাপনা করতে চাই, যার দ্বারা হয়তো আমরা আমাদের শিল্পে নতুনতর আঙ্গিক আবিষ্কার করতে পারব।'

গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে নাট্য ব্যক্তিত্বরা নতুন একটা নাট্য আন্দোলন জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর নতুন পথে নতুন ধরনের নাটকের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করানো ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। কেননা সবুজ মন নিয়ে, সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে সাহিত্যকে ভালোবেসে কাজ করে যেতে হবে। স্বাধীনতার পর সরকার বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখিয়ে জনগণকে নিজেদের পক্ষে টানতে থাকে। সেই সময় 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত যারা লিখতেন, তাদের কলমে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে, 'নবনাট্য', 'সৎনাট্য' আন্দোলন জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল। শম্ভু মিত্রের নিজের নাট্যদল 'বহুরূপী'তে প্রযোজিত হয়েছে, অনেকগুলি বিখ্যাত নাটক। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজন ভট্টাচার্য, বিজয় তেণ্ডুলকর, হেনরিক ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

৪০৫.৩.২.২ সৎ নাট্য

গণনাট্য সংঘ ছেড়ে শম্ভু মিত্র নিজস্ব নাট্যদল 'বহুরূপী' (১৯৪৮) তৈরি করেছিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'বহুরূপী' (১৯৪৮) নামে নামকরণ করেন। 'বহুরূপী'তে চেয়েছেন রাজনৈতিক দলের ভেঁপুদার না হয়ে বুদ্ধিচালিত রুচিসম্মত নাট্য প্রযোজনা করতে। সৎভাবে নাটক করব, ভালো নাটক করব— এই ছিল শম্ভু মিত্রের মন্ত্র। কিছুদিন

পর গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে ভাঙন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ভাঙনের মূলে কোন আদর্শ ছিল না। বহুরূপী নাট্যসংস্থা ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে 'রক্তকরবী'র অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'বহুরূপী' যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা' নাটকটি ১৯৬৪ খ্রিঃ 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৫৩-৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'বহুরূপী' থেকে তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখেরা বেরিয়ে এসে প্রথমে 'আনন্দম' ও পরে 'রূপকার' দল গড়লেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে নবনাট্য আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে সেগুলি হল— 'বহুরূপী', 'নান্দীকার', 'শৌভনিক', 'থিয়েটার ইউনিট', 'চতুরঙ্গ', 'চার্বাক- সম্প্রদায়', 'রঙ্গরূপা' প্রভৃতি।

শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় 'নবান্ন', 'ছেঁড়াতার', 'বিভাব', 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'দশচক্র', 'পুতুল খেলা', 'রাজা অয়দিগাউস' খুব সুনাম অর্জন করেছিল। শম্ভুমিত্রের রচিত 'চাঁদ বণিকের পালা' উল্লেখযোগ্য নাটক। উপরোক্ত নাটকগুলির বিষয় আর প্রকাশভঙ্গি ছিল পেশাদার থিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেবলমাত্র আলোকসজ্জা, মঞ্চ নির্মাণ কিংবা উন্নত মানের অভিনয়ের জন্যই নয়, নাট্য বিষয় ভাবনার আধুনিক উপস্থাপনা জনমানসকে আকৃষ্ট করেছিল। এই প্রসঙ্গে গঙ্গাপদ বসু বলেছেন— 'সৎ মানুষের নতুন জীবন বোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটক শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক'। নবনাট্য আন্দোলনকারীরা জনগণ থেকে সরে গিয়ে তারা নতুন নাটকের দিকে হাত বাড়ালেন। যে ভাবেই হোক নতুন কিছু করতে হবে। শিল্পকে শিল্প হয়ে উঠতে হবে। 'নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ' গ্রন্থে সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন— 'চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘ নতুন নাট্য আন্দোলনের সৃষ্টি করে। গণনাট্য-সংঘ এবং এই সংঘের বিভিন্ন শাখা সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনার আবেগ নিয়ে বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি-শ্রেণিদ্বন্দ্বের ও শোষণ-শাসনের-উৎপীড়নের চিত্র জনসাধারণের সামনে হাজির করছে— শোষণ-শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য, জনজীবনের প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা আনবার জন্য প্রেরণা যোগাচ্ছে। এই সংঘের নাট্যকার এবং অভিনেতারা কমবেশি আদর্শানুরাগী। থিয়েটার এদের কাছে গণসংযোগের একটা উপায় মাত্র— এদের লক্ষ্য গণমানসে সাম্যের আবেগ-স্বাধীনতার আবেগ সঞ্চার করা।'

তার ফলে সমকালীন সমাজ-রাজনীতি থেকে নাট্যব্যক্তিত্বরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। নবনাট্যে বা সৎনাট্যে শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত, চোর-ডাকাত, ধনী-গরিব সব শ্রেণির মানুষই আসতে পারে। সমকালীন ঘটনাও স্থান পাবে। কিন্তু গণ-জাগরণ ও গণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। শম্ভু মিত্র গণনাট্য ভেঙে গড়ে তোলেন 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী। সেইসময় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে গড়ে ওঠে সৎ নাট্য প্রচেষ্টা। গঙ্গাপদ বসু এই প্রসঙ্গে বলেছেন— 'সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক। এবং এই রকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ-সচেতন শিল্পীর সত্য ও রিয়ালিটির যে অন্বেষা তাকেই বলতে পারি নাট্য আন্দোলন'।

'নাট্যতত্ত্ব বিচার' গ্রন্থে ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন— 'নবনাট্য আন্দোলনের উদ্যোক্তরা যে আদর্শ ও প্রত্যয় নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, নানা সংস্থার প্রযোজনায় ও অনেক নাট্যকারের নাটকে সেই আদর্শ আর ঠিক রক্ষিত হচ্ছে না। আর তখন 'বহুরূপী'র মতো বেশ কিছু নাট্যসংস্থা ক্লাসিকাল 'সৎনাটক' এর দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তাই বলে নব-নাট্যান্দোলন 'সৎ নাটক' বা ভদ্রনাটকে রূপান্তরিত হয়ে ভেঙ্গে গেছে— এমন মনে করা ঠিক নয়।' সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধকে এঁদের অভিনীত নাটকে তুলে

ধরা হচ্ছিল ঠিকই। তাছাড়া সূচনা থেকেই তো এঁরা ক্লাসিক্যাল নাটক ও রবীন্দ্র নাটককে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই 'সৎ' নাটকের কথা নতুন কিছু নয়। তবে নব নাট্যান্দোলনের নামে যে নতুনত্ব বিভিন্ন নাট্য সংস্থায় পেয়ে বসেছে এবং নানা সংস্থা যে-ভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।

সৎ নাট্যের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক প্রসঙ্গে 'গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র' গ্রন্থে শাঁওলী মিত্র বলেছেন— 'আসলে একটি মানুষ যদি তাঁর বিশ্বাসে স্থিত থাকতে চান, এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁর নিজের কাজটুকু করে যেতে চান, তাহলে সেই মানুষটির ভাবনা এবং বিশ্বাসকেও আমাদের চিনে নেবার চেষ্টা করতে হবে। টুকরো টুকরো অংশ ধরে ধরে তো বিচার হয় না।' 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী','পুতুল খেলা', 'দশচক্র', 'বিসর্জন', 'রাজা' বা 'রাজা অয়দিপাউস' ইত্যাদি নাটকগুলি শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'পাগলা ঘোড়া' এবং 'চোপ! আদালত চলছে'এই নাটক দুটি শম্ভু মিত্র-র শেষ নির্দেশনার নিদর্শন। মূল কথা হলো মানুষের অন্তর থেকে ভালো হওয়াটা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। মানব সভ্যতার মধ্যে ভালোবাসা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকবে এই চিরন্তন সহজ সত্যটি বিশ শতকের ছয়ের দশকের সাধারণ মানুষের কাছে বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ভালোবাসার অভাবে মনুষ্যসমাজে যে লোভ, হিংসা ও পাপের বৃদ্ধি হয়,তাতে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেসময় নাট্যক্ষেত্রে যেসব নাটক অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছে বা যে পদ্ধতিতে নাট্য নির্মিত হয়েছিল তাতে সংকট লক্ষ্য করা গেছে। সর্বোপরি সৎ নাটক জনমানসকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলা নাটকের জীবন্ত ধারা এখনও প্রবহমান। তাকে আমরা সৎ নাট্য, নবনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার যে নামেই পরিচিত হই না কেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে শম্ভু মিত্রের অবদান সবসময় আমাদের স্মরণ করতে হবে।

৪০৫.৩.২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সৎ নাট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪০৫.৩.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস— ড. অজিত কুমার ঘোষ

২। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ — সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৩। নাট্যতত্ত্ব বিচার — ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস— দর্শন চৌধুরী

৫। বাংলা নাটকের দিগ্বলয় — অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়।

৬। গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র— শাঁওলী মিত্র

৭। শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা— জগন্নাথ ঘোষ

পত্র : ডিএসই-৪০৫

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১

থার্ড থিয়েটার

বাদল সরকার খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন- 'অঙ্গনমঞ্চে বিশ্বাস আমার রাতারাতি আসেনি। ১৯৫৮ সালে যখন প্রথম Theatre in the round—দেখি বিদেশে তখন থেকেই চিন্তার সূত্রপাত।' ১৯৫৭-৫৯ সাল, এই দু'বছর বাদল সরকার কর্মসূত্রে লণ্ডনে কাটিয়েছেন। সেই সময় তিনি এরিনা মঞ্চে Theatre in the round দেখেন। এর কয়েক বছর পর প্যারিসে থাকার সময়ও তাঁর Theatre in the round-এ থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ১৬.১২.১৯৬৪-তে মনু-কে লেখা একটি চিঠিতে বাদল লিখেছেন

'...গত রবিবার থিয়েটারে গেলাম। Theatre in the round-এ প্যারিসে একটা এরকম থিয়েটার নিয়মিত চলে।...লণ্ডনে একটা দেখেছি, আর বইয়ে পড়ছি। মাঝখানে গোল জায়গায় অভিনয় হয়, চারিদিক ঘিরে সার্কাসের মতো দর্শকদের আসন...।'

লণ্ডনে একবার দেখে এবং Theatre in the round সম্পর্কে পড়ে থিয়োরিটিক্যালি যে-কটা পয়েন্ট বুঝেছিলেন, প্যারিসে দেখে তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয় তাঁর। থিয়েটার যে ঠিক প্রসেনিয়াম মঞ্চে সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি এই প্রথম বুঝতে পারেন। তিনি অনুভব করলেন প্রচলিত স্টেজের থেকে এই মাধ্যমে দর্শককে অনেক বেশি নাড়া দেওয়া সম্ভব। সেট, সাজসজ্জাহীন অনাড়ম্বরভাবে এমন জীবন্ত নাটক দেখার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাঁর থিয়েটার ভাবনাকে পুষ্ট করেছিল। তবে তখনও তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেই নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তখনও তিনি প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করেননি। প্রসেনিয়ামে থাকাকালীন এই থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে উদিত হয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন উঠলেও এর থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প কিছু করার চিন্তাভাবনা তখনও তাঁর মনে দানা বাঁধেনি। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালে দু'মাসের জন্য বাদল সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অঙ্গরূপে পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশ রাশিয়া, পোলাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করে আসেন।

১৯৬৯ সালে পোলাণ্ডে গিয়ে বাদল সরকার জর্জ গ্রোটোস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নাটক 'Apocalypsis cum Figuris'-এর অভিনয় দেখেন। গ্রোটোস্কি দেখিয়েছেন, মানুষ তার শরীর দিয়ে কী করতে পারে তার সর্বোচ্চ নিদর্শন। এতোদিন ধরে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, সেই মঞ্চসজ্জা, আলো, রূপসজ্জা, দৃশ্য বিন্যাস-এগুলির চাইতে তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর এবং

তাদের শরীরী ভাষার মাধ্যমেই তিনি তাঁর নাট্যবস্তুকে দর্শকের কাছে হাজির করতে চেয়েছেন। গ্রোটোস্কি মনে করতেন, সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, এমন কী একটি মঞ্চ ছাড়াই থিয়েটার করা যেতে পারে। তাঁর থিয়েটার কর্ম দেখে, তাঁর 'টুওয়ার্ডস-এ পুওর থিয়েটার'-পড়ে এবং গ্রোটোস্কির সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তায় বাদল সরকার খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গ্রোটোস্কির সঙ্গে কথা বলে তিনি যে উপকৃত হন সেকথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন-

'There are certain things he had said which I liked very much and I think I can understand it and some ways have used them.'

প্রায় একই রকমভাবে সেই ভালো লাগার কথা বলেছেন তাঁর লেখা 'The third Theatre' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন—

'...Grotowski's work and his comments on theatre ware fresh in my mind.'

প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মনে তৈরি হলেও এতদিন সেখান থেকে বের হওয়ার পথ তাঁর জানা ছিল না। এবার সেই পথ যেন খুঁজে পেলেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে যেমন একমাত্র পথ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি সেই সঙ্গে এটাও মেনে নিয়েছিলেন এই থিয়েটার করার জন্য পয়সা কড়ির দরকার হয়। থিয়েটার হল ভাড়া থেকে শুরু করে সেট, লাইট-সব কিছুর জন্য প্রচুর খরচ। একটা সময় শতাব্দী প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গ্রোটোস্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং তাঁর থিয়েটার কর্ম দ্বারা বাদল সরকার নতুনভাবে উজ্জীবিত হন। ১৯৬৯ সালে ক্যালচারাল এক্সসেশন প্রোগ্রাম থেকে ফিরে এসে বাদল সরকার গ্রোটোস্কির পুওর থিয়েটারের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে জোর দিলেন খরচ কমানোর দিকে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন

'আমরা ক্রমেই মঞ্চসজ্জা, আলো, সাজপোশাক ও আবহ সংগীত কমাতে লাগলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, আমরা টেপ রেকর্ডার বা প্রোজেক্টের মতো কোনো যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করব না। সঙ্গে সঙ্গেই আক্ষরিক অর্থে আমরা পুওর থিয়েটার তথা গরিব নাট্যের ধারণাটা গ্রহণ করলাম। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী গরিব, আমাদের দেশবাসী গরিব, আমরা চাইছিলাম আমাদের সেই দারিদ্র্যকেই আমরা এমনভাবে কাজে লাগাব যাতে প্রতিবন্ধ না হয়ে সেই দারিদ্র্যই আমাদের সম্পদ হয়ে ওঠে।'

১৯৬৯ সালের প্রথম প্রযোজনা 'প্রলাপ' তারপর 'সারারাত্তির', 'শেষ নেই', 'বল্লভপুরের রূপকথা' সবই পুওর থিয়েটারের ধারণা নিয়ে তৈরি। বাদল সরকার সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

'বল্লভপুরের রূপকথা'র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল ৬৫ টাকা। বলতে পারেন পুওর থিয়েটারের দিকে একটা স্বভাবিক প্রবণতা তখনই দেখা দেয়।'

এই যে থিয়েটারের খরচ কমানোর ভাবনা এটাই প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রথম পদক্ষেপ। থিয়েটার যে সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা ছাড়াও সম্ভব এটা এবার বাদল সরকার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারলেন। এইভাবে বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিপুল খরচের হাত থেকে রক্ষা করে শতাব্দীকে গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন। কিন্তু পাশাপাশি বাদল সরকার উপলব্ধি করলেন এভাবে কতদিন? থিয়েটারকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়? তিনি দেখলেন যে থিয়েটারের দর্শক কমছে। কলকাতার অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারের মতো শতাব্দীরও একই অবস্থা। দর্শকের অভাবে অনেক সময় হল ভাড়া পর্যন্ত পকেট থেকে বের করতে হয়।

সকলেই সিনেমায় যাচ্ছে। তাহলে কি থিয়েটার খুব একটা দুর্বল মাধ্যম? এই প্রশ্ন বাদল সরকারকে আলোড়িত করেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন খামতিটা কোথায়। সিনেমার প্রতি তুলনায় তিনি দেখলেন যে সিনেমার মতো সমস্ত কিছু যথাযথ বাস্তবিক দৃশ্য দেখানো থিয়েটারে সম্ভব নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

'থিয়েটার কী পারে? সিনেমায় অনেক কিছু দেখাতে পারে, সমুদ্রে ঝড়, পাহাড়, অভিনেতার ক্লোজ-আপ...। আমাদের চিৎকার করতে হয় লাস্ট রো-কে শোনানোর জন্য, সামনের লোক বিরক্ত হয়। সিনেমায় মৃদুস্বরে কথা বললেও সকলে শুনতে পায়।'

কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও তাঁকে আলোড়িত করেছিল কী জোর আছে থিয়েটারে যে, এত বছর পরেও তা টিকে আছে? তিনি উপলব্ধি করলেন থিয়েটার জীবন্ত, বাস্তব। অর্থাৎ থিয়েটার হচ্ছে এখন, এখানে; সিনেমা কিন্তু তা নয় সেখানেই থিয়েটারের আসল শক্তি। তিনি বলেছেন—

'সিনেমাতে একটা প্যাকিং বাক্স দেখিয়ে বলুন দেখি— এটা পুকুরঘাটের সিঁড়ি? পারবেন না। থিয়েটারে কোনও অসুবিধে নেই। একজন অভিনেতা ইচ্ছে করলেই অভিনীত চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের সরাসরি দুটো কথা বলে গেলেন, বলে আবার চরিত্রে ঢুকলেন-এ থিয়েটারেই গ্রহণযোগ্য, সিনেমা নয়।'

তিনি উপলব্ধি করলেন থিয়েটার হল জীবন্ত কলা মাধ্যম বা লাইভ শো। যেখানে দর্শক এবং অভিনেতা একই দিনে একই সময়ে, একই স্থানে উপস্থিত হচ্ছেন এবং কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকছেন। অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের এই যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এটা একমাত্র থিয়েটারেই সম্ভব সিনেমায় নয়। তিনি বলেছেন—

'থিয়েটার অন্যান্য জায়গায় হয়তো সিনেমার চেয়ে অনেক দুর্বল কিন্তু এখানে সে শক্তিশালী। মনে হয়েছে, এখানেই জোর দেওয়া উচিত।'

বাদল সরকার অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কমিউনিকেশন বা সংযোগের উপরেই এবার গুরুত্ব দিলেন। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে সংযোগের উপর জোর দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন উভয়ের মাঝখানে বিস্তর ব্যবধান। সেক্ষেত্রে দু'দিকের ব্যবধান যতটা সম্ভব ঘোচানো উচিত। তখন তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাতে বাধায় ভরা—

এক. স্তরের বাধা অভিনেতা অভিনেত্রীরা থাকে উঁচুতে একটা স্তরে, দর্শকাসনে দর্শক থাকে নীচে, আধার ব্যালকনি থাকলে আরো এক স্তর তৈরি হয়।

দুই, দূরত্বের বাধা সবাই একদিকে বসে বলে শেষ সারিটা অনেক পেছনে। যাদের বেশি দামের টিকিট তারা থাকে সামনে। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের এই কারণে একটা অসমদূরত্ব তৈরি হয়।

তিন. আলো আর অন্ধকারের বাধা এটা সবচেয়ে বড় বাধা বলে বাদল সরকার মনে করেছেন। দর্শক নাটক দেখতে এসে তারা থাকে অন্ধকারে আর অভিনেতা থাকে আলোয়। সব কিছু করা হয় দর্শকদের জন্য, কিন্তু অভিনেতাদের ভান করতে হয় যেন তারা নেই। তাদের হাঁচি-কাশি বন্ধ, চুপ করে বসে একদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

এই বাধাগুলো কীভাবে দূর করে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান কমানো যায় সেই বিষয়টি বাদল সরকারকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরলেও প্রসেনিয়ামেই নাটক করে গেছেন

পুরো ছয়ের দশক। এবার যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি বহুদিন আগে দেখা সেই 'থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড' পদ্ধতিকেই বেছে নিলেন। দর্শকের সমস্তরে নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে অভিনয় ক্ষেত্রটা ভাগ করে নিলেন। এখানে প্রচলিত মঞ্চ আর থাকল না, মঞ্চ ব্যবস্থারও কোনো আয়োজন থাকল না। তাদেরই একটি অংশে মেঝের ফাঁকা জায়গাটাকেই মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হল। দর্শক ও অভিনেতা উভয়ই আলোতে একই ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। একই সমতলে দাঁড়িয়ে বা বসে দর্শক অভিনয় দেখতে পারে। তৈরি হয়ে গেল অঙ্গনমঞ্চ। থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ডকেই এক-রকম ভাবে অঙ্গনমঞ্চ বলেন বাদল সরকার। প্রাথমিক ভাবে এরকম একটা চেষ্টা, তাঁর কথায় এক্সপেরিমেন্টাল শো করেন ১৯৭১ সালের ২৪ শে অক্টোবর কলকাতার অলবেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ.বি.টি.এ.) এর হল ঘরে। প্রযোজনা করলেন গৌরকিশোর ঘোষের গল্প অবলম্বনে লেখা নাটক 'সাগিনা মাহাতো'। 'সাগিনা মাহাতো' করার পর বাদল সরকারের মনে হল- 'এইটাই- করতে চাই। অনেকদিন থেকেই এই রকম একটা মঞ্চকে গ্রহণ করার ইচ্ছে জেগে উঠেছিল বাদল সরকারের মনে। কিন্তু তবুও তিনি প্রসেনিয়ামেই নাটক করে গেছেন পুরো ছয়ের দশক। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা মাথায় ছিল, কিন্তু প্রয়োগের পথ পাচ্ছিলেন না। খরচ কমানোর প্রয়োজন এবং সংযোগ বাড়ানোর তাগিদ থেকেই তিনি প্রসেনিয়ামের চিরপ্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবলেন। সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেন—

'১৯৭১ সালে যখন আমি 'সাগিনা মাহাতো' লিখলাম তখনই উপলব্ধি করলাম আমার প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় উপস্থিত। ২৪শে অক্টোবর- সাগিনা মাহাতো প্রথম মঞ্চের বাইরে অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন হলে দেখানো হল। নাটক চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই চলল নাটক। পরে আলো ঠিক করা গেলেও মঞ্চসজ্জায় লাইট ব্যবহার করা যায়নি। এই অবস্থায় অগণিত দর্শক উপভোগ করলেন নাটক। নবজাগরণের একটা ঢেউ উঠল, বুঝলাম মঞ্চসজ্জা ছাড়া নাটক চলতে পারে।

প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় হয়েছে বললেও তখনও কিন্তু বাদল সরকার পুরোপুরি প্রসেনিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। প্রসেনিয়ামেও কাজ করছেন এবং সাথে সাথে অঙ্গন মঞ্চেও কাজ করছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা নাটকই সামান্য অদলবদল করে অঙ্গন মঞ্চে করেছেন। অর্থাৎ প্রথম প্রথম শতাব্দী একই সঙ্গে দু'ধরনের থিয়েটার দর্শনকে ব্যবহার করেছেন। 'সাগিনা মাহাতো', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'আবু হোসেন' যখন প্রসেনিয়াম মঞ্চে চলছিল কল-শোও আসছিল বিভিন্ন দিক থেকে তখনি 'সাগিনা মাহাতো' নিয়ে আসেন অঙ্গন মঞ্চে। 'সাগিনা মাহাতো'-কে নিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে অঙ্গন মঞ্চের উপযোগী করে অভিনয় শুরুর পরেও, পরের বছরই ১৯৭২-এ শতাব্দী প্রসেনিয়ামে মঞ্চস্থ করলেন গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন'। এমনকি ১৯৭২-এর ৩০ অক্টোবর ইম্ফলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি প্রসেনিয়ামেই মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি লেখাও হয়েছিল সেইভাবে। অর্থাৎ অঙ্গন মঞ্চ তখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই ছিল।

অঙ্গনমঞ্চে এইসব পরীক্ষামূলক অভিনয়ের সময়ই ভারত সরকারের জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ (জুন ১৯৭১-মে ১৯৭৩) পেলেন বাদল সরকার। 'তখন মাথায় চিন্তাগুলো খুব ধোঁয়াটে। প্রসেনিয়ম থিয়েটারের দোষ খুঁজে বার করছেন। 'গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র রূপে সমন্বয়ের থিয়েটারের লক্ষ্যে কর্মপরীক্ষা তথা ওয়ার্কশপ' নামে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দায়িত্ব পেয়ে তখন তিনি নানাভাবে থিয়েটার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা করছেন। থিয়েটার

কর্মের সূত্রেই এই সময় আলাপ হয় আমেরিকার 'Environmental Space theatre' অন্যতম প্রবক্তা রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে শেখনারের সঙ্গে বাদল সরকারের প্রথম আলাপ কলকাতায়। ঐ সময়ে শেখনার ও তাঁর স্ত্রী জোয়েন শেখনার ভারতে এসেছিলেন। কলকাতায় বাদল সরকারের পিয়ারি রোডের বাড়িতে বসে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়। এমনকি 'সাগিনা মাহাতো' অঙ্গনমঞ্চে সফল অভিনয়ের পর মঞ্চে দেখা করতে আসেন রিচার্ড এবং তার স্ত্রী জোয়েন শেখনার। উভয়ের বন্ধুত্ব তৈরি হয়। কলকাতায় নানান আলোচনা সভায় এমনকি মাদ্রাজেও চলে গিয়েছিলেন বাদল সরকার শেখনার-এর সব আলোচনার মধ্যে থাকা এবং তাঁর নানান প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশায়। শেখনার ছিলেন প্রসেনিয়ামের ঘোর বিরোধী। যেহেতু বাদল সরকার প্রসেনিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন পুরোপুরি সেই কারণে প্রসেনিয়ামের ঘোর বিরোধী শেখনারকে তাঁর ভালো লাগে।

'সালটা ১৯৭১। বাদল সরকারের অঙ্গনমঞ্চের পরীক্ষার সময়। বাদল সরকার নিজেই বলেছেন রিচার্ড শেখনারের 'Environmental Space theatre' তাকে মুগ্ধ করেছে। কারণ রিচার্ড শেখনার 'Conventional proscenium stage' ব্যবহার করেননি। আর ঐ সময় বাদল সরকারও ঐ জাতীয় কিছু করার পরিকল্পনা করেছেন।

১৯৭২-এর জুলাই মাসে জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ-এর দাক্ষিণ্যেই শেখনারের আমন্ত্রণে বাদল সরকার আমেরিকায় যান। সেখানে রিচার্ড শেখনার ও তাঁর পরিচালিত 'দ্য পারফরম্যান্স গ্রুপ'-এর নাট্যকর্ম দেখেন। সেখানে তিনি দেখলেন স্টেজ ব্যবহার না করেও কীভাবে থিয়েটার করা সম্ভব। এটি আয়ত্ত করতে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Performance Group যোগ দেন। ওয়ার্কশপ করেন, রিহার্সাল দেখেন। দেখে তিনি অভিভূত হন। কীভাবে স্পেসকে ব্যবহার করা হচ্ছে, দর্শকদের কীভাবে রাখা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ ঘটছে এ সমস্তই বাদল সরকারের দেখার বিষয় ছিল। কীভাবে দর্শক নাটকীয় আবহের অংশ হচ্ছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল বাদল সরকারের কাছে। সংযোগের এক নতুন ভাষা যেন তিনি খুঁজে পেলেন শেখনারের নাট্যকর্মে। যে মানুষ এক সময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনেই বিশ্বাসী হয়ে রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি দেখলেন কিছুটা হলেও শেখনারের দল তা করতে পারে। তিনি দেখলেন থিয়েটার ও মানুষের সংযুক্তির একটা প্ল্যাটফর্ম, বাদল সরকার এটাই চান।

এর পাশাপাশি আমেরিকার জুলিয়ান বেক ও জুডিথ ম্যালিনার 'লিভিং থিয়েটার' ও বাদল সরকারকে সমৃদ্ধ করেছে। আমেরিকাতে থাকাকালীন মূলত শেখনারের সূত্র ধরেই 'লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের পরিচয় তিনি এখানে দেখলেন রাজনৈতিক দর্শনকে কীভাবে থিয়েটার শিল্পের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যে কাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে করা যায়— সে কাজ যে থিয়েটারের মধ্যেও করা যায় শিল্পিতভাবে তার উপলব্ধি ঘটল লিভিং থিয়েটার দেখে। লিভিং থিয়েটারে মতাদর্শকে থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরাটাই মূল কথা। জনসংযোগ তৈরি করা, মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব দর্শনকে ছরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা লিভিং থিয়েটারে করা হয়। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রচার না করেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনটি থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরার পাঠ পেলেন লিভিং থিয়েটারে।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার বা বিকল্প থিয়েটারের মূল কথা হল দর্শকের সঙ্গে সংযোগ। আর এখানেই এই থিয়েটার হয়ে উঠেছে বিকল্প থিয়েটার। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে এই থিয়েটার মুক্ত। প্রসেনিয়ামে দর্শক মূলত শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত; দর্শক অর্থের বিনিময়ে নাটক দেখে, উপভোগ করে অর্থাৎ

একটি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক থেকে যায়। প্রসেনিয়ামের মঞ্চসজ্জা, মেক-আপ, লাইট, সাউণ্ড সবই ব্যয়বহুল যার ফলে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে তা দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আর এই কারণে থিয়েটারকে নিরাভরণ করে বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারকে করে তুললেন— পোর্টেবল, ফ্লেক্সেবল এবং ইনএক্সপেনসেবল

১. 'পোর্টেবল' বা বহনীয় যেহেতু স্পট লাইট এসবের কোনও ব্যাপার নেই, তাই থিয়েটারের সামান্য যেসব সাজসরঞ্জাম লাগে তা সহজে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়।

২. ফ্লেক্সিবল বা নমনীয় মানে যে কোন জায়গায় করা যায়, স্টেজ দরকার হয় না, দিনের আলোয় মাঠে করা যায়।

৩. ইনএক্সপেনসেবল বা সুলভঃ থিয়েটারের দামি ও ভারি জিনিসগুলির প্রয়োজন না থাকায় গোটা ব্যাপারটাই হয়ে উঠে সুলভ। অর্থাৎ অর্থের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল নয়। বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন।

'এক বিরাট মুক্তি যেন। অ্যাদ্দিন গ্রামে যেতে পারতাম না, কারণ সেখানে আগে জানতে হত ইলেকট্রিসিটি আছে কিনা, পাকা রাস্তা আছে কিনা। এখন আর কোনও অসুবিধে রইল না, আমরা দিনের আলোয় করতে পারি, মাঠে করতে পারি, মঞ্চের প্রয়োজন নেই...।' এভাবেই 'ফ্রী থিয়েটারের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল।'

বাদল সরকার দু'টো অর্থে এই 'ফ্রি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। একটি হল'মাগনা'। মানে দেখতে গেলে পয়সা লাগে না। সবচেয়ে গরিব লোকও থিয়েটার দেখতে আসতে পারে। আর একটা মানে আছে যাতে অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। 'ফ্রি' মানে সেখানে বাঁধন নেই, মুক্ত। টাকার ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত, মঞ্চের প্রচলিত ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত, মঞ্চমায়ার আবিলতা থেকে মুক্ত, স্থানের বন্ধন থেকে মুক্ত, আড়ম্বর থেকে মুক্ত, বেশভূষা-সাজসজ্জার ভার থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তৃতীয় ধারার থিয়েটার সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই মুখ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন— 'থিয়েটার 'মানুষের ক্রিয়া', human action, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। মানুষের ঘাড়ে ক্রেতার ভূমিকা, বিক্রেতার ভূমিকা চেপে গেলে সত্যিকারের থিয়েটার ব্যাহত হয়। তৃতীয় থিয়েটারে তাই ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটা ব্যবহারিক হতে পারে, কিন্তু মানবিক সম্পর্ক বলা চলে না। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষমতা আছে মানবিক ক্রিয়া হয়ে ওঠার। বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটার এই মানবিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে। সেখানে দর্শক আসছে ফ্রি, তারা দর্শকদের ডাকছেন ফ্রি, তাতে কোন বন্ধন নেই। এখানেই বাদল সরকার কথিত তৃতীয় ধারার থিয়েটারের একটা দর্শন তৈরি হয়ে যায়। যখন ফ্রি হয়ে গেল তখন দর্শক অভিনয়ের পর যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, দানও নয়। সেটা তাদের অংশগ্রহণ। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন-

'সেই জন্য খুব গরীব জায়গাতে শো করলেও আমরা কিন্তু পয়সা তোলার চাদরটা ঘোরাই। তাদের কেন বঞ্চিত করব অংশগ্রহণ থেকে? তারা দশ পয়সা দিক, পাঁচ পয়সা দিক, দেওয়ার সুযোগটা পাক। এটা না করে জমিদারি সুলভ মনোভাবে যদি ভাবতাম তাদের পয়সা নেই তাই পয়সা নেব না— তাহলেই কিন্তু ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা স্তর বিভেদ চলে এল। ওরা নিম্নস্তর, আমরা উচস্তর। আমরা সমান পর্যায়ে সবাইকে দেখি, দেখতে চাই, যেহেতু তা ফ্রি। এটাই মানবিক ক্রিয়া। এর সঙ্গেই দর্শনটা এসেছে।'

বাদল সরকার বিশ্বাস করেন, থিয়েটার সর্বসাধারণের। আর এটা বাস্তবায়িত করেছেন থিয়েটারকে একেবারে দেশের দরিদ্রতম মানুষটির কাছে হাজির করে। এর আগে থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, শহরের গ্রুপ থিয়েটারে অনেক বিপ্লবী থিয়েটার হয়েছে, তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বললেও তা একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা আমাদেরই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ। তারা কখনই সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি হতে পারে না। যারা শ্রমজীবী জনসাধারণ, যারা শ্রমিক মজুর তারা সেই প্রসেনিয়ামে পৌঁছোচ্ছে না। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারের মাধ্যমে সেই সব মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে গেলেন।

পত্র ডিএসই -৪০৫

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-২

থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকার

ইংরেজদের হাত ধরেই আমাদের দেশে আধুনিক থিয়েটারের প্রবেশ ঘটে। 'থার্ড থিয়েটার' হল আধুনিক থিয়েটারের ইতিহাসে নাট্যাভিনয় উপস্থাপনার একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি। আধুনিক নাটক পরিচালনার একটি নতুন ধরনের ফর্ম বা আঙ্গিক এই 'থার্ড থিয়েটার'।

থার্ড থিয়েটার আসার পূর্বে নাটক অভিনয়ের একটি নির্দিষ্ট জায়গা থাকত। আমাদের দেশের যাত্রার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরকম। গ্রাম বা শহরের একটি নিদিষ্ট জায়গায় অগণিত দর্শকের মাঝখানে নাটক বা যাত্রা অভিনয় হত। এইসব নাটক অভিনয়ের দর্শক ছিলেন কখনও আমন্ত্রিত, কখনও নিমন্ত্রিত, আবার কখনও টিকিট কেটে—যেভাবেই হোক নাট্যপ্রযোজনার নির্দিষ্ট জায়গায় দর্শক সম্প্রদায় হাজির হতো, তাদের সামনে নাটকের কলাকুশলীরা অভিনয় করতো। থার্ড থিয়েটার অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি পাল্টে গেল। এই ক্ষেত্রে আর আগের মতো কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা নাট্যশালায় অভিনয় সীমাবদ্ধ থাকলো না। থার্ড থিয়েটার'—অভিনয়ের এই নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে, দর্শকের আগমণের জন্য অপেক্ষা না করে, সোজা চলে এলো দর্শকের কাছে। দর্শক থিয়েটারে এলো না, নাটকের দল দর্শক খুঁজে নিয়ে তাদের সামনে প্রস্তুত হয়ে নাট্যানুষ্ঠান শুরু করল। 'থার্ড থিয়েটার' পূর্বের প্রচলিত 'প্রসেনিয়াম থিয়েটারে'র গণ্ডী ভেঙে জনতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে উপস্থিত হল। অর্থাৎ এতদিন দর্শক থিয়েটারে নাটক দেখতে যেত, থার্ড থিয়েটার আসার পরে নাটক বা থিয়েটার পৌঁছে গেল দর্শকের কাছে।

ইংরেজদের আসার পূর্বে আমাদের দেশে খোলা আকাশের নিচে, শামিয়ানা টাঙিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে অভিনয় আগেই হত। এইদিক থেকে লোকনাট্য বা যাত্রা-এটাই প্রথম থিয়েটার। অবশ্য এই লোকনাট্য বা যাত্রার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট একটি জায়গায় অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। দর্শকঘেরা নির্দিষ্ট স্থানের মাঝখানের একটি উঁচু স্থানে অভিনয় চলত। চারিদিকে দর্শকেরা বসত ঠাসাঠাসি করে। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে ঐ খানিকটা খোলা স্থানেই প্রাণের আনন্দ রূপ পেত। প্রাণের অনাবিল আনন্দে মনের মাধুরী মিশিয়ে নাটকের অভিনয় দর্শকের মাধ্যমে আনন্দরস উপভোগ করতেন অগণিত দর্শক। দর্শকের মাঝখান দিয়েই অভিনেতা অভিনেত্রীরা যাতায়াত করতেন। সেখানে একটা আড়াল থাকত, যেখানে শিল্পীরা বিশ্রাম নিতেন, পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতেন। সেখানে নট-নটীদের সাজসজ্জা হত, যাত্রার উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদ, মেক-আপ দেওয়া হত, রাজাকে রাজা কিংবা রানীকে রানী সাজাবার চেষ্টা করা হতো। এখানে অভিনয়ে অনেক ক্ষত্রে স্থূলরসের অভিনয় হতো। বিভিন্ন ধরনের সুরযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকতো। প্রথম দিকে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র এবং পরবর্তী সময়ে দেশি-বিদেশি উভয় ধরনেরই যন্ত্র ব্যবহার করা হত। আলোর ব্যবস্থাও থাকত অভিনয়ের স্থানে। ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকনাট্য-যাত্রায় হ্যারিকেন থেকে

পেট্রোম্যাক্স, পেট্রোম্যাক্স থেকে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের প্রযুক্তি ঢোকানো হচ্ছে থিয়েটারে।

আমাদের দেশের 'ফার্স থিয়েটার' যদি লোকনাট্য-যাত্রা হয়, তবে 'প্রসেনিয়াম মঞ্চ হচ্ছে— 'সেকেণ্ড থিয়েটার'। দেশীয় লোকনাট্য বা যাত্রার রীতিকে উন্নত করে কিন্তু ইংরেজদের প্রসেনিয়াম মঞ্চ তৈরি হয়নি। এই প্রসেনিয়াম মঞ্চব্যবস্থা এদেশে এসেছে পুরোপুরিভাবে ইংরেজি থিয়েটার থেকেই এসেছে। ইংরেজদের আধুনিক থিয়েটার তিন দিক বদ্ধ ও একদিক খোলা। একটি মঞ্চ প্রেক্ষালয়ের একপাশে থাকে। অভিনয়ের মঞ্চটি থাকে উপবিষ্ট দর্শকের দৃষ্টির তলে (আই-লেভেলে)। সামনের খোলা অংশে পর্দা থাকে, প্রয়োজনে রাখা হয়, আবার অভিনয়ের সময়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। পর্দা সরলে ভেতরের মঞ্চে উইংস থাকে যেখান দিয়ে নট-নটীরা মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করে। মঞ্চে থাকে সেট-সেটিংস মঞ্চ ব্যবস্থা থাকে। আলোর ব্যবস্থা থাকে। সুরযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। শিল্পীরা চরিত্রের উপযোগী সাজসজ্জা ও মেকআপ নিয়ে অভিনয় পরিবেশন করেন। অভিনয়কে শ্রুতিমধুর করতে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। দর্শক বসে থাকে মঞ্চ থেকে দূরে অডিটোরিয়ামে। দর্শক থেকে দূরে উচ্চতলে ঘেরা মঞ্চে অভিনয় চলে। অর্থাৎ দর্শক এবং শিল্পীরা একই সমতলে অবস্থান করেন না। এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার এখানে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট থিয়েটার-বাড়ি থাকে, সেখানে দর্শক হাজির হয়। বাক্সবন্দি ঘেরাটোপ দেওয়া মঞ্চের থেকে দূরে থেকে দর্শকরা অভিনয় উপভোগ করেন। সেখানে দর্শকের সঙ্গে নট-নটীর দূরত্ব অনেক বেশি। দর্শক অভিনয় উপভোগ করে, আনন্দরস আস্বাদন করে, ক্ষোভ-ক্রোধও জানায় কিন্তু দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় অনেক বেশি। তবুও সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রসেনিয়াম মঞ্চের প্রসারই হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

ইংরেজরা এদেশে প্রবেশের পূর্বে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে লোকনাট্য-যাত্রা, ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম মঞ্চের আদলে গড়ে উঠেছে আমাদের শহুরে থিয়েটার। আমাদের দেশের এই দুই ধরনের থিয়েটারের বাধা অতিক্রম করে বেরোনোর চেষ্টা করে বিকল্প রাস্তার খোঁজ করেছেন অনেক নাট্যপ্রযোজকেরা। থিয়েটারের বাঁধাধরা গণ্ডী থেকে মুক্তির একটা ইচ্ছা তাতে লক্ষ্য করা যায়। দর্শককে আরো বেশি করে নাটকের কাছে পাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায় এখানে।

নাটককে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করার প্রবণতা জার্মানীতে ব্রেখটই প্রথম করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে জার্মানের হিটলার শাসনের ভয়াবহ সেই পরিমণ্ডলে ব্রেখট আরো বেশি করে দর্শকের সঙ্গে সংযোগের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাই প্রায়শই তিনি নাটক চলাকালীনই প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। নাটক থামিয়ে রেখে দর্শককে নাট্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে বলেছেন। অনেকসময় নাটকের বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন দর্শকের সামনে। প্রসেনিয়ামের গণ্ডী ভেঙে মঞ্চকে তিনি অনেক সময় দর্শকের কাছে নিয়ে চলে এসেছেন। অভিনেতারাও অনেক সময় দর্শকের মধ্যে চলে যান, দর্শক থেকে উঠে আসেন, আবার অভিনয়কালে দর্শকের সঙ্গে অবিরাম সংযোগ রক্ষা করেন। ব্রেখটের কাছে থিয়েটার ছিল একটি দর্শন, শুধু অভিনয় রীতি বা আঙ্গিক নয়। এই নাট্যদর্শনের মাধ্যমে দর্শককে তিনি একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। মার্কিনি সমালোচকদের প্রচারের ঠেলার ব্রেখট হয়ে উঠেছে একটা রীতি, তার দর্শনকে চাপা দেওয়া হয়েছে রীতির কায়দায়।

পোলাণ্ডের একজন বিখ্যাত নাট্যবিদ গ্রোটোস্কি প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভেঙে দিয়ে 'অঙ্গন মঞ্চে'-এর পরিকল্পনা করেন। প্রসেনিয়ামের ঘেরা মঞ্চব্যবস্থা গ্রোটোস্কি ভেঙে দিলেন। প্রসেনিয়ামের জায়গায় 'অঙ্গন মঞ্চ' প্রবর্তন করলেন। একটি বড় হল ঘরের একদিকে শিল্পীরা রইলেন। তার চারদিকে ঘিরে বসল দর্শক। এই ক্ষেত্রে দর্শক এবং শিল্পীরা একই সমতলে অবস্থান করেন। এই ঘনিষ্ঠ থিয়েটারে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দর্শক অভিনয় স্থলের খুব কাছে, একই তলে থাকছে। একই আলোকবৃত্তে, দর্শকের সামনে পাশে পিছনে অভিনেতারা যেতে পারছে। দর্শককে একান্ত আওতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। দর্শকের সঙ্গে কলাকুশলীদের যোগাযোগ অনেক বেশি আন্তরিক হয়ে থাকে।

যদিও এটা একটা নির্দিষ্ট বদ্ধ জায়গায়, তবুও এখানে দর্শকের সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের যে বাঁধা ছিল তা, অঙ্গনমঞ্চে রইল না। অঙ্গনমঞ্চে নাটক অভিনয়কালে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় গৃহবন্দি হয়ে দর্শককে অভিনেতার মুখোমুখি হতে হয়।

এইভাবে বাধাবন্ধ থিয়েটারের গণ্ডী অতিক্রম করে দর্শকের মুখোমুখি নাটককে উপস্থাপন করার এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্য দিয়েই মূলত 'থার্ড থিয়েটার'-এর জন্ম হয়। রবার্ট ব্রুস্টাইন 'Third Theatre' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। সেখানে তিনি প্রথম তাত্ত্বিক ভাবে এই থিয়েটারের আঙ্গিকগত দিক এবং প্রযোজনার দিক নিয়ে আলোচনা করেন। থার্ড থিয়েটারের ফর্ম-ই যে নাটক ও দর্শককে সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে সে মতামতও তিনি দিলেন। অর্থাৎ থার্ড থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো দর্শককে নাটকের আরও বেশি কাছে নিয়ে যাওয়া।

থিয়েটারের অত্যাধুনিক এই 'ফর্ম' 'থার্ড থিয়েটার' নামটি ব্রুস্টাইন-এর গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে। লোকনাট্য ও প্রসেনিয়াম-এই দুই থিয়েটারের রীতিকে স্পষ্টত বর্জন করে নয়, অভিনব ও অভাবিত কোনো কিছু সৃষ্টি না করে, পূর্বের দুটি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে এবং দুইয়ের মিলন ঘটিয়ে তৈরি করা হল 'থার্ড থিয়েটার' ধারণা। প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভেঙে বেরিয়ে আসার কারণ সম্বন্ধে ব্রুস্টাইন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে- 'থিয়েটারে স্বভাববাদী বাস্তব বিশ্বের সেট-সেটিংস অপ্রয়োজনীয়। থিয়েটারের কারবার জীবন্ত মানুষ নিয়ে 'A live person directly to another live person'—তাই বাস্তব রসের কারণ দেখিয়ে বাস্তব সম্মত মঞ্চব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই।'

এইভাবে বিভিন্ন দেশে এই ভাবনা নিয়ে 'থার্ড থিয়েটারে'র ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাতেও 'থার্ড থিয়েটারে'র ধারণা এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় থার্ড থিয়েটারের উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম বাদল সরকার, তিনি তাঁর 'শতাব্দী' নাট্যদল নিয়ে প্রসেনিয়াম মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে 'থার্ড থিয়েটারে'র অভিনয় করতে চেষ্টা করেন।

থার্ড থিয়েটার মূলত গ্রামকেন্দ্রিক ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। গ্রামকেন্দ্রিক লোকনাট্য এবং নগরকেন্দ্রিক প্রসেনিয়াম থিয়েটার- শহুরে বাবুদের থিয়েটার-এই দুই থিয়েটারের ত্রুটিকে বর্জন করে তৃতীয় থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। বাদল সরকারের মতে— 'Workshop for a theatre of synthesis as rural-urban link' গ্রাম, নগরের থিয়েটার প্রচেষ্টার একটি স্বাঙ্গীকৃত উপস্থাপনা হলো এই থার্ড থিয়েটার' এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য হলো-বিগত দুই থিয়েটারের ফর্মকে বিশ্লেষণ করে তাদের নির্দিষ্ট দুর্বলতা ও শক্তির কেন্দ্রটিকে খুঁজে বের করা এবং সেখান থেকেই পেয়ে যাব এই দুই থিয়েটারের স্বাঙ্গীকরণের হদিশ যার মধ্যদিয়ে একটা নতুন থিয়েটার তৈরির চেষ্টা করা যেতে পারে, যাকে বলতে পারি থার্ড থিয়েটার।'

'What we need to do is to analyse both the theatre form to find the exact points of strength and weakness and their causes, and that may give us the clue for an attempt to create a theatre of synthesis a Third Theatre— [The Third Theatre—Badal Sarkar]

থার্ড থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই 'a theatre of synthesis' — কথাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। লোকনাট্য বা প্রসেনিয়াম মঞ্চের synthesis এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে থার্ড থিয়েটার 'to create a link between the two।'

থার্ড থিয়েটার গড়ে ওঠবার প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করা যাক:

এক. লোকনাট্য-যাত্রা (গ্রামীণ)
দুই. প্রসেনিয়াম থিয়েটার (শহুরে) / (বিদেশী প্রভাবিত থিয়েটার) → তিন. থার্ড থিয়েটার

ক. অঙ্গনমঞ্চ— (প্রসেনিয়ামের সরলীকৃত রূপ)	খ. মুক্তমঞ্চ— ফ্রী থিয়েটার	পথ নাটক স্ট্রিট থিয়েটার
	—	পোস্টার ড্রামা

থার্ড থিয়েটারের দুটি রূপ প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে। 'অঙ্গনমঞ্চ এবং 'মুক্তমঞ্চ। প্রসেনিয়াম মঞ্চের সরলীকৃত রূপ হলো 'অঙ্গনমঞ্চ'। এখানে মঞ্চ থাকছে, মঞ্চ ব্যবস্থাও থাকছে। তবে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কোনো বাধা থকছে না। এখানে ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি। একটি হলঘরের চারিদিকে দর্শক একদিকে যেমন বসে থাকে তেমনি আবার দাঁড়িয়েও থাকে অনেকে। তাদেরই একটি অংশে 'অঙ্গনমঞ্চ' তৈরি হয়। তৃতীয় থিয়েটারে একই আলোকবৃত্তে অভিনেতা ও দর্শক অবস্থান করে এবং দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে দূরত্ব ও পার্থক্য অনেক কমে যায়।

প্রথাবদ্ধ মঞ্চ ভেঙে, আলোকবৃত্তের ধারণা বদলে দিয়ে এবং একই সমতলে অবস্থান করা যায়, এইরকম মঞ্চব্যবস্থা করা হলো। 'অঙ্গনমঞ্চে' Level, Location ও Light-spot-এই তিন 'L'-এর অবসান ঘটে যায় এই মঞ্চে। অভিনেতা ও দর্শকের দূরত্বও দূর করা যায় এখানে। প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হলো এই 'অঙ্গনমঞ্চ'। এই অঙ্গনমঞ্চে দর্শকের খুব কাছে চলে আসার ফলে দর্শক যেমন অভিনয়ের সঙ্গে মিশে যেতে পারে তেমনি অভিনেতাও দর্শককে কাছে পেয়ে তার সঙ্গে ভাব ও ভাবনার বিনিময় অতি স্বচ্ছন্দে ও তীক্ষ্ণভাবে করতে পারে। তাই অভিনয়ের সময়ে অভিনেতা তার শরীর, স্বর ও ব্যক্তিত্বকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে এই অঙ্গনমঞ্চে। ফলে এই অঙ্গনমঞ্চে দর্শক এবং অভিনেতাদের যোগাযোগ তৈরি হয় অনেক বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে।

এই দেশে অঙ্গনমঞ্চের প্রথম নিষ্ঠ ব্যবহার দেখা গেল বাদল সরকারের শতাব্দী নাট্যদলের অভিনয়ে। ১৯৭১-এর ১৮ জুন কলকাতার এ. বি. টি. এ. হলে 'সাগিনা মাহাতো' অভিনয় হলো এই অঙ্গনমঞ্চের আঙ্গিকে। তারপর ১৯৭২-এর ১২ নভেম্বর, একাডেমি মঞ্চে 'স্পার্টাকুস' অভিনীত হলো-প্রসেসিয়াম মঞ্চে অঙ্গনমঞ্চের, আদলে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়ে শতাব্দী এতদিন প্রসেনিয়াম মঞ্চেই নাটক করেছে। ১৯৭১ থেকে শুরু করল অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়।

অন্যদিকে মুক্তমঞ্চ হয়ে গেল একেবারে খোলা। খোলা আকাশের নিচে কোনো মঞ্চ ও মঞ্চব্যবস্থা ছাড়াই

অভিনয়ের উদ্যোগ শুরু হলো। অঙ্গন মঞ্চে দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব দূর করার চেষ্টা ছিল, তবুও একটা বাঁধা ছিল। আর সেই তা হল, জায়গার নির্দিষ্ট অবস্থান। সেখানে নাট্যদল নিয়ে দর্শকের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

মুক্তমঞ্চের ক্ষেত্রে সেই বাঁধাও কাটিয়ে উঠলো নাট্যকর্মীরা। আমাদের দেশে বহুরূপীর দল যেমন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে তাদের অভিনয় ও কলাকৌশল দেখিয়ে বেড়াত; কিংবা চৈতন্যদেব যেমন নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের কথা মন্দির-চাতাল কিংবা গৃহাঙ্গন থেকে সরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় জনতার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলেন; ঠিক তেমনি মুক্তমঞ্চের দল প্রসেনিয়াম মঞ্চ কিংবা অঙ্গনমঞ্চের সীমারেখা ছাড়িয়ে দর্শকের কাছে গিয়ে হাজির হতে থাকলো। মুক্তমঞ্চের অভিনেতার দলই হাটে-মাঠে গিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়ে অভিনয় শুরু করে দিচ্ছে। আগে দর্শক আসত অভিনয় দেখতে, এবার নাট্যদল চলে গেল অভিনয় নিয়ে দর্শকের কাছে। আর কোনো বাঁধা আর রইলো না। প্রসেনিয়ামের ঘেরাটোপ মুক্তি পেয়েছিল অঙ্গনমঞ্চে, আর অঙ্গনমঞ্চের চার দেওয়ালের গণ্ডী দূর হলো মুক্তমঞ্চে। খোলা মাঠের এই মুক্তমঞ্চ—এখানে সব খোলা, সব উন্মুক্ত—দর্শক অভিনেতা একাকার। সূর্যালোক ছড়ানো আকাশের নিচে ঘাস বিছানো মাটিতে, মানুষ পথ চলতে চলতে দর্শক হয়ে গিয়ে বসে পড়লো মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে। একই সমতলে, একই আলোর বৃত্তে, একই আকাশ ও ঘাসের মধ্যে, জনগণের প্রচণ্ড কৌতুকের মধ্যে, জনতার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে, জনগণের সামনে এই যে অভিনয়, তাইতো মুক্তমঞ্চ থার্ড থিয়েটার।

মুক্তমঞ্চে কোনও মঞ্চ নেই, মঞ্চব্যবস্থা নেই, আলো নেই, যন্ত্রানুষঙ্গ নেই, দৃশ্যসজ্জা নেই, সাজসজ্জা নেই, মেকাপ নেই। মুক্তমঞ্চের অভিনয় হলো একেবারে সাদামাটা গোছের। আগের অন্য থিয়েটারের প্রকরণগত দিকগুলির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল মুক্তমঞ্চে। প্রথম থিয়েটার যেমন লোকনাট্যের কাছাকাছি ছিল, মুক্তমঞ্চও ঠিক কিছুটা সেই ধরনের। তবুও লোকনাট্যে কিছু ছিল যেমন— সাজসজ্জা, মেকাপ, আলোর ব্যবস্থা ছিল, ছিল নির্দিষ্ট করা অভিনয়ের জায়গা। তাই তার সঙ্গে মুক্ত মঞ্চের পুরো মিল নেই।

মঞ্চের কোনো কৃত্রিম উপাদান খুব বেশি নেই বলে থার্ড থিয়েটারে অভিনেতাদের অভিনয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। অভিনেতাদের সাজসজ্জা, মেকাপ থাকছে না, থাকছে না আলো কিংবা দৃশ্যসজ্জা-মঞ্চমায়া (illusion) সৃষ্টির কোনো উপকরণই থাকছে না। তাই শুধুমাত্র উপস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিত্ব, চেহারা, স্বরক্ষেপণ, দৈহিক সক্ষমতা তাদের সম্বল। আবহসঙ্গীত ব্যবহারেরও তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। তাই নাচে, গানে, অভিনয়ে, নানা কোরিওগ্রাফির নিমিতিতে সক্ষম নট-নটীর পক্ষেই এই থিয়েটারে অভিনয় সম্ভব। প্রেক্ষাগৃহ, আলো, মঞ্চ, পোশাক, মেকাপ, আবহ, যন্ত্রানুষঙ্গ- মঞ্চমায়ার সমস্ত আবিলতা মুক্ত হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী সটান দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে নাটকের ভাব ও ভাবনা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক মনে সঞ্চারিত করে দেন। এর সংলাপ তাই তীক্ষ্ণ, স্থিরনিবদ্ধ। মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে স্বরক্ষেপণও হওয়া চাই সাবলীল ও সতেজ। কণ্ঠে গান চাই, আবার প্রয়োজনে কণ্ঠে ফুটে উঠবে যন্ত্রানুষঙ্গের কাজ।

থিয়েটার কারবার করে জীবন্ত মানুষ নিয়ে। জীবন্ত অভিনেতা তার অনুষ্ঠান নিয়ে যাবে জীবন্ত দর্শকের কাছে। সেখানে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজন নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই অবাধ সংযোগের কারণে মুক্তমঞ্চকে হতে হবে নমনীয়, যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় অভিনয় করা যায়। সেই কারণেই মুক্তমঞ্চের

নাটককে হতে হবে বহনীয়, যাতে সহজেই একস্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। মুক্তমঞ্চের অভিনয় হতে হবে সুলভ, যাতে করে খুব কম খরচে যাতে অনুষ্ঠান করা যায়। অর্থের ওপর যাতে পুরোপুরি নির্ভর করতে না হয়। মানুষ দর্শক হয়ে বিশেষ স্থানে আসবে, এই অপেক্ষায় না থেকে, যেখানে মানুষ থাকে, কাজ করে, সেইখানে নিজেরাই পৌঁছে, থিয়েটার করে মানুষকে দর্শকে পরিণত করে নেওয়া হচ্ছে। এখানে থিয়েটারের ক্ষেত্র এবং বিষয়বস্তু, বক্তব্য পৌঁছে দেবার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক সুদূরপ্রসারী।

আলোচ্য শর্তগুলি মেনে নিয়ে অভিনেতা ও দর্শকের যৌথ অংশগ্রহণ স্বভাবতই মুক্তমঞ্চের বিশিষ্ট অঙ্গ। তবে এই যৌথ অংশগ্রহণে আগের থিয়েটারে তিনটি প্রতিবন্ধকতা প্রবলভাবে কাজ করেছিল। ১. দূরত্ব, ২. তল বা লেভেল, ৩. আলো আর অন্ধকার। প্রসেনিয়াম ফ্রেমে এই তিনটি বাঁধা থাকছে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে। থার্ড থিয়েটারের মুক্তমঞ্চে এসব প্রথাবদ্ধ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাই একে 'ফ্রী থিয়েটার'ও বলা যায়। সর্ব অর্থেই 'ফ্রী'। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সংযোগের মুক্তি। স্বভাবের মুক্তি ঘটে প্রথমে অভিনেতার, তারপরে দর্শকের। প্রকৃত অর্থেই তাই 'ফ্রী'। অর্থাৎ আগের থিয়েটার পদ্ধতিগুলির থেকে থার্ড থিয়েটার অনেকটাই সীমিত ব্যায়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

মনে রাখতে হবে, ফ্রী থিয়েটারের দর্শক ক্রেতা নয়- তারা শুধুই নাট্যরসের উপভোক্তা। অভিনেতাও বিক্রেতা নয়- তারাও এখানে শিল্পী, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল দর্শকের মধ্যে নাট্যবোধ গড়ে তোলা। এখানে মানুষ নিজের কথা অন্য মানুষকে বলতে বা বোঝাতে চাইছে। তাই সে দর্শকের কাছে, মানুষের কাছে চলে গিয়েছে। সেখানে সকল দর্শকের জন্য অবারিত দ্বার। তাই তাদের প্রবেশও অবাধ। এখানে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার টিকিট কেটে থিয়েটার দেখতে যেতে হয় না। টাকার অঙ্কেও দর্শক আসন নির্দিষ্ট নয় এখানে। তবে দর্শক খুশি মনে টাকা দিলে সে দান নেওয়া হয়। এই দানও যৌথ অংশগ্রহণের এবং স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগের দান। খরচের টাকার কিছু এইভাবেও উঠে আসতে পারে। এইকারণেই থার্ড থিয়েটারকে তাই ফ্রী থিয়েটার বলা হয়।

প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটারে ব্যবসায়িক লাভালাভের দিকটি রয়েছে। থার্ড থিয়েটারে লাভালাভের প্রসঙ্গ নেই। রয়েছে গণসংযোগের প্রশ্ন। নাটক জীবন্ত কলামাধ্যম- লাইভ শো। এখানে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ- ডিরেক্ট কমিউনিকেশান। তাকে কাজে লাগাতে গেলে দুদল মানুষের (অভিনেতৃদর্শক) মধ্যেকার দূরত্ব ও বাঁধাগুলি সরিয়ে দিয়েই থিয়েটার করতে হবে। থার্ড থিয়েটার তাই ফ্রী থিয়েটায়।

ঠিক এর বিপরীত একটি আন্দোলন ইউরোপে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই থিয়েটারকে বলা হয় 'ফোর্থওয়াল থিয়েটার'।

গত শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপে বাস্তববাদী নাট্যরচনা ও প্রযোজনার যে ধারা চালু হয়েছিল। তার সূত্রপাত 'থিসিস-নাট্য' ধারা থেকে। আলেসান্দর ছমা (পুত্র) তাঁর নাটক 'অবৈধপুত্র' (ল্য ফিস নাতুরেল)-তে এই রকম রচনার শুরু করেন। এই থিসিস নাট্য বা 'পিয়েস আ খেজ' ধারার অগ্রগতিতে হলো 'চতুর্থ প্রাচীর' ভাবনার শুরু। ল্যাসাজ, দাঁকুয়, রবার্টসন এই ধারা টেনে নিয়ে যান। বাস্তববাদী নাট্য রচনার সঙ্গে এ'রা মঞ্চ পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তৈরি হচ্ছিল মঞ্চ প্রযোজনার বাস্তববাদী ধারা। যার চরম পরিণতি বিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ার স্তানিস্লাভস্কি।

পত্র ডিএসই -৪০৫

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৩

অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক

নিয়মবদ্ধ নাটকের বিপরীতে, যাকে ইংরেজি পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে সুসংহত 'নিয়মবদ্ধ নাটক', তারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম ফসল অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটক। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, মঞ্চরীতি, অভিনয় ইত্যাদি সমস্ত বিভাগেই সেই নাটক স্বতন্ত্র। তবে সাধারণভাবে এ কথা ঠিক যে অ্যাবসার্ড নাটক হিসাবে পরিচিত হলেও এই নামে কোন নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন সাহিত্যতাত্ত্বিক এই আন্দোলনকে উল্লেখ করেছেন The Theatre of the Absurd হিসাবে। যে বিশিষ্ট মানসিকতা থেকে এই ধরনের নাট্যদর্শ্যের জন্ম, তা বুঝতে গেলে কিছু পূর্ববর্তী কালের সামাজিক রাজনৈতিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কথা আমাদের জানা অবশ্য কর্তব্য।

অ্যাবসার্ড বা উদ্ভটনাট্যের অন্তর্নিহিত যে দর্শন তার শুরু বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর ইউরোপে। অভিব্যক্তিবাদ ও পরাবাস্তববাদ এর মত ব্যক্তিক চিন্তার উৎকেন্দ্রিকতায়। কাফকার The Trial ও Metamorphosis এর ধোঁয়াটে জগতে, যেখানে ব্যক্তি মানুষ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, ভয় যন্ত্রণা বিকারের অসহায় লক্ষ্যবস্তু। তবে অর্থহীনতা ও শূন্যতার অ্যাবসার্ড দর্শন পূর্ণতার রূপ পেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্তিবাদী দার্শনিক জা পল সার্ত ও ক্যামুর হাতে। মানুষকে দেখা হল এক নির্বান্ধব, বহির্বিশ্বে বিচ্ছিন্ন, বিপন্ন এক জীব হিসেবে, যার সামনে কোন উদ্দেশ্য নেই, যার দিন যাপনের কোন অর্থ নেই, শূন্য থেকে শুরু আর শূন্যেই শেষ, এ এক পীড়িত উদ্ভট অস্তিত্ব। শূন্যতায় যেহেতু প্রথম ও শেষ কথা তাই অর্থহীন উদ্ভট যন্ত্রণা ছাড়া, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, অবসাদ ও হতাশ, মৃত্যুকামনা, তুচ্ছ ঘটনা বিক্ষেপ এর মধ্যে রুটিন নিবন্ধ দিনাতিপাত ছাড়া মানুষের আর কিছু করবার ছিল না।

১৯৬১ সালে মার্টিন এসলিন সর্বপ্রথম অ্যাবসার্ড নাটক শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ—Theatre of the অবসার্ড এ। তিনি স্যামুয়েল বেকেট, আর্থার অ্যাডামভ, আয়োনেস্কো, হ্যারল্ড পিন্টারের বেশ কয়েকটি পরস্পর সাদৃশ্য যুক্ত নাটককে অ্যাবসার্ড নাটক বলে চিহ্নিত করেন। নাটকগুলি রচিত হয়েছিল ঠিক তার আগের দশক জুড়ে। কাকতালীয়ভাবে অনেক শিল্পী প্যারিসে থেকে ফরাসি ভাষায় নাটক রচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু তারা জন্মসূত্রে সকলে ফরাসি নন। যেমন—ব্রেখট ছিলেন আইরিশ, রুশ, রুমানিয়ো এবং জেনে ফরাসি। তবে প্রত্যেকের চেতনায় একটা ধারণা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল যে তারা প্রত্যেকেই সমাজের কাছে একজন আউটসাইডার। আর এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাই ছিল তাদের সাধারণ মানসিক সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। এসলিন এই সাধারণ ধর্মের উপর ভিত্তি করেই ১৯৫০-৬০ এর মধ্যে রচিত বেশ কিছু নাটককে অ্যাবসার্ড নাটকের শ্রেণিভুক্ত করেন।

অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম ফ্রান্সে হলেও পরবর্তীতে তা ইউরোপের আরও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আমেরিকা ও রাশিয়াতেও এই নাটকের চর্চা দেখা যায়। ফলে দেশ কাল ভেদে দর্শনের মূল কাঠামোতে লাগে নতুন মাটি, তৈরি হয় বিভিন্ন অবয়ব। তবে মূল শক্তি বদলায় না। বিষন্নতা বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা ও লড়াই করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠা এক ব্যক্তির হৃদয়ের আভাস পাওয়া যায় প্রতিটি নাটকের মধ্যেই।

Absurd শব্দটির মূল শব্দ ল্যাটিন Absurdus, Ab মানে Form এবং Surdus মানে Deaf, Inandible, Dull। Absurdus মানে out of fashion। আবার Oxford Advanced Learner's Dictionary (9th Edution) বলছে Absurd শব্দের অর্থ Completely Rediculous, not logical and sensible অর্থাৎ এমন ধারণা যা সম্পূর্ণ হাস্যকর, অযৌক্তিক এবং বোধের অগোচর। Dictionary of Phulisophy জানাচ্ছে মূল শব্দটির দার্শনিক অর্থ—'Reduction of absurditya term for the piintless or meaningless nature of human life and action. এছাড়া The Cambridge Guide to world Theatre এ Ruby Cohn অ্যাবসার্ড নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনম—'..... plays of the absurdthat presented man's metaphysical absurdity in aberrant dramatic style that mirrored the human situation. আবার Absurdist এর অর্থ হল 'The belief that human exist in a world with no purpose or অর্ডার। আমরা সাহিত্যে এই অর্থটিকে খুব বেশি রকম প্রযুক্ত হতে দেখি।

ওপরে উল্লিখিত এইসব আভিধানিক ও দার্শনিক অর্থ ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয় অ্যাবসাডিটির প্রাথমিক ধারণা। যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। পৃথিবীতে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাই না আর এক উদ্দেশ্যহীন সীমাহীন অর্থহীন অবিরত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকাটাকে কেবল মরতে না পারার যন্ত্রণা হিসেবে যাপন করে, তখনই রূপ পায় এবসার্ডিটি। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যেকার পার্থক্য, কল্পনা ও প্রাপ্তির অভ্যন্তরীণ দূরত্ব আজকের মানুষকে ক্রমশ তাঁর অস্তিত্বের নির্ভরতায়, আত্মবিশ্বাসের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মানসিকভাবে তৈরি করছে হতাশার এক চরম খাদ, যেখান থেকে ফেরা বা তা পার করে যাওয়া দুটোই সমান অসম্ভব। সম্ভব শুধু এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া, যেখানে বোধের ওপর কারফিউ জারি করা হয়েছে। অ্যাবসার্ড নাটকের জগত Unreality বা inner reality এর জগৎ। এখানে এমন কিছু ঘটে যা কল্পনার অতীত। বাস্তবে যার অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। অ্যারিস্টস্টল কাব্যতত্ত্বে Probable impossibility এবং Improbable possubulity এর কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাস্য কিন্তু অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য কিন্তু সম্ভব এই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই আবসাড্রিস্টগণ Improbable impossibility কে মান্যতা দিলেন। তাই দেখালেন ঘুড়িতে ১৭টা বেজে গেছে, বা মৃতদেহ বাড়তে বাড়তে একসময় আকাশে উড়ে যাচ্ছে এসবই অবিশ্বাস্য অসম্ভব ধারণার আওতাধীন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে ক্যামুই প্রথম অ্যাবসার্ড শব্দটিকে সরাসরি প্রবন্ধ গ্রন্থে ব্যবহার করেন ১৯৪২এ। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ -থেকে মিথি অফ Sisyphus এ অ্যাবসার্ড স্বাধীনতা নামক অধ্যায় তিনি বলেন— এই ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ড আমাকে আলোকিত করে এর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অতঃপর আমার অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার জন্য এটাই কারণ। তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথমত ঈশ্বরের নির্ভরতা কাটিয়ে গোপন ভাবে মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যু ও অ্যাবসার্ড কেবল স্বাধীনতার যুক্তিযুক্ত নীতি। অ্যাবসার্ড মানুষ জ্বলন্ত ও স্থির দৃষ্টি সম্পন্ন হয়, যার আড়ালে সবিস্তব্ধ এবং শূন্য। ১৯৫২ তে স্যামুয়েল বেকেট Waiting for Godot এ জীবনের অর্থ করলেন এইভাবে

—Nothing happens, Nobody comes, Nobody goes, its awful. অর্থাৎ জীবন চলনশীল, অথচ ক্রিয়া বিহীন, কোন কিছু নতুন অথবা আকর্ষণীয় বা উত্তেজক ঘটনা এ জীবনে ঘটে না, সবকিছুই চর্বিত চর্বন। অর্থাৎ থোর বড়ি খাড়া আর খারা বড়ি থোর। পরবর্তীকালে আয়োনেস্কো হয়ে ওঠেন অ্যাবসার্ডিটির প্রধান ব্যাখ্যাতা। তাঁর বক্তৃতা মালায়, একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি অ্যাবসার্ডিটির অর্থ ও দার্শনিক ভিত্তির ব্যাখ্যা করেন। একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতায় অ্যাবসার্ড ভাবনার মূল। যখন মানুষ নিজেকে জগৎ থেকে, পরিবার থেকে এবং নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সত্তা বলে মনে করে, তখনই তার আত্মনিমগ্ন হয় এক চরম বিষন্নতায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের জগতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় এজাতীয় নাটকের নামকরণ করেন কিমিতিবাদী নাটক (কিম + ইতি = এটা কী) তবে এই নামটি খুব একটা জনপ্রিয় না হওয়ায় পাশ্চাত্য দার্শনিক ভাবনা সম্বলিত ও বহুল চর্চিত। অ্যাবসার্ড নাটক নামটি আজও প্রচলিত হয়ে রয়েছে।

প্রাচ্য নাট্য তত্ত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় আচার্য ভরতকে। নাট্যশাস্ত্রে ভরত সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের -দশটি রূপভেদের কথা বলেছেন — ক, নাটক, খ, প্রকরণ, গ, অঙ্ক, ঘ, ব্যয়োগ, ঙ, ভাণ, চ, সমবকার, ছ, বীথি, জ, প্রহসন, ঝ, ডিম ও ঞ. ইহামৃগ। যদিও আমাদের বর্তমানে আলোচিত অ্যাবসার্ড নাটক এইসব নাট্যসূত্র থেকে আগত নয়, কারণ এর শিকড় রয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনে। তবু কিছু ক্ষীণসূত্র পাওয়া যেতে পারে যেমন ভাণ এ আমরা একটি চরিত্রকে একাকী মঞ্চে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে অভিনয় করতে দেখি। এক্ষেত্রে Monologue বা এককোক্তিও ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়টির সঙ্গে নাট্য রীতির দূরতম সাদৃশ্য কিছু মাত্রই হলেও পাওয়া যেতে পারে। যেমন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে লোকটির স্বগতক্তি বা উজান মৃত্যুতে সাদা ও কালো পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তির ভাণ-স্বরূপ আচরণ। তবে পাশ্চাত্য নাট্য রীতির ধারাতেই অ্যাবসার্ড আর নাটক বিচার্য। আধুনিক যুগে রূপক, সাংকেতিক, অভিব্যক্তিবাদী, একাঙ্ক ইত্যাদি নানা প্রকার নাট্য প্রকরণ পার করে অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ। কেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে বাস্তব ছবি এঁকেছেন তাই মনুষ্য চেতনায় অ্যাবসার্ডিটির জন্মদাতা। এই নতুনত্বহীন, আবেগ শূন্য, জীবনের প্রতি বিদ্বেষ ঘৃণা মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে, অথচ এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় তো মানুষের জানা নেই। এ নাটকে সময় স্থান এবং ব্যক্তির ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। জীবন ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন ছুড়ে দেয় অ্যাবসার্ড নাটক। তাই সময়ের স্বাভাবিক চলন নাটকে ব্যাহত হয়। সাধারণত অ্যাবসার্ড নাটক যখন সূচনা থেকে আবর্তিত হতে শুরু করে তখন তার বক্তব্য আরো জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয় বক্তব্য ক্রিয়া পাঠক দর্শকের মনে সন্দেহ জাগাতে থাকে। প্লটের কাহিনিহীনতা অথবা চরিত্র গুলির বিপুল স্বগতোক্তির ব্যবহার নাটক কারের বক্তব্যকে আরো ধোঁয়াশাময় করে দেয়। তাই Waiting for Godot নাটক শেষ হলেও গডোর দেখা মেলে না। Endgame এ শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় যে দর্শকের স্বাধীন বিচার শক্তির ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেন নাট্যকার। তাই প্লটের সব রকম শূন্য থাকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ পান দর্শক। এইভাবে দর্শক ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে যান নাটকে। এই সময়ের খেলায় কোন চরিত্রই নিজেদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাই না, কারণ তাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই ধূসর। তাই গল্পের শুরু ও শেষ কখনওই নিয়মানুগ নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাহিনি যেখানে শুরু হয়েছে সেখানেই শেষ হয়েছে। আবর্তনের ফলে কাহিনি খুব একটা নতুন মাত্রা সম্বলিত হতে পারে না। তাই Time and Space Theory অনুযায়ী এইসব নাটকের গঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর

অ্যাবসার্ড নাটক প্রবন্ধে জানাচ্ছেন — প্রথা সম্মত বাস্তব নাটকের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের মিল নেই। অ্যাবসার্ড নাট্যকারের অন্তর জগতে যে দর্শন দৃঢ়মূল তারই প্রতিচ্ছবি তাদের নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়। তাই তাদের চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের যে বৈপরীত্য তা নাটকেও ফুটে ওঠে।

তাই অ্যাবসার্ড নাটকের রূপায়ণে অবাস্তব, হাস্যকর, কখনওবা দুঃস্বপ্নের মত ঘটনার বিস্মৃতি দেখা যায়। মনে পড়ে T. S Eliot এর Waste land এর কথা। সেখানে গোটা পৃথিবীটাই একটা Barial of Dead এ পরিণত—প্রায়। সেখান থেকে উদ্ধারের পথ মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। ঠিক এমনই একটা আশা ভরসাহীন বিশ্বের গল্প শোনায় অ্যাবসার্ডিস্টরাও।

অ্যাবসার্ডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

১. জীবন অর্থহীন ও শূন্য।

২. চিরকালীন ভাষার প্রতি অনাস্থা, কারণ তা আর আজকের মানুষের মনোভাব পুরোপুরি ব্যাখ্যানে সমর্থ নয়।

৩. দৈনন্দিন জীবনের পৌনঃপুনিকতা মানসিক ক্লান্তির কারণ, জীবনে কোন নতুনত্ব নেই।

৪. জীবনের প্রতি চরম অনাস্থা, মৃত্যু কামনা, কখনও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শান্তিলাভ, কখনওবা মৃত্যুকেও প্রহসন হিসাবে অর্থহীন মনে হওয়া।

৫. নাট্য গঠন নিয়ম মেনে নয়। বরং নাটকের ভাব অনুযায়ী হতে পারে।

৬. অ্যারিস্টটল কথিত ত্রি ঐক্য এখানে পালিত হয় না।

৭. সংলাপ আপাত অর্থে অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক, গভীরতর অর্থও সহজবদ্ধ নয়।

৮. নাটক যেন বাস্তব ও অবাস্তবের সীমার ঊর্ধে অভিনীত হয়। সেখানে যুক্তির বদলে আবেদন রাখা হচ্ছে মানুষের বোধের কাছে, তাই অস্পষ্টতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা দেয়।

৯. এক্ষেত্রে নাট্যক্রিয়া Meta theatrically প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ এমন কিছু যা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়বহ, ট্রাজেডি নয়। তাই—

ক) সারা বিশ্বই নাট্য ঘটনার প্রেক্ষাপট বা স্টেজ রচনা করতে পারে।

খ) জীবন স্বপ্ন সম— এই ভাবনা। এই ধরনের নাটক ক্রিয়া দর্শককে আত্মসমীক্ষায় রত হতে বাধ্য করে।

১০. এ নাটকের চলন অনেকটা ট্রাজি -কমেডির মত। অর্থাৎ বিষাদঘন ট্রাজিক আবেদন নাটকের মূল। তবু কোথাও কোথাও মিশে রয়েছে কমেডির স্বস্তি।

১১. ইফতার নাটকে নৈ শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১২. অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংস, নৃশংসতাকে নাট্যমধ্যে স্থান দেওয়া হয়। যেমন The Killer এ হত্যাকারীর ভয়ংকর শিশুহত্যা।

১৩. সংলাপ অপ্রাসঙ্গিক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যময়। যেমন স্যামুয়েল বেকেটের Waiting for Godot এ এইরকম লিরিক্যাল সংলাপের দেখা মেলে।

প্রাশ্চাত্য নাটকের এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাচ্যের অ্যাবসার্ড নাটকেও দেখা যায়। তবে কিছু স্বাতন্ত্র ও

ভিন্নতাও চোখে পড়ে। অ্যাবসার্ড নাটকের মূল এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য এর উদ্ভট। নাট্যকাররা অদ্ভুত দর্শনের চর্চা করলেও তারা পাগল নন। শ্লেষ, বিদ্রুপ, রসিকতার মাধ্যমে সিরিয়াস বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাই এই জাতীয় নাটক কে বলেছেন বেশি মৌলিক,স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের মধ্যে যে শিশু আছে তাকেই পুনর্জীবিত করার চেষ্টা এর মধ্যে রয়েছে। তবে উদ্ভটত্ব কোন তত্ত্ব নয়। প্রকাশের আঙ্গিক বিশেষ। মূলতত্ত্ব শূন্যতার দর্শন। না হলে প্রাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে প্রচুর মিথ, ফেবেল, প্যারাবল বা সুকুমার রায়ের কবিতার উদ্ভটত্ব অ্যাবসার্ডিটি হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো। কিন্তু এইসব সৃজন আঙ্গিকের অন্তস্থলে শূন্যতার দর্শন কার্যকরী না থাকার কারণেই এইগুলির রূপ উদ্ভটতত্ত্ব হলেও তা অ্যাবসাডিটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পৃথিবীর এক বিষময় সময়ে সব না পাওয়াকে রূপ দিয়েছেন নাট্যকারেরা কিছু অদ্ভুত প্রতীক প্রয়োগের মাধ্যমে। আর এগুলিই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

নাট্যক্ষেত্রে ট্রাজেডি ও কমেডি বাদ দিয়ে আর কোন ফর্মই চিরস্থায়ী হয়নি। রূপক সাংকেতিক নাটক, রিয়ালিস্টিক নাটক, অভিব্যক্তিবাদী নাটক প্রতিটি আঙ্গিকই সময়ের এক বিশেষ প্রবাহে এসেছে, প্রভাব বিস্তার করেছে আবার নির্দিষ্ট প্রবাহে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে অন্য কোন ধর্মের মধ্যে কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে কখনও বা। সেই রকমই অ্যাবসার্ড নাটকও সময়ের ফসল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রিয়ালিস্টিক থিয়েটার, ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটার যখন মানুষের চাহিদাকে পূরণ করতে অসমর্থ হল, বাস্তবতা যখন মানসিকতাকে প্রতিফলিত করলো না, সম্পূর্ণতো এলো সিম্বলিস্ট থিয়েটার। মঞ্চ আলো অভিনয় সর্বত্র এলো প্রতীকের ব্যবহার। সুররিয়ালিজম এলো বাস্তবতার অ্যান্টিথিসিস হিসাবে। আর এই পরাবাস্তবেই উগ্ররূপ অ্যাবসাডিজম। কারণ এতে নাটকের প্লট, সংলাপ, সজ্জা সর্বত্রই থাকে প্রতীকায়নের ছোঁয়া। আরো থাকে অদ্ভুতত্ব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের বিশ্বাসের ভিতকে নাড়িয়ে দিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও মানুষের মুনাফার লোভ প্রথার সব ধারণাকে নস্যাৎ করে দিল। অতীত হয়ে পড়ল মূল্যহীন, ফলে রোমান্টিসিজমের জায়গায় এল নানা প্রকার অ্যান্টিথিসিস বা প্রতিতত্ত্ব। যেমন সিম্বলিজম, এক্সপ্রেশনিজম, সুর রিয়ালিজম ইত্যাদি। তবে এসবই মডার্নিজমের বিবর্তনের ধারা মাত্র। যাকে, অনেক সমালোচকই প্রগতিবাদী মডার্নিজম বলে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রান্তে এসে মডার্নিজম ধাক্কা খেলো। এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ঠাণ্ডা লড়াই, দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ডামাডোল মানুষকে ক্রমশ ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। ফ্যাসিজমের উত্থান, নাৎসিবাহিনীর নারকীয় হত্যালীলা, মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে গেল গভীর খাদে। ফলে মর্ডানিজম থেকে নতুন শব্দ, নতুন ভাবনা, নতুন তথ্য নিয়ে জন্ম নিল পোস্টমর্ডানিজম। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্যায়ে সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন যে ধারা সংযোজিত হলো, তারই একেবারে গোড়ার দিকের ফসল অ্যাবসার্ডিজম। এই পোস্টমডার্নিজমের মূল বৈশিষ্ট্য হলো — চিত্রশিল্প, সংগীত, সাহিত্য, নাটক সব ক্ষেত্রেই পুরনো ভাবনাকে বাতিল করে নতুন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হলো। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর শাসন করছে যে পুঁজিবাদ তারই সংকটের একটি প্রকাশ পোষ্টমডার্নিটি। তাই সাহিত্যে নাটকে ভাষা ও অক্ষর নিয়ে অবান্তর অর্থহীন খেলা করা হয়, বীভৎস হাসি বা জটিল চিৎকার অ্যাবসার্ড থিয়েটারের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

শেক্সপিয়ারের থিয়েটার রেনেসাঁস পর্বের রাজনৈতিক ও নৈতিক জটিলতাকে চিত্রায়িত করেছে। পুঁজিবাদের ভূতকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করেছে ন্যাচারালিজম। আর অ্যাবসার্ডিজম শুরু হয় ৫০ এর দশকে এবং তা

বিস্তার লাভ করে৭০এর দশক পর্যন্ত। এই সময়ের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, নেশাগ্রস্থ যুবক সম্প্রদায়, যৌন চেতনার বিবর্তন, ছাত্র আন্দোলন, হিরোশিমার ভয়াবহতা, উগ্রনারীত্ববাদ, হেপি জাতীয় কিছু উগ্র স্বাধীনতাবাদী চেতনার উদ্ভাবন, অস্তিত্ববাদী দর্শন ইত্যাদি বিষয় অ্যাবসার্ডিজমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তাই অবসাদডিজম দেখায় উদ্ভট কিছু যা বিশ্বাসের অগম্য। অথচ তারি মাঝে থেকে যায় আত্মিক বিষণ্ণতা।

পরবর্তী অস্তিত্ববাদীদের সঙ্গে অ্যাবসার্ডিস্টদের ভাবনাগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—

১) মানুষের অস্তিত্ব এই একমাত্র বিশ্বাস দুটি দর্শনেই মুখ্য।

২) জীবনের শূন্যতায় একমাত্র সত্য।

৩) শূন্যতার অপর নাম মৃত্যু।

৪. এক অদ্ভুত উদ্বেগ তাত্ত্বিকদের চেতনায় সদা কার্যকর হয়ে রয়েছে।

অস্তিত্ববাদ আত্মচেতনার জাগরণ ঘটায়। মানব অস্তিত্ব অ্যাবসার্ড, তবু মানুষের গৌরব সে স্বাধীন। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় আমাদের স্বাধীন করে। সিদ্ধান্ত ভুল হলেও তা অস্তিত্ত্বকে স্বতন্ত্র দেয়। আমাদের চারপাশে সবই অর্থহীন জগত। আমরাই তাকে বোধের দ্বারা অর্থপূর্ণ করে তুলি। তাই মানুষের এত হতাশা, উৎকণ্ঠা, দায়িত্ব ও বেশি। অস্তিত্ববাদীদের এই মূল ধারণাগুলি অ্যাবসাডির্টির মধ্যেও রয়েছে। সার্ত্র সহ অন্যান্য অস্তিত্ববাদীরা তাদের এই ধর্ষণের কথা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধে বলেছেন ঠিকই। কিন্তু প্রচলিত আঙ্গিকে। অ্যাবসার্ডিস্টরা ফর্মের পরিবর্তন ঘটালেন। আর এখানেই তারা হয়ে উঠলেন স্বতন্ত্র। কথনশৈলীর পরিবর্তনই অ্যাবসার্ডির্টির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

মার্কসিজমের সঙ্গে অ্যাবসার্ডিসম এর তুলনা করেন অনেক সমালোচক। মার্ক তার শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে জানিয়েছেন যে ব্যক্তি তার উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কৃষক ফসল করালেও সেই ফসলে তার অধিকার নেই। অ্যাবসার্ডিটিতেও আমরা দেখি মানুষ সবকিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন। একাকী হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিন্নতার বৈশিষ্ট্যে দুটি তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে বলা যেতে পারে। কিন্তু মূল ভাবনার বৈরিতাই বেশি পাওয়া যায়। মার্কস্ মূলত শ্রেণির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তোমার কাছে ব্যক্তির উর্ধে সর্বহারা শ্রেণি সংগ্রাম ও সামাজিক সাম্য স্থান পেয়েছে। কিন্তু অ্যাবসার্ডিজম ব্যক্তির কথা বলে। ব্যক্তি মানুষের একাকীত্ব, জীবন সম্পর্কে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বাস করে যে গোষ্ঠী মানুষ তার থেকেও বেশি গুরুত্ব পাই ব্যক্তি মানুষ। তাই মূল তত্ত্বগত দিক থেকে দুটি দর্শন অনেকটাই দূরতর।

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ লেখকদের মনোজগৎকেও আলোকিত আলোড়িত করেছে। এই মতবাদ গুলির মধ্যে পারস্পরিক কিছু সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য লক্ষণীয়। অ্যাবসার্ডিটিও হঠাৎ করে সৃষ্টি হওয়া কোন মতবাদ নয়। বিভিন্ন ইজম এর ধারাই সৃষ্টি হওয়া একটি ইজম। পাশাপাশি সমসাময়িক অন্যান্য মতবাদগুলির সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী ওস্বাভাবিক।

মার্টিন এসলিন তার বইয়ের The Tradition of the Absurd অধ্যায় জানাচ্ছেন যে এব সার জাতীয় নাটকের পূর্বসূত্র রয়েছে প্রাচীন রোমের প্লটাস-টরেন্স এর নাটকে, ইউরোপীয় লোকনাট্য মীমাস এ। ভাঁড়ামি, জোকার সুলভ আচরণ, বোকামো বা পাগলামি তো আমরা চার্লি চ্যাপলিনের কমেডিতেও দেখেছি। তবে এই উদ্ভতত্ব একটু অন্য মাত্রা পেয়ে যায়, কারণ এখানে প্রতিটি উদ্ভটত্বের পেছনে রয়েছে শূন্যতার, না পাওয়ার

যন্ত্রণার কথা। প্রাশ্চাত্যের fable-parable জাতীয় গল্প, Alice in wonderland এর কাহিনিতেও তো আমরা উদ্ভট অনেক কিছুই দেখতে পাই। অর্থাৎ কাহিনিতে বা নাটকে একটা চমক সৃষ্টি করে পাঠক - দর্শককে আকর্ষণ করার চেষ্টাও একটা বিশেষত্ব হিসেবেই চিহ্নিত হতে পারে। আমরা অ্যাবসার্ড নাটকে সার্কাসের জোকারের মতো চরিত্র, পাগলামি, অসংলগ্ন সংলাপ, যৌনফ্যান্টাসি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে তীক্ষ্ণ রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখতে পাই। সুতরাং বলা যায় প্রাশ্চাত্য অ্যাবসার্ডিটি হঠাৎ সৃষ্ট কোন ফর্ম নয়। বরং প্রাচীনকাল থেকে এর ব্যবহার নাট্যক্ষেত্রে হয়ে আসছে। অ্যাবসার্ডির্টির উদ্ভটতত্ব এই ধারারই একটি বিশেষ রূপ।

প্রাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম স্যামুয়েল ব্রেখট ওয়েটিং ফর গডো (১৯৫২) নামে অ্যাবসার্ড নাটক রচনা করেন। পরবর্তীতে আর্থার অ্যাডামভ, আয়োনেস্কো, জ্যা জেনে, হ্যারল্ড পিন্টার প্রমূখ ও ব্যক্তিগণ অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মানুষের বিশ্বাসের জগত ভাঙতে শুরু করে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলজাত ক্ষয়ক্ষতি, অর্থনৈতিক অবমূল্যায়ন, হতাশা, দারিদ্র বেকারত্ব মানুষকে অসহায় করে তোলে। সে তার চারিদিকের পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অর্থশূন্যতায় ভোগে। মোহের বিশ্বাসের জগত তার ভেঙ্গে গেছে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার, কিংবা যন্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকতা মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি। জীবন যাপনের সব মূল্যবোধ হারিয়ে অসহায় এই মানুষ অন্তহীন বিচ্ছিন্নতায় ভুগতে থাকে। এই চিন্তাভাবনা পাশ্চাত্যের নাটকে উপন্যাসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তার সূচনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তার বিস্তার।

দু দুটো মহাযুদ্ধের পর দেখা দেয় ধনতন্ত্রের সংকট। সেই তীব্র সঙ্কটের যুগে মানুষের বাঁচবার পথ যখন প্রায় অবরুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে তখন মানুষের মনে জগৎ সম্পর্কে স্বাভাবিক একটি নেতিবাচক ধারণা বাসা বাঁধে। নিজস্ব পরিচয় নিয়ে দিশেহারা মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যেতে থাকে। মানুষের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর সে এক কঠিন সময়ে জন্ম নেয় অ্যাবসার্ড দর্শনের। জীবনের সব কিছুকে অর্থহীন এবং অবিন্যস্ত ভেবে এক অর্থহীনতার দর্শন এরা তৈরি করতে থাকেন। সনাতন মূল্যবোধের বিপর্যয় ও নতুন মোহের জাগরণ এ কালের মানুষের মনকে দিশেহারা করে দিয়েছে। পুরনো বিশ্বাস ও মোহভঙ্গের ফলে অস্তিত্বের বাস্তব ভূমি থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। আশাহত মানুষের জীবনে আউট সাইডার হয়ে থাকবার যন্ত্রণা প্রতি নিয়ত অনুভূত হয়। অস্তিত্বের অর্থশূন্যতায় দিশেহারা মানুষ নানা অসঙ্গতি তথা Absurdity এর ভাবনার জগতে নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন কবিতার কিছু পংক্তি এখানে স্মরণযোগ্য—

জানি তবু জানি, নারীর হৃদয় প্রেম
শিশু গৃহ নয় সবখানি
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাকে ক্লান্ত করে
ক্লান্ত, ক্লান্ত করে।

এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকেও Absurdity লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রজিৎ যখন মানুষকে বলে

'আসলে মরে যাওয়াটাই পরম সুখের। কত লোক মরে সুখে আছে। আমাকেও তো একদিন না একদিন ওই রকম মরতে হবে। এখনই মরি না কেন?

বাদল সরকারের লেখা আরেকটি নাটক বাকি ইতিহাসেও উদ্ভটত্ব লক্ষ্য করা যায়

সীতানাথ।। কেন বাঁচতে চাও?

শরদিন্দু।। কেন বাঁচতে চাই। বাঁচতে কে না চায়?

অ্যাবসার্ড নাটকের গঠন রীতি ও শিল্প রীতি সবসময়ই প্রচলিত নাট্যরীতি থেকে পৃথক। প্লট, গঠন, উপস্থাপন রীতি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি সবকিছুতেই উদ্ভটত্ব প্রকাশ পায়। একই চরিত্র লিঙ্গবিশেষে একাধিক চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে যায়। সেখানে নাট্যদ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। আদি মধ্য অন্ত সমন্বিত কাহিনি নেই। প্রচলিত নাটকের মত স্থান-কাল পাত্র সংঘাত ঐক্যের সম্ভাবনা নেই।। সাধারণ নাটকে ঘটনার গতির কারণ ও পরিণাম থাকে। কিন্তু এই ধরনের নাটকে গতির সুস্পষ্ট কারণ নেই, অর্থময় পরিনাম নেই। সুসমঞ্জস্য পরিণতিহীন এই নাটকের জীবন ভাবনায় এক নৈরাশ্যবাদী দর্শনের জন্ম নেয়।

বাদল সরকারের বাকি ইতিহাস, এবং ইন্দ্রজিত নাট্যরীতির কিছু লক্ষণ আছে বলে অনেক গবেষক প্রমাণ করলেও অধ্যাপক পবিত্র সরকার তার অ্যাবসার্ড নাটক প্রবন্ধে এই নাটকগুলিকে অ্যাবসার্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। পশ্চিমবঙ্গে নাট্যধারায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠনালীতে সূর্যই প্রথম অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য আরো যেসব নাটকগুলি এই ধারায় স্থান পাবে সেগুলি যথাক্রমে — মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীল রঙের ঘোড়া', 'মৃত্যুসংবাদ', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'রাজরক্ত' প্রভৃতি। ইন্দ্র উপাধ্যায়ের 'টেরোডাকটিল', নভেন্দু সেনের 'নয়ন কবিরের পালা', দীপক মজুমদারের 'বেদানার কুকুর' ও 'অমল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গেও সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী মানুষ রয়েছে। শ্রেণিসাম্য, সমন্বয় ইত্যাদি সে সময় এখানেও চর্চার বিষয় ছিল। তাই অ্যাবসার্ড নাটকের মূল কাঠামো এক রেখেও প্রাচ্যের অ্যাবসার্ডিস্টরা স্থান, কাল, পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বিষয়ের। অধুনা বাংলাদেশ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ, ঝড় জলোচ্ছ্বাস কতগুলি বাস্তব ঘটনা। আর সাঈদ আহমেদ কালবেলা ও মাইল পোষ্ট নাটকের প্রেক্ষাপটে যথাক্রমে স্থান দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ভিক্ষকে। এভাবেই অ্যাবসার্ড নাটকের চেনা কাঠামোতে লেগেছে নতুন মাটি। রূপ হয়েছে ভিন্ন। নাটকের প্লট হয়েছে গল্পময়, সদর্থক চিন্তা বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এই পরিবর্তনকে নিয়ম থেকে বিচ্যুতিকরণ না বলে আমরা অ্যাবসার্ড নাটকের বিবর্তন বলতে বেশি আগ্রহী। প্রাচ্যের শিল্পীরাও উদ্ভটত্বকে আত্মস্থ করে তাকে নতুন করে সজ্জিত করেছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক

আমাদের বাংলা নাট্যসাহিত্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক লিখতে শুরু করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যজগতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং অ্যাবসার্ড নাটক প্রায় সমার্থক। বিগত পাঁচ বছর ধরে আধুনিক নাট্য আন্দোলনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন নাটক

লেখা শুরু করেন তখন কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠীতে তার বেজায় নামডাক। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি।

এমন এক তুঙ্গ মুহূর্তে রাজ্যপাট ছেড়ে নাটুয়াদের দলে ভিড়ে গেলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যজীবন শুরু করেন উদ্ভট, কিমিতি, অ্যাবসার্ড নাটক দিয়ে। সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে প্রতিবাদী রাজনৈতিক নাটক 'রাজরক্ত' লিখে নাটক রচনার মধ্যে অন্য বাঁক নিয়েছিলেন তিনি। অসংখ্য পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক, অনুনাটক, স্বল্পদৈঘর্যের নাটক, কিছু উপন্যাস যেমন 'জ্যোৎস্নায় নিদ্রিতফুল' (১৯৬৪), চৈত্রে উড়ন্ত ফুল' (১৯৬৫), 'বিমলেন্দুর জীবন' (১৯৬৭), ও 'বৃত্ত' লিখলেও তিনি কিন্তু কখনওই তাঁর কবিসত্তাকে বিসর্জন দেননি। তাঁর কবিধর্ম নাটকগুলিতে সুপ্রযুক্ত হয়েছে। এক সহজিয়া সুরে তিনি মানবমনের অন্দরমহলে ঝড় তুলেছিলনে। নাটক লেখার পাশাপাশি নাট্য আন্দোলন সংগঠনের পথে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নেমেছেন, তাঁর নাটক প্রয়োজনা করে অনেক নাট্যদল ও পরিচালক খ্যাতির শিখরে বিরাজমান হয়েছেন। মানুষের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে চিন্তাভাবনা নিয়ে দর্শক শ্রোতাদের আলোড়িত করার মতো নাটক নিয়ে এসেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, যেন একজন কবির মনের খেয়াল, সেখানে নাটকের চরিত্ররা মানুষ প্রকৃতি ও ভিন্ন ভাবনার এক অলৌকিক সংমিশ্রন। মানুষের বসবাসের চেনা ঘরে অন্য আলো, অন্য ভাবনার আর্বিভাব যেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক, মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজের সম্পর্কে বলেছেন- 'যেহেতু আমি মানুষ হিসেবে কেবল আমারই মতো, একেবারে আলাদা তাই ভেবেছি আমি যা লিখব তাও হবে ঠিক আমারই মতো আলাদা প্রচলিত ধারা থেকে তা হবে স্বতন্ত্র'।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে, যে কথাটা সবার আগে নজরে আসে তা হল মোহিত চট্টোপাধ্যায় অদ্ভুত নাটকের প্রাণপুরুষ। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যে (ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইউরোপ, আমেরিকার) এক শ্রেণির নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল যে নাটকগুলোর লক্ষ্য, দর্শন, বিষয় নির্মাণ উপস্থাপনা, ভাষা,শৈলী প্রচলিত নাট্যধারা থেকে আলাদা ছিল এই নাটকগুলোকে 'ঙ্কন্দ্ভত্ম ঙ্গন্থদ্বথ' বা অদ্ভুত নাটক নাম দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'The Threatre of the Absurd' এস্লিনের এই বইটিতে ইউরোপ ও আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কিছু নাটকের বিশদ আলোচনা করে সেই নাটকগুলোকে 'Absurd' নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন। এলিনের ভাবনাকে এ. পি. হিংক্লিফ্ 'The Absurd' বইটিতে দেখিয়েছেন—

'This particular application of a current philosophical term to drama was the invention of Martin Esslin in his book The Theatre of the Absurd (1961) and, since this book more than anything else has made the term familiar to the English reading public, it seems reasonable to begin a discussion of Absurdity in this context'?

অদ্ভুতধর্মী শৈল্পিক সৃষ্টিগুলির উৎস বলতে আলবেয়ার কাম্যুর লেখা 'The myth of Sisyphus' নামক বইটি। অ্যাবসার্ড নাটক প্রচলিত ধারার নাটক থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এই সমস্ত অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকে নেই কোন সুষম সূচনা, সমাপ্তিসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনি, নেই সুস্পষ্ট চরিত্রচিত্রণ, নেই বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, বরং আছে অর্থহীন বকবকানি। নাট্যনির্মাণগত কৌশলে পার্থক্য থাকলেও জীবনদর্শনে এই নাট্যকারদের অবস্থান একই জায়গায়। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, যিনি বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক রচনার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন, তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'অ্যাবসার্ড নাটক'- এ লিখেছেন—

'জীবনের সবকিছুকে অর্থহীন এবং অবিন্যস্ত ভেবে এক অর্থহীনতার দর্শনে এরা নিবদ্ধ। জীবনের প্রতিটি স্তরের এম্পটিনেস এবং নন-কমিউনেকশনে ভুগতে ভুগতে এই নাটকের মধ্যে এসে আমরা যে 'আউট-সাইডার' সে সত্য টের পাই'।

বর্তমান জটিল পৃথিবীতে জীবন ভরে উঠেছে অনিশ্চয়তায় যার ফলশ্রুতিতে নৈরাশ্য ঘিরে ধরে মানুষকে। এই অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যের বাতাবরণে যুক্তি ভরা ভাষা ও ভাব প্রকাশ সত্যিই অক্ষম হয়ে যায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকে এই ধারাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। পশ্চিমী 'থিয়েটার অফ দি অ্যাবসার্ড' বাংলা নাটকের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। বাংলার সমাজ জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল সেই অদ্ভুতধর্মিতা। বাংলা রঙ্গমঞ্চে অদ্ভুত নাটকের আবির্ভাব ছয়ের দশকের প্রারম্ভে। গোটা দশক জুড়ে সৃষ্ট এই নাটকগুলোতে সঙ্গতির সামঞ্জস্যবিহীনতা প্রকাশ পায় তার জন্য দায়ী সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। ১৯৪৭ ভারত স্বাধীনতা লাভ করল, বঙ্গভূমি নতুন কোন স্বপ্ন দেখার আগেই বিভক্ত হয়ে গেল। স্বাধীনতা লাভের দেড় দশকের মধ্যেই পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজ- সর্বত্রই পালটে যেতে লাগল। ১৯৬২ সালে শুরু হল চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাজন। ১৯৬৫ তে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ। এরই মধ্যে ১৯৬৮ তে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে রাষ্ট্রপতি শাসন তখনও কিন্তু থামেনি দাঙ্গা। পাঁচ ও ছয়ের দশকে দেখা দিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, আর্থিক অব্যবস্থা, উদ্বাস্তু স্রোত, সুদূরপ্রসারী আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার অভাব বাঙালির জীবনে সুস্থিতির সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে গড়ে ওঠা পণ্যময় সমাজে মেহনতি মানুষের দুঃখবৃদ্ধি করে একই সঙ্গে সামাজিক দোলাচল ও পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার প্রেক্ষাপটে নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি মধ্যবিত্তের আকর্ষণও বেড়েছে। এই পটভূমিতেই আর্বিভূত হয় গ্রুপ থিয়েটার গোষ্ঠীগুলো তাদের শিল্পসম্মত, প্রগতিশীল নাট্যচর্চরা ধারা বেয়ে ছয়ের দশকের প্রথম দিকে বঙ্গে স্থান করে নিল বাংলা অদ্ভুত নাটক।

আমরা যদি রূপকথা, পুরাণ, মহাকাব্য দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে সর্বত্রই উদ্ভটত্বের অনেক উপাদানই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'আমাদের রূপকথা, পুরাণ, মহাকাব্যের গল্পে উদ্ভটের বিপুল সমাবেশ অথচ তার মধ্যে থেকে গভীরতর অর্থ আবিষ্কার সম্ভব। দশভূজা দুর্গা, ত্রিনয়ন ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, চতুর্মুখ ব্রহ্মা এঁদের প্রত্যেকটি রূপকল্পনা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে তন্ময় এবং বিশ্বাস্য। অর্থাৎ আমার মনে হয়, আমাদের দেশের উদ্ভটকে বিশ্বাস্য করে তোলার চিত্তভূমি বহুকাল ধরে প্রস্তুত।'

মোহিত চট্টোপাধ্যায় মানুষটি ছিলেন স্বতন্ত্র ধরনের, একদা কবিতার নিজস্ব জগৎ থেকে নাটকের নানারঙে প্রবেশের সময়ই লিখেছিলেন 'কণ্ঠনালীতে সূর্য'। আগন্তুক নামক লোকটি এই নাটকে অবসেসিভ কমপালসিভ নিউরোসিস আক্রান্ত এবং তার ফোবিয়াও আছে। এই লোকটি জানতে চায় নাটকে 'কুকুরের দর্শন', 'লোভের দর্শন', 'উপেক্ষার দর্শন' আমাদের বাসভূমির অসামঞ্জস্য যেন ধরা দিয়েছে নাটকের নানান ক্রিয়ার মধ্যে আর সেসব মূহূর্তেই মানুষটা ফিরে যেতে চায় তার বাল্যসময়ে। প্রথম অধ্যায়ে এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এর পরের নাটক 'মৃত্যুসংবাদ' এ কাঠামোগত রেখাচিত্রের মধ্যে দেখতে পাই 'মননের পক্রিয়ার বিপন্নতা'। অর্থহীনতার পারিপার্শিকের মধ্যে থেকে অর্থ খুঁজে ফেরা, দার্শনিক হত্যা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বারবার তার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা এই বিরাট পৃথিবীতে মানুষের হারিয়ে যাওয়ার অনুভব এবং নিজেকে

আউটসাইডার মনে করা, শূন্যতার উপলব্ধি, বিষণ্ণতা থেকে নৈরাজ্যময়তা, এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নাটকে কি ভাবে নাট্যকার সুপ্রযুক্ত করেছেন আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি মাত্র।

'গন্ধরাজ্যের হাততালি' (১৯৬৬) নাটকে নাট্যকার অজ্ঞাত পরিচয় বা আগন্তুককে একটা নির্দিষ্ট নামের মোড়কে জড়িয়েছেন। এই নাটকে একটি নয় দুটি আগন্তুক চরিত্র নাট্যকার এনেছেন, যারা অচিরেই জ্ঞাত হয়েছেন নাম ধারন করে। এই নাটকে মীরা, অরুণ, হরিকিঙ্কর ও প্রণবের সম্পর্কের আলাদা আলাদা ভিত তৈরি করে নাট্যকার এদের প্রত্যেকের জীবনের একটা টানাপোড়েন দেখাতে চেয়েছেন এই নাটকে। এই নাটকের চরিত্রগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে তাদের ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। 'সিংহাসনে ক্ষয়রোগ' (১৯৬৭) নাটকটিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, এক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে একটা লড়াই-এর কথা বলেছেন। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা, রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে নিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকটিতে মানবসভ্যতার যে ক্রমবিকাশ দেখতে চেয়েছেন, তাই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

'রাজরক্ত' নাটকে রাজাসাহেব ও তার অনুচর ক্ষমতার ধারকেরা কূটকৌশলে বানচাল করে দেয় সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধি ও স্বাভাবিক জীবনচর্চা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৯৭০-৭১ পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক একটা দিক সমাজের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সেইসব বর্ণনা নাট্যকার কেমনভাবে মানুষের জাগ্রত চেতনা ও বিচারবোধের কাছে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আমি তাই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকটি 'শারদীয়া গন্ধর্ব' (সংখ্যা ২) নাট্য পত্রিকায় ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়, ১৯৬৬ সালের ২১শে মার্চ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। কাব্যিক বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সৃষ্টি। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি রচনা নতুন এক দিক উন্মোচিত করে দিয়ে গেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখেছেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ছ'য় এর দশক থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' চার অঙ্কের এই নাটকটিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিসত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই নাটকটিতে পাই মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের তীব্র সংকটের কষ্টটা, যে মানুষগুলো প্রতিবাদ করতে জানে আর মনে যার ভীষণ উচ্চাশা। নাট্যকার নাটক মাত্রই সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে সতর্ক থাকেন। নাটক সর্বত্র হয় মানবমুখীন। নাটক মাত্রই মানুষের সংকটজাত সংঘাতটাকে তুলে ধরে, তার কারণ হল নাট্যদ্বন্দ্ব। ব্যক্তি মানুষের নিত্য সংঘাত সেই প্রভাবশালী সমাজের বিরুদ্ধে, কখনও সমাজে পারিবারিক বৃত্তের দায়িত্বের বোঝা এবং অন্যের প্রত্যাশা পূ রণের জন্য মানুষকে সবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়, সমাজ জীবনে এই সংকটের উপলব্ধিতে ক্রিয়াশীল য়া কখনও কখনও মানুষকে করে তোলে প্রতিবাদী। বেঁচে থাকার সংকট আর তার সমাধানের পথ খোঁজার প্রয়াস নিয়েই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের যাত্রা শুরু। একটা ব্যক্তির জীবনের Crisis এর কথা তুলে ধরা হয়েছে

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে। নাটকের শুরুতেই এক সংবেদনশীল ব্যক্তি যিনি একজন আগন্তুক মিলুর কাছে, সে মিলুর বাড়িতে তার জ্যাঠামশায়ের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। সেই আগন্তুক ব্যক্তিটির মধ্যে রয়েছে, অনেক বড় ভাবনা আর আবেগকে প্রকাশ করবার তাগিদ কিন্তু তার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে রয়ে গেছে দুস্তর ব্যবধান। তবুও নাট্যকার এই নাটকের নায়ক আগন্তুককে তার অন্তর সত্তার সকল বেহিসাবিপনাকে খুলে দিয়ে একটা সম্পূর্ণ মানুষের বাসনা নিয়ে নাটকে উপস্থিতত হয়েছে। কবি থেকে নাট্যকার হয়ে ওঠার পাশাপাশি নতুন নাট্য ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য-এর সাথে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারি Realistic শব্দটি নাট্যকার আসলে কিভাবে নাটকে এনেছিলেন—

'প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিন্তু দুটি সত্তার উপস্থিতি কাজ করে, আমি যখন নাটক লিখতে চেয়েছিলাম আমি তখন দুটোকে মিলিয়ে একটা মানুষকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলাম.... আমি মনে করেছিলাম একটা মানুষকে ধরবার, চিনবার এটাই আসল রাস্তা। শুধু ভেতরটা দেখলে হয় না, শুধু বাইরেরটা দেখলেও হয় না— ভেতরের মানুষ আর বাইরের মানুষ মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়— যে মানুষটা আসল মানুষ, সেই অর্থে Realistic'

নাট্যকার তাঁর নাটকে Non-realistic কে অধিকতর সত্য হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। নাট্যকার এটাই বোঝাতে চাইলেন, বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষ দু-রকমের এবং এই দুই মানুষকে মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ মানুষ। এই মানুষটি Real, সত্যিকারের মানুষ। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে সেই সমস্ত সত্যিকারের মানুষগুলোকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় চেনা বাস্তবের বাইরে যে অচেনা বাস্তবকে বিশ্বাস করতেন তারই প্রমাণ এই নাটক। আগন্তুক ব্যক্তিটি এই নাটকে সূর্যকে গিলে ফেলেছে যখন সে কাশে—

'লোকটি।। খুব কাশলে সূর্যটা ভেঙে সাবানফেনার মতো গোল গোল অসংখ্য

পিংপং বল হয়ে চারিদিকে গড়িয়ে পড়ে।'*

গলায় সূর্য আটকে যাওয়ার অসুখটি যেন সেই আগন্তুকের মতিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ দেয়। চিকিৎসকের সাথে আগন্তুকের সাক্ষাৎ হওয়ার পর ডাক্তার যখন তাকে জানায় এই গলায় সূর্য আটকে যাওযার চিকিৎসা সে আগেও করেছে লোকটি রেগে গিয়ে ডাক্তারকে বলে-

'লোকটি।। (ক্ষেপে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে) অসম্ভব, অসম্ভব। এটা পৃথিবীর প্রথম মৌলিক রোগ। আমার আগে কারুর হতে পারে না। তাছাড়া এ রোগটার সমস্ত কপিরাইটাও আমার।'*

আগন্তুকের ধারণা তার কণ্ঠে আটকে আছে একটি সূর্য। সূর্যের দহন জ্বালা তাকে পুরোপুরি দগ্ধ করেছে। বিস্ফোরণ যদিও হচ্ছে না, কিন্তু সূর্যকে ধারণ করতে হচ্ছে তাকে। সূর্যের সেই জ্বালা প্রশমনের উদ্দেশ্যেই তার ডাক্তারের কাছে আসা, সে মনে করে তার এই রোগটা একান্তই ওর, আরও জানায় সে তার চোখের সামনে রয়েছে শুধুই অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল সোনালী রূপালি মাছ। কিন্তু সেই মাছ ধরার জন্য জাল হাতে বেরিয়েও সে ধরতে পারেনি। নিশ্চিদ্র অন্ধকারের মধ্যে স্বপ্নের মতো আলোর সন্ধান দিয়েছিল যে মাছগুলো লোকটি পারেনি তাদের স্পর্শ করতে। সমাজের অন্ধকার, দিকটিই কি ঘিরে রয়েছে মানুষটিকে? এরই মাঝখানে কি সে খুঁজতে চেয়েছিল যে তার স্বপ্নকে? কিন্তু স্বপ্ন যে থেকে যায় অধরা। জানায় যে টেনিস বলে যে একদিন এসেছিল মিলুর বাড়িতে সে যেন ভেসে চলেছে জলের ওপর, তার পায়ের তলার শক্ত মাটি সে খুঁজে পায়নি। তার কাছে যেন সব কিছুই বৃত্তাকার, সবই জটিল। ডাক্তার আগন্তুকের কাছে জানতে চায় যে, শেষ কবে হেসেছিলাম? তার উত্তরে আগন্তুক লোকটি বেশ অদ্ভুত কথা বলে—

'লোকটি।। সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা কেমন গুলিয়ে গেছে। গতকাল কিংবা গতবছর একদিন খুব হেসেছিলাম।'

সময় সম্পর্কে এতটাই সে অসচেতন যে, সে কবে হেসেছে গতকাল আর গতবছর এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান করতে পারেনা। ডাক্তারকে আগন্তুক জানায় একটি বাক্সে পুরনো চিঠি পেয়ে তার প্রচন্ড হাসি পেয়েছিল। ডাক্তার তাকে আবার প্রশ্ন করে-

'ডাক্তার।। আচ্ছা লাস্ট কবে কেঁদেছিলেন।'

উত্তরে আগন্তুক লোকটি বলে চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়ে। লোকটির কাছে পৃথিবীর সব অনুভূতিগুলো একই। আর বাস্তবের সাথে রয়েছে এই লোকটির অনেকটাই ব্যবধান। ডাক্তার লোকটিকে একবার হেসে দেখাতে বলল কিন্তু লোকটা হাসার বদলে কেঁদে ফেলল, লোকটিকে শেখানো হল, কিভাবে হাসতে হয় তাও সে পুনরায় কাঁদলো, ডাক্তার তাকে ইলেকট্রিক চার্জ দিল আর সমীরের হাতটাকে দেখে আগন্তুক লোকটি বলল-

'লোকটি।।..... কুকুর-ধরা সেই লোকটির মতো আপনার হাত, চোখ।'

সমীরকে আগন্তুক আরও জানায় সে কোথাও পালাবে না তার হাতটা যেন সে ছেড়ে দেয়।

'লোকটি।।.... ওরা আমাকে খুঁজছে সাঁড়াশি হাতে করে এগুচ্ছে।'

আগন্তুক ভাবছে কুকুর ধরা দলের লোক তাকে খুঁজছে। মিলু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় তিনি কুকুর দেখছেন? সে বলে-

'লোকটি।.... লোকগুলো একটা বিরাট সাঁড়াশি নিয়ে আসবে; তারপর গলার এইখানটায়, যেখানে সূর্য আটকে আছে, সেখানে ভীষণ জোরে চাপ দিয়ে ধরবে। এতো জোরে, আমি কাউকে ডাকতে পর্যন্ত পারব না, আপনাকেও না'?

এই লোকটির বিস্মৃত হয়েছে সব পরিচয়। তার অনুভূতিই নষ্ট হয়ে গেছে। তার সমস্ত পরিচিত মানুষেরাও হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। এখন সে নিঃস্ব, একেবারে একা। তাই মিলুর প্রেমিক সমীর যখন কুকুরের মত কথাটি ব্যবহার করে বলে লোকটিকে বন্দুক দিয়ে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন সে কথা শুনেই আগন্তুক লোকটি লুকিয়ে পরে ওয়াড্রোবের পেছনে। নিজেকে 'কুকুর' বলে মনে হওয়ার পেছনে আগন্তুক লোকটি যে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন তাই স্পষ্ট। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—

'এ নাটকে আমি ব্যক্তি, তার অনুভব, তার অস্তিত্বের সংকটের কথা বলতে চেয়েছি।'

কুকুর কথাটির মধ্যে একটা রূপক তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। একজন সাধারণ মানুষ জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে যেভাবে উপেক্ষিত হয়, সেই প্রতিবাদের সঠিক পন্থা সে কিন্তু পায় না তাই সে নিজেকে একসময় কুকুর ভাবে লজ্জায়, অপমানে, অভাবে। পৃথিবীতে তান্ডব চলছে লোকটির চোখের সামনে কিন্তু তবুও লোকটি কিন্তু আশাহীন না, সে সমস্ত কথা একদিন প্রকাশ করবেই সূর্যটা কণ্ঠনালীতে আটকে তাই সে নিরুপায়।

নাটকটিতে সমীর নিজেকে কবি হিসেবে পরিচয় দিলেও আসল কবিত্ব ধরা পড়েছে আগন্তুক লোকটিরই সংলাপে। সমীরের ভাষায় কাব্যিক অনুভূতি আসলে হিউমার রসের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে আগুন্তুক লোকটির সংলাপ পেয়েছি-

'লোকটি।। ধরুন, যদি বলি রোদ্দুর থেকে সাদা চুরি গেছে, জল থেকে ঠান্ডা, আগুন থেকে তাপ, চরিত্র থেকে উল্লাস।'

আগন্তুক লোকটির সংলাপে রয়েছে অযৌক্তিক বিস্ময় আর অবাস্তবতার আত্মপ্রকাশ—

'লোকটি।। না, পেট ভর্তি ক্ষিধে নয়, হৃদয় ভর্তি ক্ষিধে। নানারকম ক্ষিধে। যেমন লাল খাওয়ার ক্ষিধে, সবুজ কিংবা রূপালি খাওয়ার ক্ষিদে ..... জলের উপরের বাতাস, অনেক দূরের ব্রজপাতের শব্দ, কাগজের মসৃণ স্পর্শ, জলে ভেজা কামিনী ফুলের গন্ধ, আপনার ঘাড়ের উপর গড়িয়ে-পড়া চুল — এরকম অনেক কিছু খেতে চাই।'

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকের নাম, আগন্তুক ব্যক্তির মুখের সংলাপ বুঝিয়ে দেয় সাধারণ অঙ্ক ও দৃশ্য সম্বলিত নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায় লেখেননি বরং আগন্তুক লোকটির কাছে জগৎ জীবন নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। ডাক্তার

আগন্তুক লোকটির থেকে একসময় জানতে চেয়েছিলেন গলায় সূর্যটা আটকে যাওয়ার সময় তার আত্মীয়রা কোথায় ছিল? এ প্রশ্নের জবাব সেই আগন্তুক দিয়েছিল অষ্টম পাণিপথের যুদ্ধে তারা মারা গেছে— যুদ্ধটি ছিল গোলাপের সঙ্গে। এই যুদ্ধে কেউ যেত না আর যুদ্ধই নিয়তি। ডাক্তারের মত মানুষ যেমন প্রাপ্তি হয় তেমনি শাসকের হাত থেকে বাঁচতে কুকুরের মত কুঁকড়ে থাকতে হয়, তবে আগন্তুক এই অসহায় অবস্থার মধ্যে শুধু আশ্রয় ও আশ্বাস পায় মিলুর কাছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানকার যান্ত্রিক সম্পর্কের জটিল আবর্তে প্রতিটি মানুষই বিছিন্ন। কোনো কোনো মানুষ সম্পর্কের এই বেড়াজালকে মেনে নিতে না পেরে কখনও কখনও হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে মানুষের সম্পর্কের অবনতি তাকে বেদনার্ত করে তোলে সেই ক্ষোভ যন্ত্রণা তাকে বয়ে বেড়াতে হয়।

আসলে এই লোকটির মধ্যে আমরা দেখেছি মধ্যবিত্ত মানুষের নিজের সম্পর্কের ধারণাই প্রতিফলিত। মধ্যবিত্ত মানুষ অনেক সময়ে নিজেকে মনে করে অসাধারণ। যেমন এ আগন্তুক মনে করেছে সে সূর্যকে কণ্ঠে ধারণ করেছে, তাকেই প্রকাশ করতে চাইছে। অথচ বেরিয়ে আসছে পিংপং বল যা মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষুদ্রতার প্রতীক। যে মানুষ নিজেকে অসাধারণ মনে করে, সে তো কিছুতেই মেনে নিতে পারে না তার অতি সাধারণ আশেপাশের অবস্থাকে।

এরপর নাটকের শেষ দিকে দেখা যায় বনমালী কুকুরের অফিসে ফোন করে আগন্তুক লোকটিকে ধরিয়ে দিতে চায়। ডাক্তার এও জানায় বাড়িতে ফোন থাকা সত্ত্বেও সে কেন বাইরে গেছে ফোন করতে সেটা সে বুঝতে পারছেনা। সবাই মিলে গান ধরলে কুকুর ধরার লোকগুলো আগন্তুককে ধরতে পারবে না বলেই ডাক্তার মনে করেন। মিলু, ডাক্তার ও আগন্তুক গান করতে গেলে আগন্তুক কুকুর ডাকার আওয়াজ করে ফেলে। লোকটি সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে, লোকটির মধ্যে স্বাভাবিকতার লক্ষণ চোখে পড়ে না, আগন্তুক লোকটি নানান অস্বাভাবিক কথা বলতে বলতে হঠাৎই মিলুকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। লোকটির মনের ধারণা যে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকলে কুকুর ধরার দলের লোকরা তাকে নিয়ে যাবে না। মিলু আগন্তুকের কথা শুনে তাকে পাগল বলে, আর বলে-

'মিলু।। ভালো তো আকাশটাকেও লাগে, অমনি বিয়ে করতে হবে'।

মিলু লোকটির চিৎকার শুনে এসে জানতে পারে লোকটি পুণরায় ভ্রমের কথাই বলছে। মিলু লোকটিকে বলে এই অসুখ যদি সারার হয় এমনি সারবে। মিলু লোকটিকে অন্য জায়গায় চিকিৎসার জন্য পাঠাতে চাইলেও আগন্তুক লোকটি আর কোথাও যেতে চাইনি। অবশেষে এই লোকটির অসহায়তাই তাকে করে তোলে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ। আবার এই অসুস্থতা থেকে মুক্তির প্রয়াসও আছে তার নিজের মধ্যেই। স্নিগ্ধ নীল আলোতে আগন্তুক লোকটি দেখতে পায় জাহাজের মতো একটা টেনিস বল তাকে নিয়ে যাবে সে শান্তভাবে মিলুদের বাড়ি থেকে চলে যায়।

সাধারণ মানুষ জীবনের সুস্থ, স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে পেতে চায়, কিন্তু ক্ষমতাবানেরা পেতে দেয় না, নাটকের মূল উপজীব্য একথাই। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নৈরাশ্যবাদী নন। শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সাধারণ মানুষ নিজের বাঁচার জায়গা খুঁজে নেবে এই ভাবনাই নাটকের শেষে রেখে যেতে চেয়েছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকটিতে অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ কিন্তু ঘটেনি ঘটনার চূড়ান্ত ঘাত-প্রতিঘাত চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয়নি বরং বলা যায় এটা অনেকটা 'No action play' এর মতো এখানে কোন ঘটনাই ঘটেনা। মানুষের অস্বাভাবিক আচরণই নাটকের প্রধান নির্ভর। আগন্তুকের সংলাপে যে দ্বন্দ্ব নাট্যকার দেখিয়েছেন তা বাইরের ঘটনার দ্বন্দ্ব নয়, তা অন্তরের দ্বন্দ্ব। চূড়ান্ত মুহূর্ত আসে নাটকের শেষে যখন সে তার তীব্র মানসিক যন্ত্রণার উপশমের

উপায় না পেয়ে চলে যাচ্ছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় চারপাশের ক্ষয়, হতাশা, নৈরাশ্যকে নাটকে চিহ্নিত করলেন, সবসময়ের সঙ্গে এক কাব্যিক দূরত্ব বজায় রেখে।

ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ 'দুর্খাইম' অ্যানেমি শব্দটির প্রয়োগ করে সমাজস্থ মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রত্যাশা পূরণের ব্যর্থতাজনিত সামাজিক বিছিন্নতাকে চিহ্নিত করেছিলেন। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে অসঙ্গতি যা তার Ego কে অবদমিত করে রাখে বা সামাজিক আচার-আচরণ নিয়মের কঠিন বাঁধকে ব্যক্তি মানুষের নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতার মধ্যেই, এই বিচ্ছিন্নতার বীজ লুকিয়ে থাকে তা বোঝাতে চাইলেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তার নাটকে বাহ্যিক অসংলগ্নতার অন্তরালে অধিবাস্তব কল্পনাজগৎকে থাকে তা আমাদের দেখতে চাইলেন।

নাটকটির বিষয়-ভাবনা ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঊষর জমিতে — যেখানে প্রেম নেই, আলো নেই, আবেগ মোক্ষণের অধিকার নেই যেখানে মানুষ জটিল থেকে জটিলতর সামাজিক জীবন যাপন করে চলেছে। মানুষের আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ককে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, উদ্দেশ্যহীন পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছেন নাট্যকার-

'Sense of unrelatedness to the world and of purposelessness
Of experience leaves a man in a world which is animals and
Absurd

এ নাটকে ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। চিত্রকল্প তৈরি করতেই সে ভাষা হয়ে যায় বিমূর্ত আর তার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার আভাস স্পষ্ট। নীল আলো আর কালো পোষাকে ঢাকা ছায়ামূর্তিগুলো নাটকের শেষে লোকটিকে ঘিরে ধরে।'তখন সেই নীল আলো কালো রঙ শুধু যন্ত্রণার প্রতীক হয়ে ওঠে নাকি, সে তখন প্রস্তুত দরজার আওয়াজ শুনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, জাহাজের মতো ভেসে যাবার জন্য- সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেও দৃষ্টিকোণে এই অদ্ভুত নাটকটি লেখা হয়েছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিভাষাতেই একে কিমিতিধর্মী নাটক বলা যেতে পারে। পশ্চিমী অ্যাবসার্ড নাট্যের অনেক উপাদানই আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে পাই। যেমন, মানুষের জীবন ক্রমশঃ উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে যাওয়ার অনুভব, জীবনের বিমূঢ়, বিভ্রান্ত অবস্থা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা নাস্তিকতা (সূর্য গিলে ফেলা লোকটির মধ্যে দেবতাদের বিরুদ্ধে উদ্যত রাহুর ছায়াপাত), স্বাভাবিক বর্ণনার পরিসরে অসম্ভবের উন্মোচন। এছাড়াও মাঝে মাঝে কাব্যধর্মী সংলাপ, পরিহাস, কৌতুক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোর সার্থক প্রয়োগে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য অদ্ভুত নাটকের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

পত্র ডিএসই -৪০৫

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৪

ফোর্থওয়াল

সর্বপ্রথম নাট্য সমালোচক ল্যাসাজ 'ফোর্থওয়াল' প্রসঙ্গটি তাঁর নাটক 'তুর্কারে'র ভূমিকায় তুলে ধরেছেন। তাতে তিনি বলেন, মঞ্চের তিনদিক ঘেরা, সামনেটা খোলা। প্রসেনিয়াম মঞ্চের সেই খোলা জায়গা দিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। তিনি দুইপক্ষের এই সরাসরি যোগাযোগটি পছন্দ করেন নি। তাই (বাস্তববাদীরাও তাই চাইছিল) অভিনেতা ও দর্শকের মাঝখানে এক অলঙ্ঘ্য চতুর্থ প্রাচীর কল্পনা করার আবেদন রাখেন। তিনি মনে করেন অভিনেতারা অভিনয়ের সময়ে কল্পনা করে নেবেন দর্শক ও তাদের মাঝে রয়েছে একটি অদৃশ্য দেওয়াল। চার দেওয়ালের মধ্যে গৃহে তারা যেভাবে ও রকমের আচরণ করেন, মঞ্চেও সেরকমই করা প্রয়োজন। দর্শককে ভুলে যেতে হবে। সামনে দর্শক রয়েছে, এই কথাটি মাথায় রাখা চলবে না। কখনও সরাসরি দর্শকের উদ্দেশ্যে কোন কথা বললে বা কোনো অভিব্যক্তি পরিবেশন করলে তৎক্ষণাৎ নাটকের বাস্তবতা লঙ্ঘিত হবে। এই ভাবনাতেই গ্রীক নাটকের কোরাস শেক্সপিয়ারের নাটকের চরিত্রদের স্বগতোক্তি- সবই বাস্তবতা লঙ্ঘন করছে বলে বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা হলো।

আসল কথা, এই সময়কার বুর্জোয়া থিয়েটার ভুলেই যেতে চেয়েছিল যে, থিয়েটার 'কমপোজিট আর্ট' বা মিশ্রশিল্প; তার সঙ্গে জনগণের যোগ ওতপ্রোত, সমবেত মানবগোষ্ঠীর অনুশীলনের ফলই হচ্ছে নাটক এবং থিয়েটার। এটা ভুলেছিল বলেই, তারা নাটকে সূত্রধারকে উৎপাত বলে মনে করেছেন, কোরাসকে বাদ দিয়েছেন এবং স্বগতোক্তি তুলে দিয়েছেন। চরিত্রের অনুভূতি এবং দৃশ্যের গোপনীয়তা তারা কিছুতেই প্রকাশ্যে আনতে চাইলেন না। থার্ড থিয়েটারের মুক্তমঞ্চের ধারণায় ছিল সর্বমুক্তি। 'ফোর্থওয়ালে' প্রসেনিয়াম মঞ্চের সামনের খোলা দিকটাতেও গেঁথে দেওয়া হলো অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। চতুর্থ প্রাচীর। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর মুক্ত মঞ্চের সূত্রপাত ঘটে 'সিল্যুয়েট' নাট্যগোষ্ঠীর 'মুক্তি আশ্রম' নাটকটি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। শতাব্দী, বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কসপ, তমলুক ব্রাইট থিয়েটার, নিরীক্ষণ শিল্পী ফৌজ, সি-পি-এ-টি, শতম, লিভিং থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যদল থার্ড থিয়েটারে মুক্তমঞ্চের নাটক অভিনয় করেছে। বাটানগরের থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রতিশনিবার কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ায়ে অভিনয় করতে থাকে। ১৯৭৩-এর অক্টোবর থেকে শহীদ মিনার, বি-বা-দী বাগ, হাজরাপার্ক, শিয়ালদা স্টেশনে অভিনয় করতে থাকে বিদূষক নামে নাট্যদল। টালাপার্কেও অভিনয় শুরু হয়। বাদল সরকার তাঁর শতাব্দী নাট্যদল নিয়ে প্রথমে (১৯৭১) অঙ্গনমঞ্চ, পরে ক্রমে ১৯৮৬ থেকে মুক্তমঞ্চে চলে এলেন, করলেন মিছিল, প্রস্তাব, সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস, বাসী খবর, লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী, হট্টমালার ওপারে, গণ্ডী, ক্যাপ্টেন হুররা প্রভৃতি।

সত্তরের দশকের তৎকালীন কংগ্রেসী সরকারের (রাজ্য ও কেন্দ্র) দমন-পীড়নে আক্রান্ত হয় এই সমস্ত দল যারা কমিউনিজমে আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। ১৯৭৪-এর ২০ জুলাই অভিনয় চলাকালীন পুলিশের আক্রমণে কার্জনপার্কে প্রবীর দত্ত নামে এক নাট্যকর্মীর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই ঘটনার পরেও থিয়েটার লাইবর, নটসেনা, প্রতিবিধ, সং-শপ্তক প্রভৃতি দল ধর্মতলায় সুরেন্দ্রনাথ পার্কে অভিনয় করতে থাকে। ১৯৭৫-এর ২৪ এপ্রিল থেকে থিয়েটার লাইবর অভিনয় শুরু করে হিন্দ সিনেমার উল্টোদিকে সপ্তাহের প্রতিদিবস। ১৯৭২-এরই ২৪ মে থেকে প্রতি শনিবার অভিনয় করতে থাকে শতাব্দী নাট্যদল কলকাতার একাডেমির উল্টোদিকের মাঠে।

সত্তরের দশকের এক বিপর্যয়কর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে আন্দোলিত জন সমাজের সামনে মুক্তমঞ্চ তার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

বিশ শতকের শেষ লগ্নে সমাজতন্ত্রের সাময়িক পতনের পর সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সময়ে অদৃষ্টপূর্ব রাজনৈতিক সার্কাসের সামনে দাঁড়িয়ে 'নির্লজ্জ', 'অকল্পনীয়', 'বিস্ময়কর', 'যাঃ এটা হতেই পারে না।, 'উঃ আর কী বাকি রইল।, ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলিকে যখন প্রতিদিনের নতুন নতুন থাপ্পড় ক্লিশে করে দিচ্ছে, তখন আরও একবার উৎপল দত্তকে খুব মনে পড়ছে। বেঁচে থাকলে চূড়ান্ত স্যাটারারে, ব্ল্যাক কমেডিতে, পেটে খিল ধরানো ফার্সে বা রঙ্গনাট্যে কিংবা ইতিহাস থেকে তুলে আনা কোনো সিরিয়াস ইনট্রসপেকটিভ নাটকে উৎপলদা নিশ্চয়ই এই বিষন্ন এবং হাস্যকর, রক্তাক্ত গা-জোয়ারি এবং কমিকালি দাম্ভিক, গা-চাটা রাজনীতির ডিগবাজি বিশারদ বেশ কিছু থিয়েটারকর্মীর উল্লাস সর্বস্ব আর পা-চাটা নাট্য বৃদ্ধদের ভিমরতি-সর্বস্ব সময়টাকে তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে শায়কবিদ্ধ করতেন। তাঁর মতো টাইটানের অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক নাটক লেখার দায় যাঁদের ওপর বর্তেছে তাঁদের ক্ষমতাও তো সাধারণ ফিতে দিয়েই মাপা যায়। অতএব সম্ভাবনাময় নতুনদের দিকে তাকিয়ে আছি, ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ হিসাবে শুধু 'স্পর্ধাকর্ণ' জাতীয় দু-একটির কথা ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন করা যায়। আর এই নিবন্ধের শেষে ওই সম্ভাবনাময় নতুনদের জন্য (রঙ্গমঞ্চে তাদের আগমনী কিন্তু শৌনা যাচ্ছে) কিছু সুপারহিট হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ব্ল্যাক কমেডির ভাবনা-কল্প দেওয়া হল। ওই উপসংহারটুকুর আগে আসুন, ওই 'নাট্যস্বজন' জাতীয় সরকারি গৌরী সেনের টাকা আর সরকারি 'শো' বিলানো রঙের পাটোয়ার আর সন্তের খেলোয়াড় নিয়ন্ত্রিত ভাঙনভূমি ছেড়ে, সরকারি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত (হয়তো চিট ফান্ডের টাকাতে 'পবিত্র) বেসরকারি এক-ডজন বা হাফ-ডজন নখাদ পুরস্কারপ্রাপ্ত থিয়েটার-বৃদ্ধদের মমতায় অন্ধ চোখ, হিসেবী বাক্য বিতরণে আর অতীতের পুঁজি দেখিয়ে ভোগাভ্যাসে অতৃপ্ত জিভ আর অনিয়ন্ত্রিত নাল-ঝরা বয়সটাকে পাশ কাটিয়ে আমার একটু পিছিয়ে এই দেড়-দুই দশকের সমাজচিত্র আর তারই প্রেক্ষিতে নাট্যচিত্রটিকে অনুধাবনের একটু চেষ্টা করি। আশা করব, সময়ের ধারাবাহিকতা নাটক রচনায় আর নাটক প্রযোজনায় যে প্রক্রিয়াকে অনিবার্য করে তোলে তা অনুভবের জন্য এই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধটি পাঠকের কাছে জরুরি মনে হবে।

আমাদের গর্বের আধুনিক থিয়েটার

(নিকট অতীতের প্রেক্ষাপট)

কিছুদিন ধরেই জিভ দিয়ে ঠোঁট-চাটা সাধারণ দর্শক বলে চলেছেন, 'থিয়েটারের এখন শেষ অবস্থা। হায়, হায়, কি দুভাগ্য। এই সেতু বন্ধনের ব্যর্থতার মানে বুঝি। কিন্তু বেশ কিছু থিয়েটারবোদ্ধা যখন অতীতের গৌরব গাঁথার লম্বা ফর্ম শুনিয়ে হা-হুতাশ করেন 'থিয়েটারের সেই সোনালি দিন শেষ থিয়েটার এখন শব- বাহকদের

কাঁধে। তখন সেই পুরাতনী নির্বোধ প্যাঁচালের চটজলদি ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। থিয়েটার জন্মের পর থেকে কখনও কি সুখে ছিল? থিয়েটারের সন্তানরা দুধেভাতে থাকতে পেরেছে কদিন? রাজবাড়ি কিংবা জমিদারের উঠোনের শিকলি কেটে থিয়েটার যেদিন পাঁচিল-ভাঙা মুক্ত আলোয় লম্বা-বেঁটে-সক্ত- মোটা-শ্রমী-অলস-সরল কিংবা ভাঙা মানুষদের সামনে এসে দাঁড়াল, সেইদিন থেকে তাঁর অদৃষ্টে সঙ্কটের স্বাগত চন্দনরেখা আঁকা হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের থিয়েটার যে চল্লিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত খুব একটা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে থাকেনি সেটাই তার সবীর্যে বাঁচার প্রাণশক্তি। যতবার যতভাবে থিয়েটারের সামনে সঙ্কট এসেছে ততবারই বিপন্নতার মধ্যে লড়তে লড়তে নতুনভাবে আয়শক্তি অর্জন করেছে থিয়েটার। তার মানে এই নয় যে, থিয়েটারের স্বার্থেই সঙ্কট স্বাগত। যেমন মজা করে এক সময় বলা হত, বিপ্লবের সম্ভাবনা জোরদার করার প্রয়োজনে আরও বেশি শোষণ নির্যাতন দরকার। আসলে বলার কথা একটাই থিয়েটার চিরকাল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। তবে পূর্ব গোলার্ধের এই প্রান্তে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সর্বগ্রাসী 'বাজার' আমাদের থিয়েটারের সামনে এমন ভয়ঙ্কর সব সঙ্কট আনছে যার অভিঘাত আগে ভাবাও যায়নি। অনুভব করার প্রশ্নও ছিল না। সমষ্টিগত শিল্প হিসাবে থিয়েটারকে দূর্বল করে দেওয়া, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার ইঁদুর-দৌড়ে নাট্যশিল্পীদের আদর্শপ্রষ্ট বহুগামিতায় প্ররোচিত করা, চিন্তাভাবনায় গভীরতাকে এড়িয়ে চলা, 'কমিটমেন্ট' বা 'কমিটেড' কিংবা 'দিনবদলের স্বপ্নাদর্শী ইত্যাকার শব্দগুলোকে নিয়ে সুচতুর ব্যঙ্গ করা, নতুন নাট্য প্রযোজনার মার্কেটিং-এর আধুনিক প্রকৌশল, (যেমন মিডিয়ার 'বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে খানাপিনার ব্যবস্থা, 'ভালোবাসা দেওয়া- নেওয়ার রিমোট কন্টোলে কোনসমালোচক কোনু পত্রিকায় রিভিউ করবেন তার আগাম ব্যবস্থা করা) এসব আপাত সফল চলতি ব্যবস্থাই এখন নিষ্ঠ থিয়েটার-চর্চার প্রবল প্রতিকূলশক্তি। সিকি-আধুলি লোভী কিছু ট্র্যাফিক পুলিশের মতো এইসব 'অগ্রদানী সমালোচকদের মুক্তকান্ত প্রশংসায় প্রথম কিছুদিন সরল দর্শক হল ভরিয়ে ফেলেন। পরে চালাকিটা আস্তে আস্তে ধরা পড়ে। বাজারের কাবহিডে পাকানো দুর্মা-ফজলির জায়গা দখল করে নেয় নকল রং করা মুজঃফরি লিচু। এইসব চতুর নাট্যকর্মী তৈললোতী নাট্যসমালোচকদের পাশাপাশি আটঘন্টা সিরিয়ালে আর দুঘন্টা গ্রুপের গালে চুমু খাওয়া নাট্য নির্দেশকও কম দায়ী নয়। এই কুৎসিত দ্রুতিবিলাসী সময় আর সর্বগ্রাবী 'বাজার'-এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থিয়েটার এরিনাকে 'যেমন খুশি সাজো'র হাস্যকর মঞ্চ বানিয়ে চলেছেন এরা।

আর এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা, ছোট কিন্তু দারুশ সক্রিয় গ্রুপগুলোকে সাইনবোর্ডসহ বড় দলের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আধুনিকতম বোয়াল- মৎস্য-কালচার। নিজেদের গ্রুপে লোক টিকছে না, নানারকম ভড়ংয়ের আঙ্গিক আর বাহ্যিক অভিনয়েও নতুন নতুন ছেলেমেয়ে দলে ঠিকমতো ভিড়ছে না। অতএব মফস্বলের ছোট নিষ্ঠ শক্তিশালী গ্রুপকে ধরা গেল, যৌথ প্রযোজনার রঙিন বেলুন- উড়িয়ে নতুন প্রযোজনা নামাও। বাজার পেলে আগন্তুক দলসহ সব কিছুই প্লেটে সাজিয়ে ডিনার করে নাও, বাজার ঠিকমতো না পেলে আবার এক নতুন সুইসাইড স্কোয়াড-এর খোঁজ কর। আর একটা মফস্বলী নাট্যদলের সাহায্য নিয়ে আবার নতুন নাটক নামাও। মফস্বলী যে দলটি আসছে তারা কলকাতার নামী গ্রুপ, নামী তারকার দলে অভিনয় করছি এই আত্মপ্রসাদ চাটতে চাটতে নিজেদের দলের 'কমিটমেন্ট, শপথ নিঃস্বার্থ নাট্য- সংগ্রামের সব ভুলে এক বছর বা দু'বছরের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে দাদার বাড়ির স্বপ্নাদ্ধ কর্মচারী বা ভাড়াটে হবে। তারপর গত কয়েক দশকের রঙিন প্রয়াসে টি ভি মিডিয়ার অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে এ দেশে। নিঃসন্দেহোট ডি আমাদের দর্শকদের একটা বৃহৎ (কিংবা বৃহত্তর) অংশকে কেড়ে নিয়ে গেছে।

সংস্কৃতির এক প্রধান অবলম্বনই এখন টেলিভিশন। কিন্তু থিয়েটার তো মধু সময়ই প্রমোদের বাইরে আরও অনেক কিছু।

সত্তরের দশকের শুরুতেই যে ফোর্থওয়াল শুরু বিভিন্ন নাট্যদল উদ্যম নিয়ে যে প্রযোজনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তা আশির দশক থেকেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। নিম্নলিখিত কারণগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—

১. নাট্যভাব ও ভাবনার মধ্যে কোনো স্থিরবন্ধ রাজনৈতিক মতামত নেই। একই নাটকে বিশ্বের তাবৎ রাজনীতির তাবৎ দোষত্রুটি অনুসন্ধান- এক সময়ে ক্লান্তিকর মনে হয়।

২. 'অনেক সময়েই সমাজদ্বন্দের মূলে না গিয়ে উপরিতলের কিছু সমস্যার রূপকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হচ্ছে। দর্শকের মনে তা ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মাত্র।

৩। অভিনয়ের সময়ে অভিনয়গত কলাকৌশল এতো বেশি প্রয়োগ করা হয় যে, দর্শকের দৃষ্টি সেদিকেই চলে যায়। নাট্যভাবনার ও বিষয়ের সংযোগ হয় না। অভিনেতাদের 'এ্যাক্রোবেটিক' শারীরিক কায়দা, শরীর দিয়ে নানা বস্তুর উপস্থাপনা, মুখ দিয়ে নানা শব্দ ও সঙ্গীত অনুষঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা সহজেই দর্শককে সেদিকে আকৃষ্ট করে তোলে। কি বলছে, সেটার চেয়ে কেমন কায়দা করে বলছে -এটিই দর্শকের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। ফলে নাট্যপ্রয়োজনার মূল শর্ত, দর্শক ও অভিনেতার ভাব সাজুয্য ও সংযোগ-এখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

৪. তাছাড়া গ্রামগঞ্জের দিকে শহরের ছেলে মেয়েরা আঁটোসাটো জামা পরে (গেঞ্জির কাপড়ের 'ওভারঅল') যখন অভিনয়ে নামে, তখন সেখানকার দর্শকের মনে স্বভাবতই কৌতূহল ও বিস্ময় জাগায়। লোকও জড়ো হয়। কিন্তু মনে গেঁথে যায় 'তরুণ-তরুণীর চেহারা, তাদের দেহের কায়দাকানুন, একটা নতুন কিছুর মজা প্রথম দিকে ভিড় বাড়ায়। ক্রমে কৌতূহল চলে গেলে সবটাই মজা হয়ে দাঁড়ায় -থার্ড থিয়েটারের প্রাথমিক শর্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

বাদল সরকার তাঁর 'শতাব্দী' নিয়ে আবার ফিরে গেলেন অঙ্গনমঞ্চে। কিছুদিন বাদে 'শতাব্দী' তুলে দিতে হলো। আবার 'শতম' নাম দিয়ে নতুন নাট্যদল দিয়ে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় শুরু করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে (দেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯২) তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন যে, 'আমি জানত, আমাদের থিয়েটারকে থার্ড থিয়েটার রীতি বলিনি।' তাঁর কাছে বুর্জোয়া থিয়েটারের পাশে এটা একটা বিকল্প থিয়েটার বলেই মনে হয়েছে। এবং এখন লোকে তাঁর অঙ্গন মঞ্চের নাটককেই থার্ড থিয়েটার মনে করছে।

এবং সবটাই হয়েছে বা হচ্ছে নগরে, শহর কলকাতায়। গ্রামগঞ্জে হাটে- মাঠের কথা মাথাতে ছিল, কিন্তু কার্যত স্থানিকবদ্ধ হয়ে পড়ল কলকাতায়। ফলে অফিস ফেরতা, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, বেকার এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই এই নাটকের কদর হলো। সত্তরের দর্শকের উত্তেজনা ও উন্মাদনা কেটে গেলে অবসন্ন মধ্যবিত্তের মানসিক গণ্ডী থেকে থার্ড থিয়েটার হারিয়ে গেল। অঙ্গন মঞ্চে ফিরে গেল থার্ড থিয়েটার।থার্ড থিয়েটার ফর্ম ব্যর্থ হলেও, তারই পাশাপাশি আরেকটি নীতি, আরেকটি রীতি বলি কেন, ঐ থার্ড থিয়েটার ফর্মেরই রকমফের খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। নাটকের দল, তাদের নাটক ও দল নিয়ে পথে চলে এসেছে। পথের ধারে, চৌরাস্তার মোড়ে, যেখানে বেশি লোকের 'আনাগোনা—সেখানেই খানিকটা জায়গা করে নাটক অভিনয় শুরু করে দেওয়া যায়। জনতার সঙ্গে সংযোগের এতবড়ো হাতিয়ার আর কোথাও নেই।

তখনই প্রশ্ন ওঠে, থিয়েটারের মাধ্যমে এই জনসংযোগের কথা আসছে কেন? বর্তমান কালে প্রসেনিয়াম থিয়েটার মূলত নগরকেন্দ্রিক। এবং ব্যাপক অর্থে বাণিজ্যিক। পেশাদারি বাণিজ্যিক থিয়েটারে যা অভিনয় হচ্ছে,

তার বেশিরভাগই ভাবাবেগপূর্ণ। কুরুচি ও নিম্নগামী, এরং বর্তমান পচাগলা সমাজব্যবস্থার পুঁজিবাদী দর্শনকে ধরে রাখার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। তার সঙ্গে বহুবিধ আধুনিক প্রচার মাধ্যমের সুযোগে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দুনিয়া তার 'মহিমা' প্রচার করে চলেছে। যেখানে কেরোসিন তেল পৌঁছয় না কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই, সেখানেও যান্ত্রিক কুশলতায় বেতার ও দূরদর্শন-এর প্রচার পৌঁছে যাচ্ছে। একস্থানে বসেই দেশের নানা প্রান্তে শাসক তার ভাবনা পৌঁছে দিতে পারছে। এবং সেগুলিকেই সত্য ও অভ্রান্ত বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে দোসর হিসেবে বাণিজ্যিক সংবাদপত্রগুলি যারা প্রতিনিয়ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জয়গান গেয়ে, পুঁজিবাদের দোসর ও দোহার-এর কাজ করছে।

তাহলে সরকারী সমর্থনে এতো ব্যাপক প্রচারের পাশে সমাজ পরিবর্তনের কথা মানুষ জানবে কি করে? শহর-নগরের, শিক্ষিত মানুষ তাদের জ্ঞানে, বইপত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বুঝতে পারে। কেউ কেউ এগিয়ে এসে কিছু কিছু চেষ্টাও করে। বাকিরা নিরাসক্ত ও নিজের ভাবনাতেই বিভোর। শহরের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রগতিশীল সমাজ স্থাপনের ভাবধারার প্রকাশ নাটকে যতোই হোক, মধ্যবিত্ত শহরে দর্শকের মনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে না। বড়োজোর একটা সামাজিক উত্তেজনা ওঠে, বিবেকের তুষ্টিবিধান ঘটে। কিন্তু বিশেষ কোনো সক্রিয় ভূমিকা, সমাজ পরিবর্তনের কোনো কাজ, সে করতে পারে না। তাদের কাছে থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা পৌঁছে দেওয়া আত্মতুষ্টির নামান্তর, ধাপ্পাবাজির অপর পিঠ।

অন্যদিকে বৃহত্তর যে জনসমাজ গ্রামেগঞ্জে মফস্বলে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের কাছে যাচ্ছে লোকনাট্য যা যাত্রা। গ্রামীন লোকনাট্যে ধর্মীয় আবেগ ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে। শহরে যাত্রা তাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে যুক্তিবিরোধী অথবা যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন কথাবার্তা। গ্রামে প্রচারিত হচ্ছে পশ্চাদপদ মূল্যবোধ এবং শহরে প্রচারিত হচ্ছে প্রগতিশীল মূল্যবোধ। গ্রামগঞ্জে শ্রমিক-কৃষক যারা সমাজপরিবর্তনে এগিয়ে আসতে পারে তাদের শোনানো হচ্ছে। নাটকের মাধ্যমে যত পিছিয়ে যাওয়ার কথা। আর শহরে শোনানো হচ্ছে এগোনোর কথা, হারা কিছুতেই এগোবে না, যারা নির্বিকার, অক্ষম এবং বিমুখ।

তাইতো প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও লোকনাট্য-যাত্রার বাধা ভেঙে থিয়েটারকে গ্রামগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। রাজনীতির সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক-বিবাদ এই সময়ে কিছু কম হয়নি। কিন্তু সেটা ছিল স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর এক প্রক্রিয়া। এই বিতর্কের একদিকে ছিল শম্ভু মিত্র ও বহুরূপীর ঘোষণা। ভালো নাটক ভালো করে করাটাই লক্ষ্য। অন্যদিকে এল টি জি ও উৎপল দত্তের জেহাদ। যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সবই ভুল। এই দু'জন অগ্রজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নান্দীকার ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজছিলেন ভালো থিয়েটারের পেশাদারী ভিত্তি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই তিনজনই গণনাট্য সংঘের ঐতিহ্য থেকে সরাসরি উঠে এসেছিলেন। তাই মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পক্ষে যে জন-আন্দোলন, তার থেকে কখনওই দূরে থাকতে পারেনি এঁদের থিয়েটার।

ছয় ও সাতের দশকের অন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ নাট্য-নির্দেশক ছিলেন তাঁরাও সবাই নিজেদের মতো করে এই বিতর্কে সামিল হয়েছেন। অশোক মুখোপাধ্যায়, জোছন দস্তিদার বা শেখর চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক থিয়েটারের মতাদর্শে আস্থা রেখেই নাট্যসৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী সময়ে অরুণ মুখোপাধ্যায়ও মনে করেছেন, মার্কসবাদী দর্শন ও বোধ ছাড়া ভালো থিয়েটার হয় না। গত শতকের ন'য়ের দশক জুড়ে এর ব্যতিক্রম ঘটতে শুরু করে। গত

দশ-পনেরো বছরে পরিবর্তনের ধারা বড় হতে হতে সমান্তরাল প্রোত তৈরি হয়েছে। কেন এই বদল ঘটতে শুরু করল এবং কোন পথেই বা ঘটতে চলেছে এই বদল, সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করা দরকার। কায়েমি স্বার্থের একটা বলয় গড়ে উঠলো শাসন-ক্ষমতাকে ঘিরে। বাম রাজনীতি বিপথগামী না হলেও তার খ্যাতিতে এল প্রশস্থতা। ঢুকে পড়ল দ্বিধাদন্দ্বের ভাইরাস। এর প্রতিফলন দেখা গেল শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনেও। থিয়েটারে যে লড়াকু বামপন্থী রোম্যান্টিকতা নাট্যসৃজনে অক্সিজেন জুগিয়েছে বহুকাল, সেইটা কমজোরি হতে থাকল। নানা কমিটি, নানা ধরনের ইভেন্ট ও পুরস্কার, নানা পদ ও সম্মানের জন্য দৌড়াদৌড়ি, ধরাধরি শুরু হল। নাটকের উঁচু মাথাগুলি হেঁট হতে শুরু করল। শম্ভু মিত্র নাটক করা বন্ধ করেছিলেন সত্তরের দশকেই। আশির দশকের শুরুতে আচমকা অকালে প্রয়াত হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রান্ত এবং অসুস্থ উৎপল দত্ত ন'য়ের দশকের গোঁড়ায় প্রয়াত হলেন। ষাট-সত্তরের দশকের তরুণদেরও ততদিনে প্রবীণতায় ভিত্তি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। আবার শ্যামল ঘোষ বা বিভাস চক্রবর্তীর মত নির্দেশকদের কাজে দেখা যাচ্ছে থিয়েটারের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে, নতুনত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায় বা অশোক মুখোপাধ্যায়কে ও দেখা যাচ্ছে কম-বেশি একই পথের পথিক হিসেবে। এঁদের সকলেরই স্টাইলের রকমফের দেখা গেলেও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ছিল একই ধরনের। এই সময়ের দু'জন প্রধান নাটক রচয়িতা মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্রের প্রধান নাটকগুলিতেও সময়ের এইসব মূল ঝোঁকগুলির প্রতিফলন ঘটেছে। এঁদের পরবর্তী সময়ের শক্তিশালী নাট্যস্রষ্টারা আশির দশকেও রাজনীতি ও থিয়েটারের আর্নসম্পর্ক বিষয়ে ওয়াকিবহাল থেকেছেন। উষা গাঙ্গুলি, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ বণিক, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সকলেই এঁদের নাটকে নান্দনিকতার পাশাপাশি জীবনবোধ বা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রগতিমুখী অবস্থান থেকে সরেননি। নাট্যকার চন্দন সেন বা দেবাশিস মায়েদারকেও এই পথেরই পথিক হিসাবে দেখতে পাই। অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছরের একটি বড় সময়পর্ব জুড়ে বামপন্থায় বিশ্বাসী সামাজিক দায়বোধে প্রাণিত কিন্তু নাট্যশিল্পের চর্চায় নিবিড়ভাবে উৎসাহী এক নাট্যঐতিহ্য গড়ে উঠতে দেখি। দূরদর্শনের নানা চ্যানেল তাদের জনমোহিনী ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করল দর্শক সমাজকে। সব মিলিয়ে নাটকের ক্ষেত্রে একটা মন্দা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকলো।

সমাজের ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে তারা তাদের থাবা বসাল অচিরে। বর্তমান সময়ে হয় বশ্যতা ও প্রাপ্তি, নয় উপেক্ষা ও বঞ্চনা। একদিকে টাকার ও খেতাবের লোভ, অন্যদিকে ভয় দেখানো ও পীড়ন। এইভাবে বামপন্থায় বিশ্বাসী নাট্যসমাজে ভাঙন ধরানো ও নিজেদের শিবির ভারি করার খেলায় নামল এই নতুন ফোর্থওয়াল ধ্বজাধারী নাট্যসমালোচকরা আদর্শহীনতার চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে তো কোনো বড় লড়াই লড়া যায় না। তাই দুতিন বছরের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে রক্তাক্ত হচ্ছে নিজেরাই। নিজেদের শিল্প ও বিশ্বাসকে পণ্য করে নিজেদেরকেই খাটো করার প্রতিযোগিতায় যেন মেতে উঠেছে। অথচ এই তরুণ নাট্যসমাজে ভাবনার অভাব নেই। অনেক পরিকল্পনার বিধান ব্যতিক্রমী নাট্যভাবনারও ছাপ আছে। কিন্তু বনিয়াদে কোথাও কোনো বড় ঘাটতি নিশ্চয়ই আছে যার জন্য দীর্ঘস্থায়ী নয় তারা।

ফোর্থওয়াল তো তাই শুধু একটা ফর্মের আন্দোলন হয়ে থাকতে পারে না। শুধুমাত্র নাট্যাঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষার এর সব শেষ হয়ে গেলে চলবে না। থিয়েটারের সেই সনাতন প্রশ্ন-কি, কেন এবং কাদের জন্য-কি বলতে চাইছি, কেন বলতে চাইছি এবং কাদের বলতে চাইছি-এসব নিয়ে গড়ে উঠেছে বিকল্প থিয়েটারের ভাবনা। একটা বিশেষ

দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা নিয়েই গড়ে ওঠে ফর্ম ভেঙে নতুন থিয়েটার। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ তাই একটা আন্দোলন।

ডিরেক্ট কমিউনিকেশন গড়ে তুলতে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনক্ষেত্র গড়ে তুলতে থিয়েটারকে কাজে লাগানোর চেষ্টাতেই প্রসেনিয়ামের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে পড়া। সমাজ পরিবর্তনের তাগিদে থিয়েটার তার বক্তব্য নিয়ে, তার দর্শন চিন্তা নিয়ে চলল মানুষের কাছে। কেননা, সমাজপরিবর্তন সম্ভব নয় যদি মানুষের পরিবর্তন না ঘটে, যে মানুষ পরিবর্তন ঘটাবে তার চিন্তা চেতনার স্তরের যদি পরিবর্তন না ঘটে। মানুষের মধ্যেকার ছোট ছোট অজস্র সাধারণ ভাবনার পরিবর্তন না ঘটলে, সমাজেরও পরিবর্তন সম্ভব নয়। থিয়েটার তো বিপ্লব ঘটায় না। বিপ্লব ঘটায় যে মানুষ থিয়েটার সেই মানুষের চেতনার প্রস্তুতি ঘটিয়ে দিতে পারে। তাইতো থিয়েটার নিয়ে পথেঘাটে চলা, পথ চলতে চলতে থিয়েটার করা।

ফোর্থওয়াল তাই শুধুমাত্র একটা অভিনয়রীতি বা আঙ্গিক হয়ে থাকতেপারে না। তার বক্তব্য, তার দর্শন নিয়েই খাও থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই বক্তব্য বা দশনের নির্দিষ্ট সীমানা না থাকাতে, বক্তব্য বিষয়ের ভাবনা পরিষ্কার না থাকাতে 'থার্ড থিয়েটার' শুরু হলেও একটা আন্দোলন হয়ে উঠতে পারল না। হঠকারীর মতো এলো এবং হুজুগের মতো উচ্চকিত হয়ে অবশেষে অবসন্ন হয়ে পড়ল। মুক্তমঞ্চ আবার ফিরে গেল ঘরবন্দি ঘেরাটোপের অঙ্গনমঞ্চে। লাঠি ভাঙলো, কিন্তু সাপ মরল না।

অথচ ফোর্থওয়াল পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে নতুন পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ভাবনা। নাট্যকার ও নাট্যদলের ভাব ও ভাবনাকে জনগণের সামনে হাজির করানোর সামাজিক দায়িত্ব থেকেই ফোর্থওয়াল প্রাথমিক পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। জনচিত্তকে জাগিয়ে তোলার জন্য নাটক অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে চায় বলেই তো এই ধরনের থিয়েটারের পরিকল্পনা।

বিশ শতকের নয়ের দশকে সাময়িক পরিস্থিতির কারণে একদল নাট্য সমালোচক নতুন আঙ্গিকে নাট্য ভাবনা উপস্থাপনের যে পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সে বিষয়ে তারা যতই বলুক না কেন 'নাটকে কোন রাজনীতি নয়' আসলে এই সমস্ত নাট্যবিদদের ভাবনার পিছনে এক সুদূর প্রসারী সূক্ষ্ম রাজনীতি কাজ করেছে। সেই রাজনীতি হলো শাসক শ্রেণির পক্ষে। অপরদিকে আমরা বলতে পারি বুর্জোয়া শক্তির পরোক্ষ প্রচারক ছিলেন তাঁরা। নাটক অথবা থিয়েটারকে আপামর মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে 'ফোর্থ ওয়াল' - এর নাম করে আরো বেশি নাটককে সংকুচিত করার পরিকল্পনা তাঁদের ছিল। নতুন করে নাটকের প্রায়োগিক ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাম করে থিয়েটারকে সংকুচিত করা প্রসারিত করার বদলে এই তাদের চিন্তাভাবনা। শুধুমাত্র বিশ শতকের শেষ দশকেই নয় একুশ শতকের এই দুই দশকেও শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, আমাদের রাজ্য বলে নয়। সারা পৃথিবীতে নব্য শাসকের নয়া কৌশল নাটককে সংকুচিত করা এবং জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা আমাদের রাজ্যেও সাম্প্রতিককালে একাধিক নাট্যকারের নাট্যভাবনার মধ্যে এই 'ফোর্থ ওয়াল'-র ধারণা লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে উপরিউক্ত একাধিক আলোচনায় সেই বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন নাট্য দল বর্তমান সময়ে থিয়েটারের প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নাম করে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথে হেঁটে চলেছেন। আবার একথাও প্রযোজ্য সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ব্যতিরেকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক রকম প্রায়োগিক দিক নির্দেশ করে চলেছেন অনেক নাট্যকার ও নাট্য দলগুলি।

পত্র ডিএসই -৪০৫

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৫

ফোর্থ থিয়েটার

নাটক একটি মিশ্রকলা শিল্প। প্রাচীন যুগ থেকে নাটক নিয়ে নানা ধরনের বিষয় ভাবনা এবং আঙ্গিকগত উপস্থাপনার নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এসেছে। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই নাটক নিয়ে নাট্য সমালোচকেরা এবং অভিনেতারা নানা ধরনের গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন পথ ও পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে প্রসেনিয়াম থিয়েটার এগিয়ে চলেছে। আধুনিক যুগে নাটকের শুধু বিষয় ভাবনারই পরিবর্তন ঘটেনি, তার সঙ্গে আঙ্গিকগত নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নাট্য আঙ্গিকের এবং বিষয় উপস্থাপনের বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা নাট্য সমালোচকদের ভাবিত করেছে। বিশ শতকের শেষলগ্নে সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা অনেকাংশে কমে যায়। আস্থা হারানো নাট্য সমালোচকেরাই নতুন করে প্রসেমিয়াম থিয়েটারকে তিন দেওয়ালের পরিবর্তে চতুর্থ অলংঘন প্রাচীরের প্রসঙ্গকে উল্লেখ করেছেন। নাট্য সমালোচকেরা মনে করেন স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা যখন কথা বলেন তখন তো কেউ থাকেনা, এই উদ্ভট যুক্তি এক শ্রেণির নাট্য সমালোচকেরা তুলে ধরেন। যে সমস্ত নাট্য সমালোচকেরা দীর্ঘদিন যাবৎ বলে এসেছেন, থিয়েটারকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে, তারাই একপ্রকার থিয়েটার থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখার নতুন ভাবনা তুলে ধরেছেন। অপরদিকে আর এক শ্রেণির নাট্য সমালোচকেরা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে নাটককে আপামোর মানুষের কাছে, আপামর মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা উল্লেখ করার কথা বলেছেন। এই শ্রেণির নাট্য সমালোচকেরা মনে করেন শিল্প এবং শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকেই সমাজের আপামর নিপীড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রণার কাহিনি তাদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা আবশ্যিক। এই ভাবনা থেকেই ফোর্থ থিয়েটারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, যা কিনা পৃথিবীর প্রগতিশীল নাট্য সমালোচকেরা প্রচার করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফোর্থ থিয়েটারের এই ধারণাকে মাথায় রেখে নাট্যকার, নাট্যদল, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা এগিয়ে চলেছেন। প্রগতিশীল নাট্য সমালোচকেরা মনে করেন ফোর্থ থিয়েটারের মধ্য দিয়ে আপামর জনগণের মধ্যেই নাটককে পৌঁছে দিতে হবে। আপামর শোষিত মানুষের যে জীবন যন্ত্রণার কাহিনি তা, তাদের মুখ দিয়েই এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের সম্মুখে অভিনীত হোক। নাটক কখনও বিদ্রোহ করে না, নাটক কখনও বিপ্লব করে না। মানুষের সম্মুখে নাটক অভিনীত হলে দর্শক খুব সহজেই শোষক এবং শোষিতের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবে। শোষিত মানুষ বুঝতে পারবে তার জীবন যন্ত্রণার জন্য কে বা কারা দায়ী? এই ভাবেই নাটক এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে জনগণের একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হবে। জনগণের মধ্যে শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ এবং ঘৃণা সৃষ্টি হবে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শুধু আনন্দরসই নয় শোষিত জনগণ সংঘটিত হবে শোষকের বিরুদ্ধে।

আমাদের দেশে এই ধরনের নাটকের উদ্দ্যোগ লক্ষ করা যায়। বিশ শতকের শেষ দশকের দিকে কলকাতার CCCA বা 'কমিউনিকেশন ফর কালচারাল অ্যাকশন' গ্রামে গিয়ে এই ধরনের 'সচেতক' বা বিবেক-উদ্বোধক নাটক করছেন-এ নাটকের মূল লক্ষ্যই হল রসকিড-এর ভাষার 'consciensitization'। ১৯৮৪-র জুন মাসে ব্যাঙ্গালোরে একটি সেমিনারে গিয়ে এই ধরনের আরও অনেক নাট্যগোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে এই লেখকের পরিচয় হয়েছে। অন্ধ্রের সেকেন্দ্রাবাদের কালচারাল ফোরাম খ্রিস্টীয় জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস-এর অঙ্গ। এরা শুধু যে নাটক করে তা নয়, জননাটকের ওয়ার্কশপ সংগঠন করে এবং দূর দূর গ্রামে ব্যাটশিল্প পোটেমকিন, পথের পাঁচালী, মন্থন, অঙ্কুর, চোখ, ওকা উরি কথা, মা ভূমি ইত্যাদি। সকলের উদ্দেশ্য ও নাট্যপ্রকরণ যে একরকম তা নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে সকলেই বামপন্থী হলেও তাদের মধ্যে অল্প-স্বল্প রকমফের আছে। কারও লক্ষ্য নেহাৎ গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে বর্তমান-সচেতনতা ও অধিকারবোধ সঞ্চার, কেউ আবার সময় ও অবস্থা বিশ্লেষণ করে শ্রেণি-সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। ব্যাঙ্গালোরে ওখানকার প্রসিদ্ধ পথনাটিকার সংগঠক ও পরিচালক অনন্তমূর্তির এই ধরনের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় দশ হাজার পথনাটিকার অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে অবাক লাগল এই কারণ যে, রাজনীতি তাঁর পছন্দ নয়, তিনি শুধু মানুষের অভাব-অভিযোগ-সমস্যার ছবি তুলে ধরতে চান। কিন্তু কোনও সুস্পষ্ট রাজনীতি ব্যাতীত সকল পথনাটক বা কোন শিল্পই সৃষ্টি হয় না। ফলে ইদানীংকার নানা পথনাটিকার রাজনৈতিক বক্তব্য তিনি অনুমোদন করেন না। তাঁর বক্তৃতায় তিনি সমালোচনা করলেন দক্ষিণের বিখ্যাত নাট্য-পরিচালক প্রসন্নের একটি নাটকের-সে নাটকে ব্যাঙ্গালোরের কংগ্রেস (ই) নেতার ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ছিল। সে নাটক দর্শকদের একটি ছোটো অংশ খেপে গিয়ে বন্ধ করে দেয়, তাতে অনন্তমূর্তি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই বিষয়টা নিয়ে সেমিনারে তাঁকে চেপে ধরা হলে তিনি বলেন, দর্শকদের উৎপাত তিনি সমর্থন করেন না, প্রসন্নর নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়েও তাঁর কোনো মন্তব্য নেই-কিন্তু প্রসন্ন যে দর্শকের সঙ্গে মুখোমুখি কথাবার্তা না বলে চুপচাপ নাটক বন্ধ করে দলবল গুটিয়ে চলে গেলেন, এতেই তাঁর আপত্তি। অনন্তমূর্তি নিছক পথনাটক করেন, তিনি 'জননাট্য' বা এই ধরনের কোনো নামকরণের মধ্যে যেতে চান না। বাংলাদেশের 'আরণ্যক' গোষ্ঠী আবার মনে করেন, শ্রেণিসংগ্রামের কথা না বললে নাট্যকর্মী হিসেবে তাঁদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁদের নাট্যপদ্ধতির নাম তাঁরা দিয়েছেন 'মুক্তনাটক'। এই মুক্তনাটক নিয়ে গ্রামে পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি আমরা মান্নান হীরার রচনা ৮৯ থেকে তুলে দিই।

'(গ্রামে গিয়ে) প্রথম দিন থেকেই আমরা তিনচারটে দলে ভাগ হয়ে যাই-সঙ্গে থাকে গ্রামেরই বিভিন্ন বয়সী কিছু ব্যক্তি। অনেক সময় চেয়ারম্যান, মেম্বার বা গ্রামীণ মোড়লদের লেজুড়বৃত্তি করে এমন লোকও দলে ভিড়ে যায়। প্রথমত আমরা গ্রাম নিরীক্ষা করি। এর মধ্যে থাকে সেই গ্রামে কতজন ভূমিহীন, কতজন দিনমজুর, গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের মজুরি-প্রথা, বর্গাপ্রথার স্বরূপ, ইত্যাদি বিষয়-বিভিন্ন আলাপ আলোচনা মাধ্যমে এর জবাব পাওয়া যায়। আলোচ্য যে কোনো এলাকায় মুক্তনাটকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান সেই বিশেষ এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শোষণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেওয়া। এই ধারণা ব্যতীত মুক্তনাটকের কাজ সম্ভব নয়। আর সে কারণেই সে এলাকার শ্রেণিসম্পর্ক স্পষ্ট ভাবে বুঝতে না পারলে পরবর্তীকালে তা বাধার

সৃষ্টি করে। দিনের বেলায় গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। দলগুলি তাদের কর্মস্থলে যায়, তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়, বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রামে নাটক করবার কথা বলে।এক্ষেত্রে তাদের প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়-কিন্তু যখন বলা হয় এ নাটকে অভিনয় করবে এ গ্রামেরই নিরক্ষর লোক, কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি করে এ নাটকের কাহিনি হবে না তখন তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকখানি কমে যায়। তারা পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা থেকে বলে-এ কি করে সম্ভব, লেখাপড়া না জানলে কি করে নাটক হবে? তা ছাড়া নাটকে প্রথম দরকার বই, তারপর নায়ক-নায়িকা। এসব ধারণার সঙ্গে প্রথমে শুরু হয় মুক্তনাটকের বিরোধ। তাদের অত্যন্ত বিনয় ও সহজ পদ্ধতিতে মুক্তনাটকের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় গ্রামের অধিকাংশ লোককে একত্রিত করা। আর সে প্রয়োজনেই সাধারণত সন্ধ্যার পর কোনো এক বিশেষ স্থানে যেমন স্কুল ঘর, ক্লাব ঘর অথবা বাজার বা হাটে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সমবেত গ্রামবাসীর কাছে মুক্তনাটকের উদ্দেশ্য ও আদর্শ আলোচনা করবার জন্য প্রথম দিনের এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' বিখ্যাত নাট্যসমালোচক উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন- হীরা অভিজ্ঞতাসূত্রে লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রামের গরিব মানুষ তাঁদের সমস্যাকেই প্রথমত চিহ্নিত করতে পারেন না। তারপর তারা খুব সঙ্কোচের সঙ্গে একটা দুটো ঘটনার সূত্রবিস্তার করেন-এইভাবে নাটক তৈরি হতে থাকে। তাতে যথাবিধি শোষকশ্রেণীর বাধাও আসে এবং হীরার উক্তি 'কম বেশি হামলা সব জায়গায় এসেছে এবং তা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে।' মান্নান হীরা মুক্তনাটকের কর্মীর যেসব গুণাবলি থাকা দরকার মনে করেন সেগুলি এই

১. শ্রমজীবী শ্রেণির পক্ষপাতী শ্রেণিচেতনা।

২. মানসিক প্রস্তুতি।

৩. শ্রমজীবী শ্রেণির সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেই নিরিখে শত্রু চিহ্নিত করা।

৪. শ্রমিক শ্রেণির ভিতরের অন্তর্দন্দ্বের কারণগুলি খুঁজে দেখা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

৫. গ্রামীণ শোষণব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

৬. মুক্তনাটককে শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

৭. বাস্তবের সঙ্গে বিচিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে নাটকগুলি উপস্থাপনা করা।

৮. গ্রামীণ শোষকশ্রেণির অন্তর্দন্দুগুলি নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহার করা।

৯. নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পর (দর্শকের সঙ্গে) বিষয়গত আলোচনা এবং উপস্থাপনাগত ত্রুটি নির্ণয় করা।

১০. মাধ্যমটির নিয়মিত পরিচর্যা করা।

১৪ পাদপুরণ

পপুলার থিয়েটারের উপর ১৯৮৩-তে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে জননাট্যের সংজ্ঞা নতুন করে বিশ্লেষণ করা হয়। বলা হয়, জননাট্য হল জনসাধারণের নিজের নিয়ন্ত্রিত একটি বাহন। এ বাহন জনসাধারণেরই ভাবনা, সমস্যা ও বিশ্লেষণকে প্রতিফলিত করে। এ বাহন ব্যাপকভাবে প্রচারিত অন্যান্য

মিডিয়ামের প্রচারকে প্রতিরোধ করে। এ বাহন জনসাধারণের নিজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন এবং ঋনিন্দ্য সাধন করে, তাদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেয়। এতে পন্ডিতের চাপানো ধারণার বদলে জনসাধারণের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা, সমস্যা ও প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়। এ বাহন লোকশিক্ষা দিয়ে দেশ ও জনসাধারণের মধ্যে সংহতি আনে। বাস্তবকে মূর্ত করে বিশ্লেষণে সাহায্য করে, প্রতিদিনের বাস্তবের আভ্যন্তর অন্তর্দন্দুকে ধরিয়ে দেয়। রসকিড এরই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জননাটক বিনোদন হিসেবেও যেন মানুষের আগ্রহকে ধরে রাখে। এখানে পিপলস থিয়েটার প্রসঙ্গে রোম্যাঁ রোলাঁর কথারই যেন পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। জননাট্যে ব্যবহৃত হবে আঞ্চলিক ভাষা-তাতে গ্রামের মানুষের কাছে সে নাটক সহজে গৃহীত হবে। বিষয়বস্তুতে জোর পড়বে স্থানীয়তার উপর, বিশেষ জায়গার বিশেষ সমস্যার উপর।

বস্তুতপক্ষে জননাটক নাটক ও সমাজপরিবর্তনের কর্মসূচিকে একই প্রোগ্রামের অন্তর্গত করে দেখে। দর্শক ও অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব ভেঙে দেয়। এই মুহূর্তে 'শিল্প' হয়ে ওঠার জন্য তার কোনো দায় নেই। কিন্তু কে বলতে পারে, নাটক ও জীবন যদি এভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায়, এর মধ্য থেকেই বড়ো কোনো নাট্যকার বা নাট্যশিল্পী বেরিয়ে আসবে কি না। তার সম্ভাবনা বড়ো কম নয়।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

১. থার্ড থিয়েটার বলতে কী বোঝ? কোন সময়ে কোন নাট্যকারের হাত ধরে আমাদের দেশে থার্ড থিয়েটারের প্রচলন হয়েছিল।

২. বিদেশে কোন সময়ে থার্ড থিয়েটার প্রচলিত হয় সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যাখ্যা করো?

৩. থার্ড থিয়েটার বাংলায় কতটা সাফল্য লাভ করেছিল তা তথ্যসহ আলোচনা করো

৪. আমাদের দেশে থার্ড থিয়েটার প্রবক্তা হিসাবে বাদল সরকারের অবদান উল্লেখ কর।

৫. পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে থার্ড থিয়েটার কতটা সফল হয়েছিল সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৬. থার্ড থিয়েটারের ভাবনায় যে কোন একটি নাটকের আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৭. অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটক বলতে কী বোঝ সে সম্পর্কে তোমায় অভিমত ব্যক্ত করো।

৮. অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে প্রেক্ষাপট বর্ননা কর।

৯. পশ্চিমবঙ্গে অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের প্রবক্তা কোন কোন নাট্যকার সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

১০. যে কোন একটি অ্যাবসার্ড ধর্মী নাটকের উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ করো।

১১. বর্তমান সময়কালে অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের গুরুত্ব কতখানি তা আলোচনা করো।

১২. ফোর্থওয়াল বলতে কী বোঝ তা আলোচনা করো।

১৩. ফোর্থওয়াল নাট্যভাবনা কোন সময় থেকে প্রচলিত হয় সে সম্পর্কে তোমায় অভিমত ব্যক্ত করো?।

১৪. ফোর্থ থিয়েটার সর্বপ্রথম কোন দেশে প্রচলিত হয়? সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

১৫. আমাদের দেশে ফোর্থ থিয়েটার কোন সময়ে প্রচলিত হয়সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করো।

১৬. ফোর্থ থিয়েটার আধুনিক সময়ে কতটা প্রাসঙ্গিক এ প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে তোমার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করো

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, পবিত্র সরকার, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অখণ্ড দে'জ সংস্করণ মে ২০১৯,বৈশাখ ১৪২৬।

২) নাট্যকথা শিল্পকথা, অশোক মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বিশ্ব রায়, অনির্বাণ প্রকাশণ।

৩) নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর, সম্পাদক সুনীল দত্ত,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৯৭২।

৪) সাময়িক পত্রে বাংলা মঞ্চ ও নাটক, শিপ্রা দত্ত, প্রমা প্রকাশনী, ২০০৫।

৫) বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার,ড. অরূপরতন ঘোষ, অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, পুরুলিয়া,২০০৩।

৬) পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংগ্রহ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ইন্ডিয়ান বুক মার্ট, ১৯৯১।

৭) কাকে বলে নাট্যকলা ? শম্ভু মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৮) নাট্য ব্যক্তিত্ব, বাদল সরকার, (প্রথম প্রকাশ),পুস্তক বিপণী ।

তথ্যসূত্র :

১) বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা ড. দীপক চন্দ্র। প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৩০।

২) একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি ১, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা- ২৭০

৩) একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি ১, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-২৬৯-২৭০

৪) একাঙ্ক সঞ্চয়ন, ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি ১, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-২৭৫

৫) সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকান্ত রচনাবলী লাইব্রেরী কলকাতা, ১৩৫৪, পৃষ্ঠা ১৫

৬) গণশক্তি, ২৭শে আগষ্ট, শনিবার, ২০১৬ পৃষ্ঠা ০২

৭) গন্ধর্ব পত্রিকা, নভেম্বর ১৯৬৩ - জানুয়ারি ১৯৬৪, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৮

৮) The Theatre Experience, Edwin Wilson, Mc Graw Hill, Inc. 1991, page - 439.

৯) উৎপল দত্ত, 'সমাজ বিপ্লব গণনাটক', 'নাট্যমেলা স্মরণিকা; ২০০১। পৃষ্ঠা ২৭১

১০) অরূপ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, পৃষ্ঠা নং ৭৫।

১১) শান্তিময় গুহ, 'পথনাটক আজকের ভাবনা', গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) ১৯৮২, পৃষ্ঠা নং ৪০

১২) জোছন দস্তিদার, 'পথনাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রেক্ষাপট; 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা' (৯ সংখ্যা,২০০৪), পৃষ্ঠা নং ৪০

১৩) শান্তিময় গুহ, 'পথনাটক আজকের ভাবনা' গণনাট্য পত্রিকা, (মে-জুন, ২০০৫) পৃষ্ঠা নং ৭৬

১৪) মন্মথ রায়, 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা (৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা), নভেম্বর ৮৬ - জানুয়ারি- ৮৭। পৃষ্ঠা ৪৮

১৫) সফদর হাশমি , 'পথনাটক একটি পৃথক ঐতিহ্য', 'গ্রুপ থিয়েটার' (২৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পৃষ্ঠা ৫০৬ (মূল রচনা 'জনসভা'র ক্রোড়পত্র জানুয়ারি ১১, ১৯৮৯ এ প্রকাশিত, অনুবাদ করেছেন প্রতিমা হায়দার)।

১৬) হাব্বি তানবীর, 'মঞ্চ আর পথের বন্ধন গড়ে উঠুক', 'নাট্যচিন্তা' (বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪-৭), ফেব্রুয়ারি-মে, ১৯৯০, পৃষ্ঠা নং ৩

১৭) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রাজনীতি, রাজনৈতিক পথনাটকের চরিত্র' 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা' (৯ সংখ্যা, ২০০৪) পৃষ্ঠা নং ১৫

১৮) দর্শন চৌধুরী, 'থার্ড থিয়েটার ও পথনাটক', রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৯৩-৯৪, পৃষ্ঠা নং ২২৪।

১৯) পানু পাল, 'দায়বদ্ধতা নিয়ে আমি গণনাট্য সংঘ ও আমার থিয়েটার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন ফৌজিয়া সিরাজ। পৃষ্ঠা- ১৯

২০) 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্যয় আকাদেমিপত্রিকা', নবম সংখ্যা। পৃষ্ঠা — ৩০

২১) পানু পাল, 'গণনাট্যআ সংঘ ও আমি',এপিক থিয়েটার, 'গণনাট্যক সংঘ স্মৃতি সংখ্যা' মে - ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ২৮

২২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৫-৩৬

২৩) শোভা সেন, উমানাথ কিছু স্মৃতি ও পথনাটিকার গুরুত্ব- এপিক থিয়েটার, ১৯৯৯১-৯২, পৃষ্ঠা - ৩০

২৪) পানু পাল 'কত ধানে কত চাল' পশ্চিমবঙ্গ নাট্যগ আকাদেমি নবম সংখ্যা, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৬৭-১৬৮

২৫) পানু পাল, 'ওরা আর আসবে না'। নাটকটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মলয় রক্ষিতের থেকে প্রাপ্ত।

২৬) দর্শন চৌধুরী- 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পুস্তক বিপনি, ২৭ নং বেনিয়া বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রারম্ভিক পর্ব। ভূমিকা অংশ থেকে।

২৭) অরূপ মুখোপাধ্যারয়- 'উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি' ন্যা শানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া 'নেহেরু ভবন', ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, নয়াদিল্লি- ১১০০৭০, পৃষ্ঠা নং- ৩৩

২৮) চিররঞ্জন দাস- পোস্টার নাটক ও উৎপল দত্ত, এপিক থিয়েটার, মার্ক ১৯৯৪, পৃষ্ঠা নং- ৯০

২৯) উৎপল দত্ত, 'সাদা পোষাক কালো হাত', গণনাট্য০ পত্রিকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৪৮

৩০) দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পুস্তক বিপনি ২৭ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯ ,পৃষ্ঠা- ৩০৪

৩১) গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, নবম বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬, জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ২৩২

৩২) উৎপল দত্ত 'সত্তরের দশক', এপিক থিয়েটার, ১২ সংখ্যা, ৯১-২, ৯২, পৃষ্ঠা- ১০

৩৩) উৎপল দত্ত, 'মালোপাড়ার মা', গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, কলকাতা ৯। পৃষ্ঠা- ৩৯

৩৪) দেবপ্রসাদ রায়, 'জোছন দস্তিদার', গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ৮৬, পৃষ্ঠা- ৩২৬-২৭

৩৫) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৮

৩৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩২৮

৩৭) শিশির সেন, 'কিছু কথা', 'পান্থজনের নাটক', গণনাট্যা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৩

৩৮) গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, পথনাটক সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা— ২০৩

৩৯) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১

৪০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪

৪১) জোছন দস্তিদার 'শ্মশানে তাত্ত্বিক', 'পান্থজনের নাটক', শুক্লা ঘোষাল সম্পাদিত, গণনাট্যপ্রকাশনী, ৬৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৫০

৪২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭০

৪৩) চিররঞ্জন দাস- 'তুমি আমি সবাই', নতুন থিয়েটার পত্রিকা, দ্বিতীয় খন্ড, ১৫ ই মার্চ, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২০৬

৪৪) চিররঞ্জন দাস - 'মৃত্যুহীন', গণনাট্য পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯ , পৃষ্ঠা - ১২৬

৪৫) চিররঞ্জন দাস - ভিয়েতনাম, গণনাট্য পত্রিকা, অক্টোবর, ২০২১, পৃষ্ঠা - ১৭

৪৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৪

৪৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১০২১

৪৮) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬৫৯

৪৯) চিররঞ্জন দাস, 'এস্মাগলার', অভিনয় পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ২৩১৭

৫০) নৃপেন্দ্র সাহা, 'চির বনাম চির', গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, কলকাতা ১৪,২০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মে জুলাই ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১১৭

৫১) মন্মথ রায়, ‘গ্রুপ থিয়েটার’ পত্রিকা (৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা), নভেম্বর ৮৬ - জানুয়ারি- ৮৭। পৃষ্ঠা ৪৮

৫২) সফদর হাশমি , ‘পথনাটক একটি পৃথক ঐতিহ্য’, ‘গ্রুপ থিয়েটার’ (২৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পৃষ্ঠা ৫০৬ (মূল রচনা ‘জনসভা’র ক্রোড়পত্র জানুয়ারি ১১, ১৯৮৯ এ প্রকাশিত, অনুবাদ করেছেন প্রতিমা হায়দার)।

৫৩) হাব্বি তানবীর, ‘মঞ্চ আর পথের বন্ধন গড়ে উঠুক’, ‘নাট্য চিন্তা’ (বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪-৭), ফেব্রুয়ারি- মে, ১৯৯০, পৃষ্ঠা নং ৩

৫৪) শিব শর্মা, ‘প্রশ্ন করুন’, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৫৪

৫৫) শিব শর্মা, ‘রক্ত থেকে জন্ম’, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬১

৫৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭

৫৭) শিব শর্মা, ‘জয়াদের কথা’, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর ৯৬, পৃষ্ঠা ৫১৩

৫৮) শিব শর্মা, ‘সমীক্ষা’, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ১৩ শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রু-এপ্রিল ৯১, পৃষ্ঠা ৯৫

৫৯) শিব শর্মা, ‘মহাজন’, গণনাট্যু পত্রিকা, এপ্রিল ৯৪, পৃষ্ঠা ৭৭

৬০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭